ফানা আনিল গাল্‌ক

ফানা আনিল হা'ওয়া

ফানা আনিল এরাদা

উছুলে ছাবয়া

আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি

(স্মারক গ্রন্থ)

মউতে আরয়্যাহ্

মউতে আছওয়াদ

মউতে আহ্‌মর

মউতে আখজার

সংকলন ও সম্পাদনা:
শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

Darul Irfan Research Institute

(Trust Deed No: iv-78)

Usul-e-Sab'a

The Seven Methods of Self-Purification

■ **Patron:**

Shahjada Syed Emdadul Hoque Maizbhandari
Founder & Patron, Darul Irfan Research Institute.
Sajjadanashin
Gausia Ahmadia Manzil, Maizbhandar Darbar Sharif,
Fatikchhari, Chattogram, Bangladesh.

■ **Compilation & Editing:**

Shahjada Syed Irfanul Hoque Maizbhandari
Managing Trustee, Darul Irfan Research Institute.
Nayeb Sajjadanashin
Gausia Ahmadia Manzil, Maizbhandar Darbar Sharif,
Fatikchhari, Chattogram, Bangladesh.

■ **Editorial Board:**

Mawlana Kazi Muhammad Moin Uddin Ashrafi
Shaikhul Hadith, Sobhania Kamil Madrasha, Chattogram
Dr. Mohammad Shekh Sadi
Associate Professor, Department of Bengali, University of Chittagong
Mehedi Hasan
Assistant Professor, Department of Persian Language & Literature, University of Dhaka
Muhammad Qamrul Islam Jewel
Assitant Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University
Kazi Md. Siful Aspea
Assistant Professor, Depart of English, Chittagong Independent University

Shaikh Muhammad Usman Gonee
Assistant Professor, Ahsania Institute of Sufism, Dhaka
Sheikh Muhammad Muhi Uddin Azhari
Khatib & Head, Portsmouth Jami Mosque, UK

First Published: 1 Magh 1426 Bangla, 15 January 2020 AD
18 Jumada al Awwal 1441 Hijri

Second Edition: 1 Magh 1427 Bangla, 15 January 2021 AD
1 Jumada as Sani 1442 Hijri

■ **Published By:**
Darul Irfan Research Institute (DIRI)
Maizbhandar Darbar Sharif, Fatikchhari
Chattogram, Bangladesh

■ **Compose, Design & Printed By:**
Maizbhandari Prokashoni
Maizbhandar Darbar Sharif, Fatikchhari,
Chattogram, Bangladesh
Contact : +88 01819289716, +88 01711817274

E-mail : tasauf.darulirfan@gmail.com
website : www.sufimaizbhandar.com
Facebook : officialsufismbd (Maizbhandar Darbar Sharif)
: sufism.diri (Darul Irfan Reasearch Institute-DIRI)

Price : 260.00
US$: 5.00
ISBN : 978-984-34-8504-5

© All rights reserved by the publisher

দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট

(ট্রাস্ট ডিড নং : iv-৭৮)

প্রণীত স্মারক গ্রন্থ

উছুলে ছাবয়া

আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি

■ **পৃষ্ঠপোষক**

শাহজাদা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী

প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক,

দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট

সাজ্জাদানশীন

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ,

পোষ্ট- ভাণ্ডার শরিফ-৪৩৫২, উপজেলা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

■ **সংকলন ও সম্পাদনা**

শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট,

নায়েব সাজ্জাদানশীন

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ

পোষ্ট- ভাণ্ডার শরিফ-৪৩৫২, উপজেলা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

■ **সম্পাদনা পর্ষদ**

মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

শায়খুল হাদিস, সোবহানিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

ড. মোহাম্মদ শেখ সাদী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মেহেদী হাসান

সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম জুয়েল

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল আচফিয়া

সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, চিটাগাং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি

শাঈখ মুহাম্মদ উসমান গণী

সহকারী অধ্যাপক, আহছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম

শায়খ মুহাম্মদ মুহি উদ্দিন আযহারী

খতিব ও প্রধান, পোর্টসমাউথ জামে মসজিদ, ইউকে

প্রথম প্রকাশ : ১ মাঘ ১৪২৬ বাংলা, ১৫ জানুয়ারি ২০২০ ইংরেজি
১৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১ মাঘ ১৪২৭ বাংলা, ১৫ জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি
১ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরী

প্রকাশনায়:
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট
মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

বর্ণবিন্যাস, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে:
মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : +৮৮ ০১৮১৯২৮৯৭১৬, +৮৮ ০১৭১১৮১৭২৭৪
E-mail : tasauf.darulirfan@gmail.com
website : www.sufimaizbhandar.com
Facebook : officialsufismbd (Maizbhandar Darbar Sharif)
: sufism.diri (Darul Irfan Reasearch Institute-DIRI)

মূল্য : ২৬০.০০ (দুইশত ষাট টাকা মাত্র)
ISBN : 978-984-34-8504-5

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

সূচীপত্র

ক্রম.	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
০১	সম্পাদকীয়		১০
০২	দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা		১৬
০৩	পৃষ্ঠপোষকের ভাষ্য		১৭
০৪	বাণী		১৯
০৫	উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি	সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী	৩৬
০৬	উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি ইসলামি ফিকহের আলোকে	সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান	৪১
০৭	পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে উছুলে ছাবয়া এর ফানায়ে ছালাছা	কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী	৪৫
০৮	প্রসঙ্গ উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি	প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী	৪৮
০৯	উছুলে ছাবয়ার আলোকে ধর্মীয় স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ	অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শফিউল হাসান	৫০
১০	মাকাসিদে শরিয়াহ অনুধাবন ও বাস্তবায়নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ	৫২
১১	ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় পানি সম্পদ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা এবং গুরুত্ব	ড. মোঃ আতিকুর রহমান	৫৮
১২	ফানা আনিল হা'ওয়া এর তাৎপর্য	ড. মুহাম্মদ ফরিদুদ্দিন ফারুক	৬১
১৩	'মউতে আছওয়াদ' বা কালো মৃত্যুর তাৎপর্য ও স্বরূপ নিরূপন	ড. মুহাম্মদ নুর হোসাইন	৬৩
১৪	শরিয়ত ও তরিকতের আলোকে উছুলে ছাবয়া	ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ	৬৫
১৫	যাপিত জীবনে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা	ড. মোহাম্মদ শেখ সাদী	৭১
১৬	সামাজিক নিরাপত্তায় ও জাতীয় উন্নয়নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা	মোহাম্মদ ইকবাল সরোয়ার	৭৪
১৭	বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থায় "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা	ড. মোস্তফা কামাল	৭৭

১৮	Reflecting on the Importance and Usefulness of "Usule Sabya" in the Context of Present Socio-Economic Predicament of the World	Mohammed Sarwar Alam	৮০
১৯	Sustainable Development Goals: Role of Usule Sabya	Dr. Md. Golam Rabbani	৮২
২০	ভাণ্ডারী দর্শনের সাতটি কর্মনীতি ও সংগীতের পারম্পর্য	ড. সাইম রানা	৮৮
২১	আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা	মেহেদী হাসান	৯০
২২	মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু	মুহাম্মদ আবুল হোসাইন	৯৮
২৩	বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা	ড. মোহাম্মদ রেজাউল হোছাইন	১০১
২৪	চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে ও ব্যক্তি উন্নয়নে এবং আদর্শবান সুনাগরিক তৈরিতে উছুলে ছাবয়ার ভূমিকা	মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম জুয়েল	১০৪
২৫	প্রাচ্যের ভাবধারায় "উছুলে ছাবয়া"	কাজী মুহাম্মদ সাইফুল আচফিয়া	১১০
২৬	উছুলে ছাবয়া'র আলোকে আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নয়ন ও তরিকত সাধনা	মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী	১১৪
২৭	ফানা আনিল খাল্ক	মুহাম্মদ জুলফিকার আলী	১১৯
২৮	উছুলে ছাবয়া'র আলোকে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তি উন্নয়ন	ড. মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম	১২৩
২৯	মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি	গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল-কাদেরী	১২৬
৩০	ফানা আনিল এরাদা এর স্বরূপ ও তাৎপর্য	মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভি	১৩১
৩১	উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস দমনে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা	মুহাম্মদ হামেদ রেযা নঈমী	১৩৪
৩২	'ফানা আনিল এরাদা' এর প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ	মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার টিটু	১৩৮
৩৩	গাউছুল আজমের প্রবর্তিত এবং অছিয়ে গাউছুল আজমের বর্ণিত 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি	ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন	১৪০
৩৪	সপ্ত পদ্ধতির সাত কাহন	হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান	১৪৫

৩৫	তাসাউফ: তাকওয়া তাযকিয়া ও ইহসান আত্মশুদ্ধি ও সত্যদর্শনে 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি	মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী	১৪৮
৩৬	আত্মার উন্নয়ন ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য	প্রফেসর শাহজাদা সৈয়দ সফিউল গণি চৌধুরী	১৫৯
৩৭	সুশিক্ষা ও নৈতিকতা অর্জনে উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা	মেজবাউল আলম শৈবাল	১৬৪
৩৮	মউতে আহ্‌মর বা লালমৃত্যু উছুলে ছাবয়ার (সপ্তকর্ম পদ্ধতি) অন্যতম সাধন পদ্ধতি	মুহাম্মদ আলী আছগর	১৬৮
৩৯	The Seven Ascetic Methods: an Umbrella over Western Literature and Society	Muhammed Wahid Manjur	১৭১
৪০	Belayet-E-Mutlaka and Usul-E-Saba : Some preliminary observations	Mehedi Hasan	১৭৬
৪১	Usul E Saba: an enlightening guideline for students	Abdul Alim	১৮৪
৪২	Impact of USUL E SABA in a student's life	Asadozzaman Nur	১৮৬
৪৩	আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি	সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আল-আযহারী	১৮৭
৪৪	মানব সমাজ ও জাতির উন্নয়নে উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা	এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ	১৯০
৪৫	সার্বজনীন আত্মশুদ্ধির মুক্তির পথ উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি	মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী	২২৩
৪৬	পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্ব-মানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির সোপান প্রজ্ঞাময় উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি	মুহাম্মদ আবুল মনছুর	২২৭

৪৭	Usul-e-Sab'a: An esoteric struggle to unveil the veil, in the context of Maizbhandari Tariqa	Muhammad Muhi Uddin	২৩৯
৪৮	অপরাধ ও মামলা নিরসনে উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি	এডভোকেট মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন	২৫১
৪৯	مفهوم الاصـــول السبعة علي ضوء الكتاب والسنة	محمد قمر الحسن	২৫৩
৫০	মানসিক যন্ত্রণা ও মানবিক দুঃখ-কষ্ট লাঘবে 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি	আকতার হোসেন	২৫৮
৫১	নির্বিলাস জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য	এ. টি. এম মুছা	২৬১
৫২	গাউছিয়ত নীতি		২৬৩
৫৩	মটো		২৬৪

সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ وَ عَلٰى اٰلِه وَ اَصْحَابِه وَ اَوْلِيَاءِ اُمَّتِه اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা অনন্ত অসীম প্রেমময় মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি মানব জাতিকে আপন মহিমায় সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে স্বীয় কুদরতের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র স্বরূপ নির্বাচিত করেছেন। যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য যুগে যুগে নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে অসংখ্য আউলিয়াও প্রেরণ করেছেন মানুষের কল্যাণে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর শিক্ষা সমুন্নত রাখতে। অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রিয় নবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এঁর উপর এবং তাঁর পুতপবিত্র পরিবার পরিজন, আসহাবগণ এবং আউলিয়াগণের উপর, যাঁদের বদৌলতে মানব নিজ পরিচয় ও স্রষ্টা পরিচিতি সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছেন।

ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কুরআন পাক চির অবিকৃত ও সুরক্ষিত থাকায় ভুল ভ্রান্তি মুক্ত। কুরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক। যা তাঁর বিভিন্ন হাদিস, সুন্নাহ ও আচরণ ইত্যাদি হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সৃষ্টির কাছে গ্রহণীয় হবার যৌক্তিক দাবি রাখে।

হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা এবং সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে। হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা নবুয়তের শানের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা আদেশ নিষেধমূলক, প্রচারমূলক, ও বিভিন্ন রূপ প্রদানকারী প্রগতিমুখী বস্তু। এটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশোন্মুখ প্রতিভা। এতে সর্বব্যাপ্ত, সচেতন ও সজ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আদেশ-নিষেধ বাণীমূলে বিকশিত ও বিরাজিত। পবিত্র কুরআনের বাণী- "কুল্লা এয়াওমিন হুয়া ফিশান" (সূরা আর রহমান ঃ আয়াত-২৯) অর্থাৎ "আল্লাহ প্রত্যহ বিভিন্ন অবস্থাতে বিরাজমান।" যেরূপ ফুলের কলির মূলাধারে ভ্রমরের গুঞ্জন ও বুলবুলির কিচিমিচির ভিতর দিয়ে প্রস্ফুটিত ফুলের বিকাশ ঘটায়; সেরূপ সৃষ্টির মূলাধার স্রষ্টা, কুন এর কুনকুনীতে ও বোলের বোল বোলিতে সৃষ্টির বিকাশ ঘটায়। এটি নবুয়তের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে, যা বাহ্যিক দিক প্রধান।

সফলতা অর্জনের যোগ্যতা নবির বেলায়তি শানের বা অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি উৎসাহ ব্যঞ্জকময় প্রকৃতি বিশিষ্ট রহস্যময় অবস্থা। এটি সমাবেশকারী। এটি বেলায়ত

ঘনিষ্ট প্রধান ভাবধারা। এটি নেহায়েত মানব-মনন-প্রকৃতি সম্পন্ন, যা "তছদীক বিল যনান" যা অন্তরের বিশ্বাস ভাবধারায় ও মনন-প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতায় বিকশিত হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিক কার্য-কারণ এটির অন্তরায় হতে পারে না বা এ মনোবৃত্তির পরিচায়কও হতে পারে না। এটি শুধু চারিত্রিক অবনতি রোধ করার জন্য নয়, বরং চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্যও নিতান্ত দরকার।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও সর্বধর্মসম্মত মত হল, মানবজাতির চরিত্রগত অবনতি রোধ করে চরিত্রবান মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি করা। যা অবশ্যই মৌলিক। রাসুল করিম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- "আমি একমাত্র মানবজাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করানোর জন্য প্রেরিত হয়েছি বা এসেছি।" (মসনদে আহমদ, হাদিস নং ৮৯৩৯) পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ আছে- "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়ত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে।" (সূরা বাকারা : ২৫৬) পবিত্র কুরআনে আরও উল্লেখ আছে- "হে রাসুল, আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না।" (সূরা মায়েদা : ৭৭)

ধর্ম-ঝগড়া পরিহার করে অলিউল্লাহদের বদৌলতে দুনিয়াতে ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করেছে। প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায়, এই উপমহাদেশ বিশেষত বাংলা এবং বিভিন্ন দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ সমূহে বুজুর্গানে দীনের বদৌলতে মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা শাসন প্রভাবিত তলোয়ার দ্বারা হয়নি, হয়েছে ইসলামের সূফীবাদি প্রেমময় ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে।

তৌহিদ, দ্বৈতভাব পরিহারকারী বিধায় বিশ্ববাসীকে একই চারিত্রিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করতে ক্ষমতা সম্পন্ন। সুফিয়ায়ে কেরামগণ আত্মশুদ্ধিকামী দ্বিতীয় স্তরের "লাওয়ামা" বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল মানব হন বিধায়, তাঁরা তরিকত-পন্থী, তাঁরা "এখতেলাফ" পরিহার করেন। অলিয়ে কামেলের জ্ঞানজ্যোতি অনুসরণ করেন। বিধানধর্মের উপর নৈতিকধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং এবাদত বা উপাসনার উপর "এতায়াত" বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন যা উপাসনার উদ্দেশ্য। যথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, আমার অনুগত হও। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ বিদূরিত করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৩১)

তাই প্রত্যেক ধর্ম-বা সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ধর্মহীন লোকেরা বহু কিছু আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেও এযাবৎ তারা বৈশ্বিক সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারেনি। বরং দিন দিন নতুন সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বিশ্বময়

ধর্মবিরোধ মিটিয়ে এর সমন্বয় সাধন করার জন্য বেলায়তে মোত্লাকায়ে-আহ্মদী-ই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এ বেলায়তের প্রভাবেই জগত হতে ধর্ম-বিরোধ তিরোহিত হতে পারে। মানবজাতির চারিত্রিক অবনতি রোধ করতে এই বেলায়তে মোত্লাকায়ে-আহ্মদীর সুষ্ঠু কর্মপন্থা অত্যন্ত জরুরী। যা শুধু মাত্র এই মৌলিক তরিকত পন্থাতেই সম্ভব এবং এটি খাতেমুল বেলায়ত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮২৬-১৯০৬] মালামিয়া কাদেরীর মসরবে পাওয়া যায়। তাঁর এ অপূর্ব নির্বিলাস সুফি সভ্যতা বিশ্ববাসীর জন্য সুরক্ষিত। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নফ্সকে কষ্ট দিয়ে নিজ আত্মার বশীভূত করলে যে আল্লাহ প্রদত্ত (খোদায়ী) শক্তি হাসিল হয় তাকে "বিল মালামাত" বলা হয়। উক্ত ভাবে বেলায়ত অর্জনকারী অলিকে "মালামিয়া" অলি বলা হয়। এ "মালামিয়া" তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন হযরত আবু ছালেহ হামদুল্লাহ কাচ্ছার (রাহমতুল্লাহে আলাইহে)। তিনি ২৭১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। (তাসাউফে ইসলাম, ২২৩-২৩০) এটিকে অন্যান্য বুজুর্গানে দীনেরা কলন্দরী, তাইপুরী, সাত্তারিয়া প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রাহমতুল্লাহে আলাইহে), আ'মের ইবনুল ফারেছ (রাহমতুল্লাহে আলাইহে), হযরত জালালুদ্দিন রুমী (রাহমতুল্লাহে আলাইহে), হযরত আবদুল করিম জিলি (রাহমতুল্লাহে আলাইহে), তাইপুরী হযরত আবু এজিদ বোস্তামী (রাহমতুল্লাহে আলাইহে) (ওফাত ২৬১ হিজরি) প্রত্যেকেই তৌহিদে আদ্য়্যান বা অদ্বৈত স্রষ্টা মতবাদের অনুসারী।

যেহেতু সমস্ত ধর্মের লক্ষস্থল স্রষ্টা এবং বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদীর প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রণীত "বেলায়তে মুহীত্" বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত অর্থাৎ বেলায়তে মোত্লাকার রীতিনীতি ও স্রষ্টার নীতি অভিন্ন, এটি স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তি-সম্ভূত বস্তু। এ বেলায়তের অধিকারী ও নীতিবাহক মোজাদ্দেদে জমান বা যুগসংস্কারক গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী মালামিয়া কাদেরী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ), কুরআন পাকের বাণীর মর্মমতে নৈতিক ধর্ম প্রধান "আক্লে কুল্লির" অধিকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অলিউল্লাহ। তিনি তাছাওয়োফ মতে কার্যকরী পন্থা অবলম্বনকারী। এটি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কাজকর্ম ও কথাবার্তায় প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়। এ বেলায়তী শক্তি ও নীতিকে আরবীতে "বেলায়তে মুহীত্" বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত বলে। তিনি, জাতিধর্ম নির্বিশেষে 'তৌহিদে আদ্য়্যান' বা অদ্বৈত স্রষ্টা অনুরাগ মতবাদে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আচার-ধর্মের উপর নৈতিক-ধর্মের প্রাধান্য ও পরস্পর আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য এবং শালীনতার সমর্থক দেখা

যায়। স্রষ্টা স্মরণ ও নিজ সত্তার উন্নয়ন ব্যাপারে এবং বিশ্ব-সভ্যতার ক্ষেত্রে ধর্ম স্বাধীনতা, মানবতার উন্নয়ন মূলে ব্যক্তি সত্তার সমর্থক ছিলেন। তিনি, ধন-সম্পদ স্ফীতি বিরোধনীতি এবং অভাব বিমুক্ত জীবন পছন্দ করতেন। কারও সঙ্গে বিরোধ না বাড়িয়ে কিছু ত্যাগ স্বীকার করেও অবুঝ জনের সঙ্গে আপোষ করতে উপদেশ দিতেন।

তাঁর এ বেলায়তে মোত্লাকার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বমানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তিধারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ধন সঞ্চয় ও বণ্টনে বা ধর্মকে চতুরজনের ব্যবসায় রূপ দেয়ার ফলে যারা ধর্ম বিমুখ বা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তাদের জন্য এটি একটি উত্তেজনাবিহীন পন্থা এবং এ বেলায়তে মোত্লাকা বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণের দিশারী। এটি ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূলউৎপাটনকারী, ধনসাম্য উৎসাহী বিশ্বশান্তির প্রতীক।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্রষ্টানুরাগী নিত্যে আসক্ত ও সংসারনুরাগী অনিত্যে আসক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। যারা সংসারানুরাগী বা অনিত্যে আসক্ত, তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্যাসত্য স্রষ্টানুরাগ অভাবে মৃতপ্রায় ও নির্জীব। রূহানী জগতের উচ্চমার্গে বিচরণে বা সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান আহরণে তারা অসমর্থ, তাই তাদের উদ্দেশে ও কুরআনী হেদায়ত সার্বজনীন হিসাবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অনুরাগী বা বিরাগী প্রত্যেকের জন্য উছুলে ছাবয়া বা সপ্তশুদ্ধি প্রণালী স্বাভাবিক ও সহজতম কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

সংসার জীবন-যাত্রায় মানব যেমন বাসন-কোষণ পরিষ্কার করে পুনঃ কার্যকরী শক্তি লাভ করে; গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) আশ্রিত ব্যক্তিও সংসার ঝামেলা হতে মুক্ত ও পরিষ্কার হয়ে কার্যকরী শক্তি লাভ করবে। পুকুরের জল যেমন পুকুরে অবতরণকারীকে শান্তি দান করে। সেরূপ তাঁর অনুসরণকারীও আল্লাহর নাম স্মরণে শান্তি লাভ করবে। জীবন নামে খ্যাত পুকুরের বিশুদ্ধ পানি পান করে মানবকুল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে তদ্রূপ হজরতের বেলায়ত সুধা পানকারীও সুফি মতানুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করে পবিত্র হাদিস মতে "মূতু কব্লা আন তমূতু" রূপ চার প্রকার ইচ্ছা মৃত্যুকে বরণ করতঃ স্রষ্টা পরিচিতি জগতে সুফি পরিভাষা মতে "হায়াতে আবদী" নামক নিত্য জীবন লাভ করে।

এই উছুলে ছাবয়ার সাহায্যে মানব, স্রষ্টা পরিচিতি জগতে উন্নীত হয়ে উর্দ্ধতম সত্যবস্তু স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে নিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে এক "কশ্ফী" নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে; যা সন্দেহের অতীত। "ফানায়ে ছালাছা ও মউতে আরবা" এ সাত প্রকার শুদ্ধি প্রণালী বা কর্মপন্থা কার্যকরী প্রত্যক্ষ কুরআনী হেদায়ত বলে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সাব্যস্ত করেন; যা সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও

সহজসাধ্য আইনুল একীন ও হক্কুল একীন জনিত পন্থা। এ সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ না হয়ে বরং বন্ধুসুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়। এ সপ্ত পদ্ধতি, ইসলামি সুফি মতবাদ মতে "ফানায়ে নফ্ছী" প্রবৃত্তির বিনাশ এবং "বাকাবিল্লাহ্‌র" বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলামুক্ত ও অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধির নিয়মানুবর্তির সঙ্গে বিরোধাত্মক নয়। বরং উৎসাহ বর্দ্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী। কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী। এটি ব্যবসাদারী পীরত্বের সমর্থক নয় বরং নেহায়ত নিষ্কাম স্রষ্টা অনুরাগী। এ পীরী ব্যবসাদারী পতন যুগে, এটি নৈতিক ধর্মের জীবনদানকারী ধ্রুবতারা। যা ঐক্য ও সৃজনশক্তির শক্তিশালী আলো দানকারী। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় যাকে (কাউকবে দুর্রী) বলা হয়েছে।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) স্রষ্টা অনুরাগী নীতিতে "নিছবতাইনে আ'দমী" বা বিগত আগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী বিধায়, "খাতেম" বা সনদ্‌দাতা। হজরত আক্‌দাছের এই সপ্ত পদ্ধতি বেলায়ত রহস্য; তাঁর বিশ্বত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছিয়তের এক উজ্জ্বল নজির। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ও মানবকল্যাণ সাধনে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর মহান আদর্শ ও নীতিমালাকে তথা তরিকা, সিলসিলা, শজরা, উছুল, গাউছিয়ত নীতি ও উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির হেদায়ত বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেয়ার গভীর প্রেরণায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মনোনীত গদীর স্থলাভিষিক্ত একমাত্র সাজ্জাদানশীন হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮৯৩-১৯৮২] সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশে তাঁর ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি)কে [১৯৩৬-] একমাত্র সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে গদীর স্থলাভিষিক্ত এবং গাউছিয়ত জারি ও সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত ও অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক রচিত মানব কল্যাণধর্মী 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রকৃত বাস্তবায়ন, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে, অনুরাগী-বিরাগী সকল সম্প্রদায়ের আত্মশুদ্ধি, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তি

কামনায় বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) ইতোমধ্যে 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট' গঠন পূর্বক যুগোপযোগী মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

যেহেতু সর্বজাতির ও সর্বধর্মের ধর্মীয় লক্ষস্থলে পৌঁছার এবং সকলের গ্রহণযোগ্য এটিই সহজতম পন্থা বা তরিকা। তাই বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনীয়তা অধিক। বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণে 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট' উছুলে ছাবয়া'র প্রচার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম এ স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের আয়োজন করেছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি রইলো প্রাণঢালা অভিনন্দন। বিশেষত যারা লেখা দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা। সময়ের স্বল্পতার জন্য আমরা অনেকের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারিনি এবং অনেকের আগ্রহ থাকা সত্তেও সময়ের বাধ্যবাধকতায় যাদের লেখা এ স্মারকে ছাপাতে পারিনি তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

প্রকাশনা একটি সৃজনশীল শিল্প, এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময়; সময় স্বল্পতার কারণে এ প্রকাশনায় বিভিন্ন প্রকার মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক আপন মহিমায় তা মার্জনা করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনে প্রয়াসী হবো।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর দর্শনে যেন কোনো বিকৃতি স্থান না পায়, সেজন্য তাঁর সঠিক শিক্ষা ও জীবন-কর্ম প্রচারে বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) একান্তভাবে সকলের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন। পরিশেষে সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভকামনা রইলো। আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন। আমিন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ধন্যবাদান্তে-

শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট;

নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবার

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ وَ عَلٰى اٰلِه وَ اَصْحَابِه وَ اَوْلِيَاءِ اُمَّتِه اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং লাখ কোটি দরুদ প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) উপর। শুকরিয়া আদায় করছি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর পাক চরণে। উনার দর্শনে যেন কোনো বিকৃতি স্থান না পায়, সেজন্য তাঁর সঠিক শিক্ষা ও জীবন-কর্ম প্রচারে বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) যে একান্ত প্রচেষ্টায় এবং সকলের সহযোগিতায় এই গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থ সকল শ্রেণি-পেশার ও মত-পথের মানুষের কাছে এমন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে তা আমরাও ধারণা করতে পারি নি। সমস্ত পাঠকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং এই গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদার কথা চিন্তা করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এই সংস্করণে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত থাকার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংস্করণে এই গ্রন্থের ইলেকট্রনিক ভার্সন (ই-বুক)ও প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এরপরও যদি কোন প্রকার মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিজ্ঞ পাঠকের প্রতি বিনীত আবেদন থাকল। পরিশেষে সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভকামনা রইলো। আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন। আমিন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ধন্যবাদান্তে-

শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট;

নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি, ১ মাঘ ১৪২৭ বাংলা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

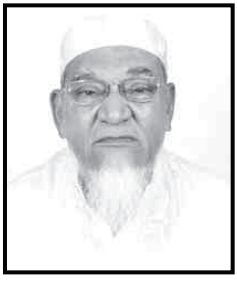

পৃষ্ঠপোষকের ভাষ্য

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিহিল কারিম।

মাইজভাণ্ডারী তরিকা কুরআন ও হাদিসের নির্যাসলব্ধ মানবিকতার আদর্শকে ধারণ করে শরিয়ত পালনের পাশাপাশি নৈতিক পরিশুদ্ধির উপর প্রাধান্য দেয়। 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি মাইজভাণ্ডারী তরিকার সাধন-চর্চার পথ-পরিক্রমার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) পথহারা মানব ও মানবতাকে আল্লাহর প্রেম-দিশা পাওয়ার সহজ অনুষঙ্গ হিসেবে তরিকতের অন্যান্য আমলের পাশাপাশি পালনীয় এই সপ্তকর্মের শিক্ষা দেন। পরবর্তিতে তাঁর গদীর উত্তরাধীকার আমার মুর্শিদ হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এই নীতি-পদ্ধতিকে সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাঁর রচনাবলীতে লিপিবদ্ধ করেন।

চারিত্রিক ও আত্মিক শুদ্ধতা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মৌলিক উপাদান। হযরত রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এঁর চারিত্রিক গুণাবলীকে নিজ চরিত্রে বিকশিত করার মাধ্যমে বান্দা তার আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার পাথেয় সংগ্রহে সমর্থ হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এঁর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" মাইজভাণ্ডারী তরিকার এই সাধন-নীতির ধারাবাহিক অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সাধক তার মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার পঙ্কিলতামুক্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার ঐশী আলোর ছটায় আলোকিত হয়ে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ ধারকরূপে আর্বিভূত হন।

বর্তমান বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উছুলে ছাবয়া ও মাইজভাণ্ডারী তরিকার ভূমিকা ও অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ভোগবাদ নির্ভর আধুনিকতা শুধুমাত্র বস্তুবাদী অর্জনের নিরিখেই ব্যক্তি সফলতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে। কপট সফলতার অবান্তর লক্ষে পৌঁছানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মানব

তার মানবতাকে বিসর্জন দিতেও পিছপা হচ্ছেনা। পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের অবলুপ্তিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবরণে অমানবিকতা ও স্বার্থান্বেষিতার বিস্তার জন্ম দিয়েছে মানবতাহীন নিষ্ঠুর নেতৃত্ব। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব-সমাজব্যবস্থা বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক শোষণ, আন্তঃধর্মীয় কোন্দল, শাসক ও শোষকের অত্যাচার, নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়, নিষ্ঠুরতা ও নীতিহীনতার করাল গ্রাসে আক্রান্ত। বিশেষত বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মুসলমানরা নানাভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে।

মাইজভাণ্ডারী তরিকা নিয়ে আরও গভীর, যুগোপযোগী, ব্যাপক ও বিস্তারিত গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি ও উৎসাহের লক্ষে আমি 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট' গঠন করে নায়েব সাজ্জাদানশীন শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হককে এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। এই ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে 'উছুলে ছাবয়া' স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এই তরিকার দাওয়াত সাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার যে দীর্ঘ সফরের সূচনা হয়েছে তার সফলতা কামনা করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করছি।

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক,
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাণী

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ জানুয়ারি ২০২০

আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। সকলের গতি ও প্রত্যাবর্তন তারই দিকে। তাঁরই উত্তম সৃষ্টি মানুষ; আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরই প্রতিনিধিত্বের জন্য। তবে এই সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানব জাগতিক জগতে তাঁর কাজের প্রতিফলে প্রেরণা, স্বার্থ, কাম ইত্যাদি রিপুর জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তথা প্রভুর সাথে মানুষের পুণসম্পর্ক স্থাপনের দিক নির্দেশনা দেয়ার নিমিত্তে মহান প্রভু যুগে যুগে নবি, রাসুল ও অলিদের প্রেরণ করেছেন। কালের দূরত্বে মহান প্রভুর আদর্শকে মানব যখন প্রভু-পরিচিতি জ্ঞান ও প্রেম-প্রীতিকে ভুলে বসে, তখন এ অলিরাই মানব জগতকে প্রভুর আনুগত্য, প্রীতি ও প্রেম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তাঁর মিলন পথে পৌঁছে দেন।

অলিকুল শিরোমণি উপমহাদেশের অন্যতম মানবতাবাদী মহাপুরুষ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) কোরআন সুন্নাহর আলোকে সৃষ্টিকে আবারো স্রষ্টার পথে ফিরিয়ে আনার জন্য দিয়ে গেছেন 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি'। 'উছুলে ছাবয়া' এর মূলনীতি হলো- পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা; যা না হলেও চলে, এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; নিজ ইচ্ছা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করা; সংযম সাধনা; সমালোচনায় বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজকে সংশোধনের মনমানসিকতা অর্জন; কামস্পৃহা ও লোভ-লালসা হতে মুক্ত থাকা; নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া-ইত্যাদি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এ মহান দরবারের সাজ্জাদানশীন সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সাথেও গভীর সম্পর্ক ছিল। বঙ্গবন্ধু ইসলামের মূলভাব ধারা প্রচার প্রসারের লক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে সকল দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। তিনি তাসাউফের শিক্ষা-আত্ম সংশোধন ও চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে যুব সমাজকে সজাগ করার লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। আমি বিশ্বাস করি, এ সপ্ত কর্ম পদ্ধতি ভবিষ্যতে যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) সাহেবের তত্ত্বাবধানে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দিকনির্দেশনামূলক 'উছুলে ছাবয়া' স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আল্লাহ তায়ালা এই মহান উদ্যোগকে কবুল করুন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক॥

মহিবুল হাসান চৌধুরী (নওফেল) এম.পি.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



সভাপতি
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

চলমান বিশ্ব-পরিস্থিতির পর্যালোচনায় আমরা দেখি বিশ্ব-মানবতা ইতিহাসের এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নৈতিকতার পরশহীন সমাজ-ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে পুরো বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। বিশ্বের সকল বহুজাতিক সমস্যার মূলে যে কারণগুলো রয়েছে তার অন্যতম প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে: প্রথমতঃ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সীমাহীন বিলাসিতা ও লোভ-লালসা। দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অসহনশীলতা।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মানবতাকে শান্তি, সাম্য ও ভালোবাসার প্রতি আহবান করার নিমিত্তে কোরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তন করেন।

এই তরিকার একটি অন্যতম মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা; যা না হলেও চলে, এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; নিজ ইচ্ছা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করা; সংযম সাধনা; সমালোচনায় বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধনের মনমানসিকতা অর্জন; কামস্পৃহা ও লোভ-লালসা হতে মুক্ত থাকা; নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া, ইত্যাদি 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির মূল আলোচ্য বিষয়। এই কর্মপদ্ধতির বাস্তব অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেকে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সহায়ক হবে।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর তত্ত্বাবধানে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক 'উছুলে ছাবয়া' স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে আমি তার সার্বিক সফলতা কামনা করি।

১৫.০১.2020

ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

বাণী

বিশ্ববাসীর আত্মিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্য হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন পদ্ধতি দিয়ে গেছেন তা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পালন-সম্ভব একটি কল্যাণকামী কর্মসূচি। কোন মুমিন বান্দা যখন কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পথে আপন মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করে, তখন তার আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের পথ সুগম হয় এবং সাথে সাথে তিনি হেদায়তের আলোকবর্তিকারূপে আবির্ভূত হয়ে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ ধারকরূপে বিবেচিত হন। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) অগণিত খলিফা ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত মনীষীগণ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস।"

নবি করিম (সাঃ) এবং অলি ও বুজুর্গানে দ্বীনের বাণীকে সমাজের সকল স্তরে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার মহান ব্রতকে সামনে রেখে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে 'উছুলে ছাবয়া' নামক স্মারকগ্রন্থ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই ও সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর তত্ত্বাবধানে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

আলহাজ্ব সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী
সংসদ সদস্য
২৭৯, চট্টগ্রাম-২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

বাণী

ইসলাম ধর্ম শান্তি, প্রেম ও ভালোবাসার ধর্ম। পবিত্র কোরআনে বারবার ঐশি প্রেমের ওপর জোরারোপ করা হয়েছে। মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও রাসুলকে ভালোবাসে, তখন তার অন্তরে বিশ্ব-মানবতার জন্যও ভালোবাসার জন্ম নেয়।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ বিশ্ব-মানবতার কল্যাণে ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত একটি দরবার। এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য পালনীয় 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি' এর প্রবর্তন করেছেন। এই সাতটি মূলনীতি হলো: 'ফানায়ে ছালাছা' বা ত্রি-লয় তথা- 'ফানা আনিল খাল্ক' সৃষ্টি থেকে কিছু আশা না করা (শুধু স্রষ্টা থেকে আশা করা), 'ফানা আনিল হা'ওয়া' অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মুক্ত হওয়া, 'ফানা আনিল এরাদা' খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া (স্বীয় ইচ্ছার অনুগত না হওয়া) এবং 'মউতে আরবা' বা চার মৃত্যু যথা- 'মউতে আবয়্যাজ' সাদা মৃত্যু (রোজা ও সংযম), 'মউতে আছওয়াদ' কালো মৃত্যু (প্রশংসা ও নিন্দার ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া), 'মউতে আহমার' লাল মৃত্যু (কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া), 'মউতে আখজর' সবুজ মৃত্যু (নির্বিলাস অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা)।

আমি বিশ্বাস করি এই মূলনীতিগুলো অনুসরণে মানবজীবন সহজ-সুন্দর সুখী হবে। 'উছুলে ছাবয়া' এর বাণীকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই এবং প্রার্থনা করি এর ভবিষ্যত চলা সফল হোক।

খাদিজাতুল আনোয়ার
সংসদ সদস্য
৩০৬, সংরক্ষিত মহিলা আসন-৬
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



জানুয়ারি ০৭, ২০২০

শুভেচ্ছা বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট' মাইজভাণ্ডারি তরিকার মৌল সাধনতত্ত্ব ও প্রণালী 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্মপদ্ধতি বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও গবেষকদের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা নিয়ে 'উছুলে ছাবয়া স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

সুফিবাদ চর্চার উর্বর ভূমি চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। বাংলাদেশে এ কাদেরিয়া-মাইজভাণ্ডারি তরিকার প্রবর্তক শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)। ইহজাগতিক ও পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনে এ তরিকা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে বিরাজমান সংকটাবর্তে সুফিবাদের উদার-মানবিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভাব-পরিমণ্ডল এক অতিলৌকিক অথচ কার্যকরী অনুষঙ্গরূপে নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বময় মানবিক সংকট থেকে উত্তরণের সবচেয়ে পবিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে সুফিবাদের আলোকবর্তিকা। আত্মার পবিত্রতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানবতার পথে আত্মমুক্তির এ দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখে মাইজভাণ্ডারি তরিকা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং ইহজাগতিক সমূহ বিপর্যয় থেকে মুক্তির মহত্তম কাজটি করে যাচ্ছে। শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) প্রবর্তিত 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্মপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং আত্মমুক্তির পথ। এটি অনুসরণ করে যে কেউ সাফল্য অর্জন করতে পারে। সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্রের নানা সংকটে বিপথগামী তরুণ প্রজন্মের জন্য এটি মুক্তির অন্যতম পাথেয় হতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি, দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার যুবসমাজকে অপশক্তির কালো থাবা ও নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত করার মহৎ লক্ষে 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষেরা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, তাঁরা হন সার্বজনীন, উদার ও অসাম্প্রদায়িক। সমাজে তথা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো- অন্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং

সম্মান দেয়া। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে অশান্তি, অনাচার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিষবাষ্প নির্মূল করে সত্যিকারের শান্তি, কল্যাণ, মানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা রাখি।

আমি এ 'উছুলে ছাবয়া স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক॥

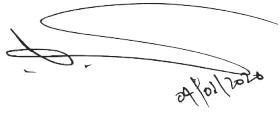

(অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান)
উপাচার্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাণী

০৬/০১/২০২০

মানবকূলের ইহ জাগতিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি ইসলাম ধর্মের মূল লক্ষ। সকল নবি রসূলগণ ও অলি আউলিয়াগণ শান্তি ও মুক্তির এই শাশ্বত বাণী যুগ যুগ ধরে প্রচার করে গেছেন। শান্তি ও মুক্তির এই শাশ্বত বাণী প্রচার ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবি-রাসুল ও আউলিয়াদের প্রেরণ করেছেন।

বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্বসম্পন্ন গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর আগমন ঘটেছে মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তি এবং স্রষ্টার সাথে মানবের মিলন ঘটাবার জন্য। তিনি যুগোপযোগী চিন্তাকর্ষক কৌশল, ভাবধারা, কার্যকলাপ ও রীতিনীতি এবং চরিত্র-মাধুর্য দ্বারা মানব জাতিকে আল্লাহ তায়ালার প্রেম-পথে আহবান করে মানবের সর্বপ্রকার মুক্তির পথে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রদর্শিত 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি' অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবন সহজতর ও সুন্দর হয়।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এর পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দিক নির্দেশনামূলক 'উছুলে ছাবয়া' স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার)
উপাচার্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাণী

১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

উপমহাদেশের অন্যতম আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। এ মহান দরবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রবর্তন করেন।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় সাধনভজন এর সফলতার অঙ্গনে একটি অনন্য আঙ্গিক হলো তজকীয়ায়ে নফ্স হাসেল এর মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভকরণ। তিনি কোরআন ও সুন্নাহর ভাবাদর্শের ভিত্তিতে মানবকল্যাণমূলক নিখুঁততম ও সহজসাধ্য জীবনধারণ প্রণালীর অনুসরণ অনুকরণ এবং মানব অন্তরে ঐশি প্রেমধারা সৃষ্টি এবং তজকীয়ায়ে নফ্স অর্থাৎ মানবীয় সত্তার সজাগ বা কু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর লক্ষে উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি অনুশীলন এর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য অর্জনের এক হেদায়তের ধারা সূচনা করেন যা আজ সুফি পরিমণ্ডলে আদৃত ও স্বীকৃত।

'ফানায়ে ছালাছা' বা ত্রি-লয় তথা- 'ফানা আনিল খাল্ক' সৃষ্টি থেকে কিছু আশা না করা (শুধু স্রষ্টা থেকে আশা করা), 'ফানা আনিল হা'ওয়া' অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মুক্ত হওয়া, 'ফানা আনিল এরাদা' খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া (স্বীয় ইচ্ছার অনুগত না হওয়া) এবং 'মউতে আরবা' বা চার মৃত্যু যথা- 'মউতে আবয়্যাজ' সাদা মৃত্যু (রোজা ও সংযম), 'মউতে আছওয়াদ' কালো মৃত্যু (প্রশংসা ও নিন্দার উর্ধ্বে চলে যাওয়া), 'মউতে আহমার' লাল মৃত্যু (কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া), 'মউতে আখজর' সবুজ মৃত্যু (নির্বিলাস অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর তত্ত্বাবধানে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর উছুলে ছাবয়া স্মারক গ্রন্থের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী তরিকার মূল আদর্শ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক। আমি সার্বিক সফলতা কামনা করি।

শুভকামনায়

(প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ)
উপাচার্য
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

বাণী

সাম্প্রতিক বিশ্বে বিরাজমান সংকটাবর্তে সুফিবাদের উদার-মানবিক সৌহার্দ্য ও ভার্তৃত্বপূর্ণ ভাব-পরিমণ্ডল এক অতিলৌকিক ভাবধারা। তবে এটা বর্তমান বিশ্বে কার্যকরী অনুষঙ্গরূপে নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সুফিবাদ চর্চার উর্বর ভূমি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ চট্টগ্রামে অবস্থিত। বাংলাদেশে কাদেরিয়া-মাইজভাণ্ডারি তরিকার প্রবর্তক শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)-এর এ তরিকা ইহজাগতিক ও পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বময় মানবিক সংকট থেকে উত্তরণের সবচেয়ে পবিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে সুফিবাদের আলোকবর্তিকা। আত্মার পবিত্রতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানবতার পথে আত্মমুক্তির এ দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখে মাইজভাণ্ডারি তরিকা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং ইহজাগতিক সমূহবিপর্যয় থেকে মুক্তির মহত্তম কাজটি করে যাচ্ছে। শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) প্রবর্তিত 'উসুলে সাবয়া' বা সপ্তকর্মপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং আত্মমুক্তির পথ। এটি অনুসরণ করে যে কেউ দ্বিবিধ সাফল্য অর্জন করতে পারে। সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্রের নানাসংকটে বিপথগামী তরুণ প্রজন্মের জন্য এটি মুক্তির অন্যতম পাথেয় হতে পারে।

'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট' মাইজভাণ্ডারি তরিকার মৌল সাধনতত্ত্ব ও প্রণালী 'উসুলে সাবয়া' বা সপ্তকর্মপদ্ধতি বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও গবেষকদের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা নিয়ে 'উছুলে ছাবয়া স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ পদ্ধতির ভাবগত এবং বস্তুগত দিক মানবজীবনে আশাবাদের তথা মুক্তির বার্তা এনে দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

এ গ্রন্থ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই ধন্যবাদ।

প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান
উপাচার্য
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাণী

১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলন কেন্দ্র। ধর্মীয় পরিবেশে অসাম্প্রদায়িকতার এমন উদাহরণ অত্যন্ত বিরল। আন্তঃধর্মীয় কলহ ও ভেদাভেদ নিরসন ও সকলের মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এই দরবারের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড সকলের জন্য অনুসরণীয়।

গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) মানুষের মহৎ গুণাবলীর বিকাশের জন্য 'উছুলে ছাবয়া' বা 'সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি' প্রণয়ন করেছেন। এই 'সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি' মুলনীতি হচ্ছে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা; যা না হলেও চলে, এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; নিজ ইচ্ছা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করা; সংযম সাধনা; সমালোচনায় বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজকে সংশোধনের মনমানসিকতা অর্জন; কামস্পৃহা ও লোভ-লালসা হতে মুক্ত থাকা; নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া ইত্যাদি।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী সাহেবের তত্ত্বাবধানে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে প্রকাশিতব্য 'উছুলে ছাবয়া' স্মারক গ্রন্থের আমি সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রফেসর ড. অনুপম সেন
উপাচার্য
প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাণী

৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.

উপমহাদেশের অন্যতম আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। এ মহান দরবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) কোরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রবর্তন করেন।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় সাধনার একটি অনন্য আঙ্গিক হলো তজকীয়ায়ে নফ্স বা নিজের আত্মার পরিশোধন। তিনি কোরআন ও সুন্নাহর ভাবাদর্শের ভিত্তিতে মানবীয় সত্তার সজাগ বা কু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর লক্ষে 'উছুলে ছাবয়া' বা 'সপ্ত পদ্ধতি' অনুশীলন এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের এক হেদায়তের ধারা সূচনা করেন যা আজ সুফি পরিমণ্ডলে আদৃত ও স্বীকৃত।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর পৃষ্টপোষকতায় 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এর 'উছুলে ছাবয়া' স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অতিশয় আনন্দিত এবং আমি এ মহতি উদ্যোগের সফলতা কামনা করি।

(আ.জ.ম. নাছির উদ্দিন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাণী

চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ধর্মীয় পরিমণ্ডলে থেকেও যে অসাম্প্রদায়িকতা ও পর-ধর্ম সহিষ্ণুতাকে লালন করা যায় তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই দরবার সকল ধর্মের অনুসারীদের তীর্থস্থান।

এই দরবারের প্রাণ পুরুষ গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) যে সপ্তকর্ম পদ্ধতির দিশা দিয়ে গেছেন তা সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্য পালনযোগ্য একটি মডেল।

'ফানায়ে ছালাছা' বা ত্রি-লয় তথা- 'ফানা আনিল খাল্ক' সৃষ্টি থেকে কিছু আশা না করা (শুধু স্রষ্টা থেকে আশা করা), 'ফানা আনিল হা'ওয়া' অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মুক্ত হওয়া, 'ফানা আনিল এরাদা' খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া (স্বীয় ইচ্ছার অনুগত না হওয়া) এবং 'মউতে আরবা' বা চার মৃত্যু যথা- 'মউতে আবয়্যাজ' সাদা মৃত্যু (রোজা ও সংযম), 'মউতে আছওয়াদ' কালো মৃত্যু (প্রশংসা ও নিন্দার উর্ধ্বে চলে যাওয়া), 'মউতে আহমর' লাল মৃত্যু (কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া), 'মউতে আখজর' সবুজ মৃত্যু (নির্বিলাস অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা)।

এই নীতির বাস্তব অনুসরণ সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও আন্তরিকতার বন্ধন আরও দৃঢ় করবে বলে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) উছুলে ছাবয়ার মূর্ত প্রতীক। আমি তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

উছুলে ছাবয়ার বাণীকে সমাজের সকল স্তরে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার মহান ব্রতকে সামনে রেখে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'উছুলে ছাবয়া' স্মারক গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সফলতা কামনা করছি।

এম. জহিরুল আলম দোভাষ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাণী

চেয়ারম্যান
জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম

১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

সুফি সাধকদের অবদানেই ইসলাম বর্তমান পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মে পরিণত হয়েছে। সুফিবাদ ইসলাম ধর্মস্থিত কোন উপদল নয় বরং ইসলামের আধ্যাত্মিক মরমীবাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী ও ধারক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে সবসময় সুফি সাধকরাই ধর্মের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক কাঠামোর রক্ষকের ভূমিকায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও বিশ্বাসের সাথে আঞ্চলিক সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও সমাজের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের কারিগর হিসেবে কাজ করে আসছেন।

সুফি সাধনার ধারাবাহিকতায় গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রবর্তন করেন। মাইজভাণ্ডারী তরিকার আঙ্গিকে সুফি সাধনার অন্যতম মৌলিক অনুষঙ্গ হলো 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি।

'উছুলে ছাবয়া' এর আদর্শ তথা- পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা; যা না হলেও চলে, এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; নিজ ইচ্ছা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করা; সংযম সাধনা; সমালোচনায় বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজকে সংশোধনের মনমানসিকতা অর্জন; কামস্পৃহা ও লোভ-লালসা হতে মুক্ত থাকা; নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া-ইত্যাদি নিয়মিত অনুশীলন একজন সাধককে শুধুমাত্র সাধকে পরিণত করবে তা নয়, বরং একই সাথে একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক 'উছুলে ছাবয়া' স্মারক গ্রন্থের মাধ্যমে এই মহান বাণী সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাক এই কামনা করি।

এম.এ.সালাম
চেয়ারম্যান
জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



৫ মাঘ ১৪২৬
১৯ জানুয়ারি ২০২০

বাণী

পবিত্র কোরআনের ঘোষণানুযায়ী রাসুল (সঃ) এর যে চরিত্র তাই সর্বোচ্চ অনুসরণীয় চরিত্র। তিনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী। ইসলাম ধর্মে নিজ চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য বারবার তাগিদ এসেছে। আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উন্নত চরিত্রের মাধ্যমেই মানুষের বাহ্যিক উবুদিয়্যতের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এক হাদিসে হযরত রাসুল (সঃ) বলেছেন, "মুমিনদের মাঝে পূর্ণ ঈমানদার হচ্ছে সে, যার চরিত্র উত্তম।"

মানুষকে উন্নত চরিত্রের সোপানে আরোহনের জন্য গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কোরআন হাদিসের শিক্ষার আলোকে মাইজভাণ্ডারী তরিকার "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি এর প্রচলন করেন। 'উছুলে ছাবয়া'র নিয়মিত চর্চা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলি বিকশিত করার এক অনন্য মাধ্যম।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) উছুলে ছাবয়ার এক বাস্তব উদাহরণ। তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দারুল ইরফান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 'উছুলে ছাবয়া' স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি এই রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ হোসেন
জেলা প্রশাসক
চট্টগ্রাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

বাণী

সুফিবাদ এর চর্চা রাসুল (সাঃ) এর সময়কাল থেকেই হয়ে আসছে। কালের পরিক্রমায় এর নামে ও অবয়বতায় হয়তো বিভিন্নতা এসেছে তবে তরিকতের হাকিকত ছিল এক-অভিন্ন ও অবিকৃত। সুফিবাদ চর্চার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বহু তরিকা বিকাশ লাভ করে, যেমনঃ কাদেরীয়া, চিশতীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় মাইজভাণ্ডারী তরিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আত্মবিকাশের অতি অল্প সময়ের মাঝেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই তরিকা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সহজ পন্থা হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি, সার্বজনীন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এক অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে আমাদের সমাজ জীবনে স্থান করে নিয়েছে।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রবর্তন করেন। এ তরিকা ইসলামী ভাবাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করার পাশাপাশি একই সাথে অসাম্প্রদায়িক, উদার ও সংস্কারমুক্ত, নৈতিক ধর্ম-প্রাধান্যসম্পন্ন, শ্রেণি-বৈষম্যহীন ও মানবদরদী। এই তরিকা সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সাম্য, সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক অনুপম আদর্শ। মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরিসংশোধনের নিমিত্তে তিনি কোরআন-সুন্নাহর আলোকে 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির শিক্ষা দেন।

পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা; যা না হলেও চলে, এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; নিজ ইচ্ছা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করা; সংযম সাধনা; সমালোচনায় বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজকে সংশোধনের মনমানসিকতা অর্জন; কামস্পৃহা ও লোভ-লালসা হতে মুক্ত থাকা; নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া, ইত্যাদি 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির মূল আলোচ্য বিষয়।

উছুলে ছাবয়ার আদর্শকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ব্রত নিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। উছুলে ছাবয়া স্মারক গ্রন্থ প্রকাশকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং উছুলে ছাবয়ার মূল আদর্শ সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এ কামনা করি।

ডাঃ শেখ শফিউল আজম
ম্যানেজিং বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

ধর্মীয় পরিমণ্ডলই মানুষের নৈতিক শিক্ষা অর্জনের প্রধান ক্ষেত্র। পাশাপাশি মানুষকে তার পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে ও অনুগত রাখার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসই অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই আমরা দেখি যে, ধর্মহীন পরিবেশে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন অনেকটা শিথিল।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে একটি বৃহত্তর সমাজের সদস্য বিবেচনা করে সকলের মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতিবোধের উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্যে হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কোরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে উছুলে ছাবয়া বা আধ্যাত্মিক সাতটি কর্ম-পদ্ধতির দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মীয় কলহ দূরীকরণে এই সপ্ত-পদ্ধতি অতি কার্যকর একটি মাধ্যম। বিশ্ব মানবতার জন্য গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর এই দূর্লভ অবদান আবহমান কাল পর্যন্ত স্থায়ী ও অবিকৃত থাকবে।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর তত্ত্বাবধানে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর উছুলে ছাবয়া স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

মোঃ সায়েদুল আরেফিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর ঃ-

(ক) "ফানা আনিল খাল্ক" - অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

(খ) "ফানা আনিল হা'ওয়া" - অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা; যাহার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামিলা মুক্ত হয়।

(গ) "ফানা আনিল এরাদা" - অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যাহার ফলে ছুফী মতে "তছলীম ও রজা" হাছিল হয়।

মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু ঃ

(ক) "মউতে আব্য়্যাজ"- অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ব হয়; যাহার ফলে মানব মনে আলো ও উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। মহাত্মাগান্ধী কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলে উপবাস করিতেন এবং বলিতেন "উপবাসে আমি আলো পাই।"

(খ) "মউতে আছওয়াদ"- বা কাল মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লেখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজিয়া পায় তখন নিজকে উক্ত দোষ হইতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজিয়া না পায়, নিজকে দোষমুক্ত বলিয়া স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হইয়া নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন "বন্ধু" বলিয়া মনে করে।

(গ) "মউতে আহ্মর"-বা লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হইয়া অলিয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়।

(ঘ) "মউতে আখজার"-বা সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলেই ইহা হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকেনা। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

এই কোরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পন্থা; যাহা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

জনাব গৌতম বুদ্ধের অষ্টশীল নীতি হইতে ইহা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। যেহেতু সৎ, অসৎ বস্তুর তুলাদণ্ড বিচার বর্তমানে কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ। কঠোর সাধনা বা এবাদত, বর্তমান অতি কামনার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর যুগে সর্বসাধারণের নাগালের বাহিরে। এই সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ না হইয়া বরং বন্ধু সুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়।

এই সপ্ত পদ্ধতি, ইছলামী ছুফী মতবাদ মতে "ফানায়ে নফ্ছী" প্রবৃত্তির বিনাশ এবং "বাকাবিল্লাহ্‌র" বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামিলামুক্ত।

অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধির নিয়মানুবর্তীর সঙ্গে বিরোধাত্মক নহে। বরং উৎসাহ বর্দ্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী।

কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী। ইহা ব্যবসাদারী পীরত্বের সমর্থক নহে বরং নেহায়ত নিষ্কাম খোদা অনুরাগী। এই পীরী ব্যবসাদারী পতন যুগে, ইহা নৈতিক ধর্মের জীবন দানকারী ধ্রুবতারা।

যাহা ঐক্য ও সৃজনশক্তির শক্তিশালী আলো দানকারী। পবিত্র কোরানের পরিভাষায় যাহাকে (কাউকবে দুর্রী) کوکب دری বলা হইয়াছে।

খোদা অনুরাগী নীতিতে "নিছবতাইনে আ'দমী" বা বিগত আগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী বিধায়, "খাতেম" বা ছনদ্‌দাতা।

হজরত আক্‌দাছের এই সপ্ত পদ্ধতি বেলায়ত রহস্য; তাঁহার বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছিয়তের এক উজ্জ্বল নজীর। হাফেজ সিরাজী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর পরিভাষায় বলিতে হয়।

مژ گان تو تاتیغ جهانگیر بر آورد–بسکشته دل زنده که بر یکدیگر افتد

"তোমার চক্ষের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অসি বাহির করিল, তখন দিল ঘায়েল জিন্দা মানুষগুলি একের উপর অপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।"

মওলানা আবদুল হাদী রচিত রত্নভাণ্ডার ৩৬নং শে'এর ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ ঘোষণা করে।

চলগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরি বাজার।
প্রেম হাট বসাইয়াছে মাইজভাণ্ডার মাজার ॥
সেথায় এক মহাজন নূরে আলম গাউছ ধন।
সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার ॥
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটাফাটা দিল কিনিয়ে।
সেকান্দারী আয়না তাতে করেন তৈয়ার ॥

লেখা বিশ্বাসের পর্যায়ের বস্তু, ইহাতে মূলবস্তু দৃশ্যমান নহে। সেইজন্য নিজ গদি শরীফে হজরত কেবলা কা'বা আমাকে ঐ সময় কোরআন শরীফ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ দাদা ময়না! হরফ আছে কি?" তিনি এই রকম দুইবার দেখাইয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দুইবার নিজেই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সমস্ত হরফ উড়িয়া গিয়াছে।" কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাহাই সত্য। কোরআন পাকে যে লিখিত হেদায়ত বিদ্যমান আছে, সেইদিকে

খুব কম সংখ্যক লোকেরই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বাগদাদীর (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বাণী ঃ

كلام حضرت پيـران پيـر دستگير رضي الله عنه فى الفتح الربانى صفحه ٤٩ المجلس السادس

يا غلامى مـرادى انت لا انـا – وان تـتغيـر انت لا انا

عبـرت وانما وددتنـى لاجلك – تعلق بـى-حتى تعـبر بالعجلة

"ওহে আমার পেয়ারা, তুমি যখন আমার প্রতি তাকাও বা আগ্রাহান্বিত হও; আগাইয়া আস। আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্খী। তোমার জন্য দোওয়া করি। আর যখন আগ্রহ বিমুখ হও পিছু ফির আমি তখনও পূর্ববৎ থাকি এবং তোমার জন্য কাঁদি। যেহেতু পিছন দিকে কিছু দেওয়া লওয়ার নিয়ম নাই।"

এইরূপ কল্যাণকামী বহু ছুফী সাধকের হিতবাণী ও নৈতিক গ্রন্থাবলী লিখিত বিদ্যমান আছে; যাহার প্রতি জনগণ বিমুখ হওয়ার ফলে ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত।

হজরত কেবলা কা'বা খাতেমুল অলী ও অলদ্। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য খোদার বিশেষ দান "ফয়জে মোজাররদ।" পুকুরের মত কাহারো দ্বারে তিনি যাননা কিংবা কাহারো মুখাপেক্ষীও তিনি নহেন। সকলই তাঁহার দ্বারস্থ। তৃষ্ণাতুর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকামী জনগণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ্যতার ভাণ্ড লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে হয় এবং পাত্র অনুযায়ী তাঁহার দান নিয়া যায়।

এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের "অছী।" তিনি ওফাত হইবার কয়েক দিন পূর্বে আমাকে তাঁহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন হজরত আলী (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ) এঁর বাণী ঃ-

ديـوان على رضى الله تعالٰى عنه

وهذا العلم لـم يعلمـه الا – نـبـى او وصـى الانـبياء

"এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যাহা নবী অথবা নবীর অছী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারেনা।"

দিওয়ানে আলী (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ)

যাহা রূহানী প্রেরণা সম্ভূত "মলকুত এলহাম" বা এলহামী ফেরেস্তার কাজ কারবারের পর্যায়ভুক্ত। সুফি পরিভাষায় যাহাকে এলমে লদুন্নী বলা হয়।

* বেলায়তে মোত্‌লাকা, প্রকাশকাল : (২৫ মে ২০১৪ খ্রী:, পৃ: ৭০-৭৩)

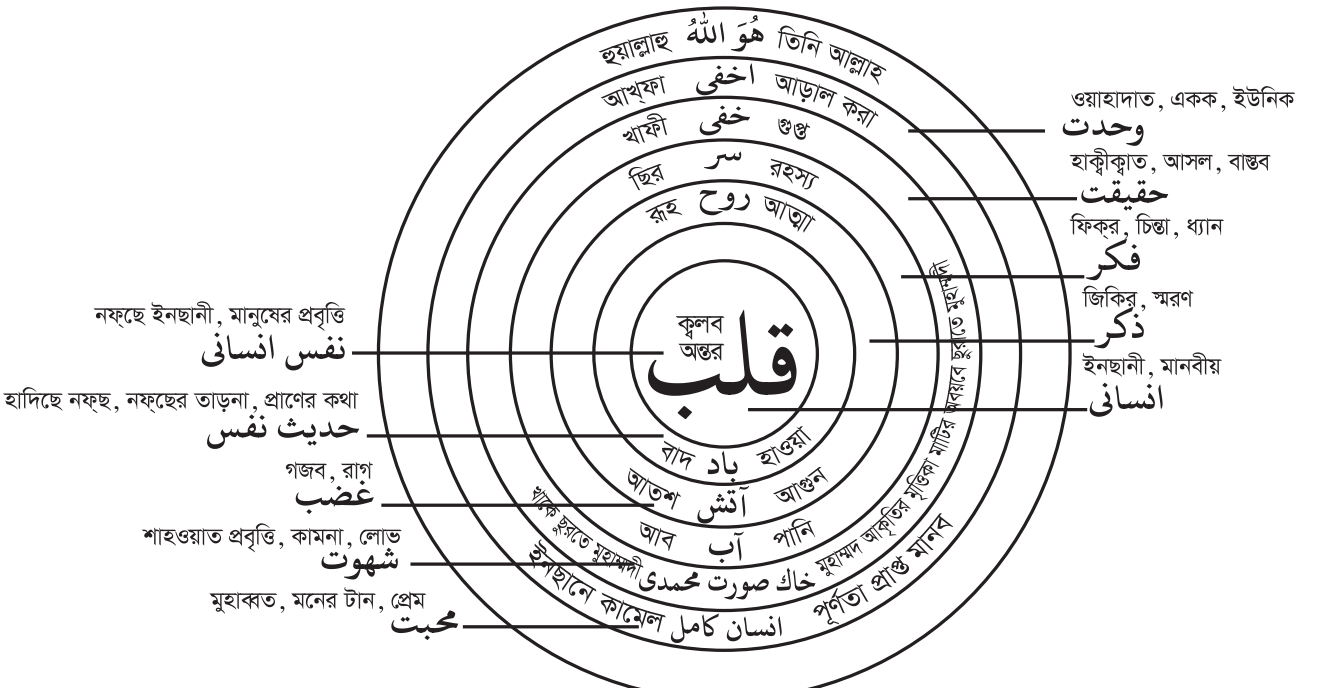

فما انت هو بل انت هو وتراه فى ☆ عين الامـور مسرحا ومقيـدًا

"ফামা আন্তাহুয়া বাল্ আন্তাহুয়া ওয়া তারাহুফী। আইনিল ওমুরি মুছ্‌রিহান ওয়া মুকায়্যিদান॥"

অর্থঃ তুমি সে নও বরং সে তুমি এবং তাকে তুমি দেখতে পাবে প্রত্যেক সৃষ্টির উৎসমূলে ব্যাপক ও সীমাবদ্ধভাবে।

২নং নক্‌শা-

		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
১।	নফ্‌ছের নাম	امّارة	لوّامه	ملهمه	مطمئنه	راضية	مرضية	كاملة
২।	কর্ম্ম	প্ররোচনা	অনুতাপ	স্রষ্টাপ্রেরণা	সন্তোষ	সন্তুষ্টি	তুষ্টিত	পূর্ণমানবতা
৩।	অবস্থান ক্ষেত্র	দৃশ্য জগত عالم شهادت	মধ্য জগত عالم برزخ	বাচ্চার দুগ্ধ স্পৃহা اهلاج	মানবতা حقيقت محمدى صلي الله عليه وسلم	رضا وتسليم তুষ্টি لاهوت বা অসীম দর্শন	যথাযথ স্রষ্টা জ্ঞান شهود ذاتى	বহুত্বে একত্ব দর্শন خفاء পূর্ণমানবতা বা انسان كامل
৪।	প্রকৃতি বা হাল	বাসনা ميل	ভালবাসা محبت	বাসনা শূন্য প্রেম عشق	মিলন বা وصلة	غناء বেপরওয়া ও নিশ্চিত	الحيرة বিভোর চিত্ত	بقاء بالله سير مع الله খোদা সঙ্গতি
৫।	অবতীর্ণ ধর্ম্ম	شريعت বা বিধান ধর্ম্ম	طريقت বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম	নিজ পরিচয় معرفت	প্রকৃত জ্ঞান বা حقيقت	খোদা তত্ত্ব জ্ঞান বা عرفان معرفت	شريعت ধর্ম্ম রহস্য مشيت ايزدى	উপরে বর্ণিত সমস্ত কিছু

মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, ৮ম প্রকাশ ১৫ মে ২০১৮ ইংরেজী, পৃ: ৩-৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি ইসলামি ফিকহের আলোকে

সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ. অর্থাৎ: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। এ ইসলামের উপর চলার জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল রাহমাতুল্লিল আলামিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রণীত পন্থা ও পদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়। আর শরিয়ত হলো ইসলামের ঐ মহান সড়ক, যার উপর প্রত্যেক মানুষ সহজে ও বিনা বাধায় চলতে পারে। আর তরিকত হলো শরিয়তের বিধি-বিধান অনুসরণের মাধ্যমে শরিয়তের রাস্তা অতিক্রম করে সামনের দিকে চলা, যেখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত সচেতন বান্দা ব্যতীত অন্য কেউ সহজে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। এক কথায়, তরিকত হল প্রকৃত সুফি-সাধকগণের এমন বাতানো পথ/পন্থা যাদ্বারা প্রকৃত আশেক-ভক্তগণ দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারেন। বস্তুত সুফি-সাধক ও অলি আল্লাহগণের বাতানো নির্দিষ্ট পথই তরিকত। যেমনি নির্দিষ্ট গলির মাধ্যমে দ্রুত মানুষ আপন গৃহে বা গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। তরিকতের এই পন্থাকে তাসাউফ বা সুফিবাদ নামেও অভিহিত করা হয়। তাসাউফ ও তরিকতের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ/কাজ হলো তাকওয়া ও তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। তরিকতের অনুসারী ব্যক্তিদের আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে এবং আল্লাহ-রাসুলের সন্তুষ্টির গন্তব্যে পৌঁছতে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও অন্যতম নিয়ামক। উছুলে ছাবয়া মূলত একজন মানুষকে তার মধ্যে লুকায়িত চারিত্রিক বিচ্যুতি তথা আমিত্ব, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ ও শয়তানি খাসলতকে পদদলিত ও দূরীভূত করে মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আধ্যাত্মিক মনস্ক করে তোলে। আর এই পরিশুদ্ধির কারণে ইবলিস শয়তান ও নফসে আম্মারার কুমন্ত্রণা, লোভ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি মন্দ রিপুগুলো আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে না। কারণ প্রত্যেক অপরিশুদ্ধ আত্মা মানুষকে সর্বদা অসৎ কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করে। কুরআনুল করিমের এই আয়াতখানা তার অকাট্য প্রমাণ-

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. অর্থাৎ নিশ্চয় মানুষের নফস তথা অপরিশুদ্ধ সত্তা মন্দ ও কুকর্মের প্রতি নির্দেশ দেয় । (সূরা ইউসুফ- ৫৩ নং আয়াত) "উছুলে ছাবয়া" মুলত অপরিশুদ্ধ আত্মার সেই বিচ্যুতি, প্রবণতা ও বিরোধিতা থেকে মানুষকে রক্ষা করে এবং সৎকর্মপরায়ণ করে গড়ে তোলে, তাই পরিশুদ্ধ আত্মার আমল/কাজসমূহ পূণ্যময় হয় এবং অপরিশুদ্ধ আত্মার আমল/কাজসমূহ মন্দ ও গুনাহের কারণ হয়।

আর ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের" এ ইসলামের ফিকহের বৃহৎ মূলনীতিসমূহের অন্যতম মূলনীতি হল الأمور بمقاصدها। অর্থাৎ প্রত্যেক কাজ তার উদ্দেশ্যের আলোকে বিচার ও মূল্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ভাল হওয়ার কারণে আমল বা পরিণামও হয় ভালো। আর উদ্দেশ্য মন্দ হওয়ায় পরিণামও হয় কঠিন ও মন্দের। আর সফলকাম ঐ আত্মা বিশুদ্ধ ব্যক্তি/বান্দা হয়, যার মধ্যে আত্মশুদ্ধি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. অর্থাৎ যে নিজকে শুদ্ধ করেছে, সে সফলকাম হয়েছে। (সূরা-আশ-শামস, আয়াত-০৯) অপর আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. অর্থাৎ যে নিজকে যাবতীয় অশ্লীলতা হতে পবিত্র করেছে, সে কামিয়াব হয়েছে। উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি মানুষকে নিজের কর্মকীর্তির দিক দিয়ে অনুগত করে ও পরিশুদ্ধ আত্মা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানবজাতির প্রতিপালন ও উন্নতি সাধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার মনস্তাত্ত্বিক, চেতনামূলক ও আধ্যাত্মিক দিক। পবিত্র হাদিসে উল্লেখ রয়েছে মানবাত্মাকে তিন প্রকার জিনিস/বস্তু ধ্বংস করে। যেমন হাদিসে পাকে এসেছে–

امّا المهلكات فهوئ متبع وشحّ مطاع واعجاب المرء بنفسه اشد هن -الحديث

অর্থাৎ ধ্বংসকারী জিনিসগুলোর অন্যতম হলো ১. প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, ২. লোভ-লালসার অনুগত হওয়া, ৩. কোনো ব্যক্তি/মানুষ নিজেকে বড় বা সম্মানিত মনে করা। তবে এই স্বভাবটি সবচেয়ে মারাত্মক। (মিশকাত শরিফ) রাগ ও অহংকার অধ্যায় ও শুয়াবুল ইমানকৃত ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন- এক ব্যক্তি হুজুর পুরনূর রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামার দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমাকে উপদেশ ও নসিহত প্রদান করুন। প্রিয় নবি ইরশাদ করেন, لا تغضب অর্থাৎ তুমি রাগ করো না। ঐ ব্যক্তি কয়েকবার একই প্রশ্ন করলে রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বার বললেন-তুমি রাগ করো না। (সহিহ বোখারী শরিফ)

হাদিস ব্যাখ্যাকারীগণ উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর অবস্থা ও চরিত্রের দিকে লক্ষ রেখে উত্তর প্রদান করতেন। যেহেতু প্রশ্নকারী লোকটি কথায় কথায় রাগে-ক্রোধে হিতাহিত ও জ্ঞানহারার মতো হয়ে অনেক কুকর্মের দিকে ধাবিত হতো। তাই তাকে বারবার তিনি একই উত্তর প্রদান করেছেন, যাতে ঐ অভ্যাস হতে ফিরে আসে। (মেরকাত শরহে মেশকাত–উপরোক্ত অধ্যায়) এ জন্য ইসলামি ফিকহ তথা ইসলামি শরিয়ত অতিরিক্ত রাগ, ক্রোধ, অহংকার, আমিত্ব, সন্ত্রাস, জুলুম, অত্যাচার, ব্যভিচার, হামবড়াই,

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, লোভ-লালসা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, মারামারি, খুনা-খুনি, হানাহানি ও অন্যায় আচরণসহ যাবতীয় ফিস্ক/নাফরমানিকে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ সব কু-অভ্যাস পরিহার ও বর্জন করতে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম- পদ্ধতির অনুসরণ ও অনুকরণ নেহায়ত জরুরি।

তাই বিশুদ্ধ নিয়ত ও দৃঢ় সংকল্প ছাড়া যত বড় ইবাদত বন্দেগি হোক না কেন, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, সদকা-দান-দক্ষিণা ইত্যাদিতে সাওয়াব ও নেকি অর্জন করা যায় না। বরং নিষ্ফল হয়ে যায়। যেমন ইসলামি ফিকহের অন্যতম ধারা হলো لا ثواب الا بالنية অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিয়ত ও দৃঢ় সংকল্প ছাড়া কোনো ইবাদতে পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি পাওয়া অসম্ভব। যেমন আঙ্গুরের বৃক্ষ রোপণ করা কোনো সময় সওয়াব আবার কোনো সময় গুনাহ। অথচ একই কাজ! যদি নিয়ত ও উদ্দেশ্য হয় এ আঙ্গুরের গাছে যখন আঙ্গুর ফল আসবে, আমিও আহার করব, ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনকে আহার করাব। তখন আঙ্গুর গাছ লাগানো সাওয়াব ও ইবাদত। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আঙ্গুর গাছে যখন ফল আসবে আমি আঙ্গুর ফলের রস হতে শরাব/মদ বানাব। শরাব/মদ বানিয়ে নিজেও খাব অন্যজনকে দিব, তখন আঙ্গুর গাছ লাগানো এবং সে গাছের পরিচর্যা করা সবই গুনাহ ও হারামে পরিণত হবে। (কিতাবুল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের, প্রথম খণ্ড, কৃত ইমাম ইবনে নুজাইম হানাফী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)

সুতরাং নিসন্দেহে দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যাবে যে, উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি যেমন- ১. ফানা আনিল খাল্ক তথা কারো নিকট কোনোরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কামনা না করা, যা দ্বারা মানুষের অন্তর আত্মনির্ভরশীল হয় এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিজকে বাঁচানো যায় এবং মহান আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয়। ২. ফানা আনিল হা'ওয়া তথা কুপ্রবৃত্তি কে ধ্বংস করে বেহুদা কাজকর্ম, কথাবার্তা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা। ৩. ফানা আনিল এরাদা তথা স্বীয় ইচ্ছা শক্তি ও কামনা- বাসনাকে ধ্বংস করে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা ও মর্জির ওপর সবকিছু উৎসর্গ ও বিলীন করে দেয়া। তাসাউফের পরিভাষায় যাকে তসলিম ও রযা বলা হয়। ৪. মউতে আবয়্যাজ। ৫. মউতে আছওয়াদ, ৬. মউতে আহ্‌মর ও ৭. মউতে আখজার (যার ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে)। ফিকহ-ফতোয়ার দৃষ্টিকোণে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ, হালাল-হারাম, যা ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান, জায়েজ, ফরজ, মাকরূহ এক কথায় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মানব জীবনের সকল স্তর, রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, বৈবাহিক জীবন, সাংসারিক জীবন, ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবনে পরম সফলতা ও কামিয়াবি সর্বোপরি আল্লাহ-রাসুলের সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি অর্জনের মহান সোপান হলো উছুলে ছাবয়া। যেটা প্রকৃত মুমিন-মুত্তাকি বান্দার পরম লক্ষ ও

গন্তব্যস্থল। পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেন সবাইকে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি বোঝার ও হৃদয়ে ধারণ করার তাওফিক দান করেন। আমিন। ইয়া-রাব্বাল আলামিন বেহুরমতে সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া-আলিহি ওয়া-আসহাবিহি আজমাঈন।

অধ্যক্ষ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে উছুলে ছাবয়া এর ফানায়ে ছালাছা

কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

মহান আল্লাহ মুমিনদের পরিপূর্ণ সাফল্যের লক্ষে পবিত্র কুরআনে অনেক নির্দেশনা পেশ করেছেন। যথা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দিকে ওয়াছিলা তালাশ কর এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। নিশ্চয় তোমরা সফল হবে। (আল-কুরআন)

পার্থিব ও পরকালীন সব বিষয়ে সাফল্যের জন্য ওয়াছিলা বা মাধ্যম অপরিহার্য বিষয়। এ বিষয়টি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। বৈষয়িক ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য যেমনিভাবে যোগ্য শিক্ষক, প্রশিক্ষক, পথপ্রদর্শক ছাড়া পূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। তেমনিভাবে ইসলামের যথার্থ অনুসরণ করত উভয় জগতের পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রেও মাধ্যম ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও তাকওয়া অর্থাৎ ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের লক্ষে ওয়াছিলা বা মাধ্যম অবলম্বনের নির্দেশনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ্। ঐ মাধ্যম বলতে ব্যাখ্যায় যা বর্ণিত, তন্মধ্যে কামেল পীর ও মুর্শিদ অন্যতম। অতঃপর জিহাদ বলতে বড় জিহাদ হলো, "নফ্‌সের" সাথে জিহাদ বা মোকাবিলা। ঈমানদারের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো এ জিহাদ। ইসলামের শত্রুর সাথে জিহাদ যেমন জানবাজি সহকারে করতে হয়, তার চেয়ে অধিক কষ্ট করতে হয় নফ্‌সের সাথে জিহাদে। অতএব, কামিল পীরের হাতে "বায়আত" গ্রহণের পর একজন ঈমানদারের দায়-দায়িত্ব ও কর্মযজ্ঞ অনেক বৃদ্ধি পেতে হবে। কু-প্রবৃত্তির সফল মোকাবিলা করে 'মনযিলে মকছুদে' পৌঁছতে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। বায়াত হওয়ার পর এ মর্মে আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত হবার সুযোগ নেই যে, আমার আর কিছুই করতে হবে না। পীর সাহেব আমাকে পার করে দেবেন। এটা শয়তানি ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর যেমন ছাত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক আইন মেনে অবশ্যই চলতে হয়, তেমনিভাবে তরিকতের দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তিও আইনের আওতায় এসে যায় এবং সাফল্য অর্জনের লক্ষে তার সঠিক অনুশীলন অপরিহার্য।

হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত- "উছুলে ছাবয়া"ও একজন মুরীদের তরিকত এর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্যের অনন্য উপায়। এর সবগুলোই হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফের সারকথা।

এক: فناء عن الخلق **(ফানা আনিল খাল্ক) :** অর্থাৎ কারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। যার ফলে মানবমন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

আলোচ্য সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের মধ্যে মানবজীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের সঠিক দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির ভাগ্য উন্নয়নের দিক-নির্দেশনা এভাবেই বর্ণনা করেছেন–

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজের অবস্থার পরিবর্তন করবে না। (আল-কুরআন)

নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে বা অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে ভাগ্যের পরিবর্তন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বরং বান্দাকে সব সময় মহান আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যেতে হবে। তাই পবিত্র হাদিসে বর্ণিত–

اذا استغث فستعن بالله .

অর্থাৎ যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। উল্লেখ্য যে, নবি-অলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা, এটা মূলত আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনারই সফল পদ্ধতি। কারণ, মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য তাঁর বান্দাদের মাধ্যমেই আসবে। মহান স্রষ্টা প্রদত্ত দৈহিক সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হলে সাফল্য নিশ্চিত। তাই প্রিয় নবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ভিক্ষাবৃত্তিকে পরিপূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন। কোনো একজন সাহায্য প্রার্থীকে কাঠ কেটে জীবন জীবিকা নির্বাহের প্রতি পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী শরিফ দ্রষ্টব্য)। পরের সাহায্য নিয়ে চললে মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে। আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। ঈমানদারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা– **وعلى ربهم يتوكلون .**

অর্থাৎ ঈমানদার তাঁদের রবের ওপরই ভরসা করেন।

দুই: فناء عن الهوى **(ফানা আনিল হা'ওয়া):** অর্থাৎ যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সফল ঈমানদারগণের পরিচয় দিয়ে বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঐসব ঈমানদার সফলকাম- যারা তাদের নামায বিনয় ও খোদাভীতি নিয়ে আদায় করে এবং অযথা কাজ থেকে বিরত থাকে। (সূরা মুমেনুন)

আলোচ্য আয়াতে وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ .

অর্থাৎ যারা অযথা- "যা না হলে চলে, যা না বললে চলে", ইত্যাদি বিষয় থেকে বিরত থাকার মধ্যেই একজন ঈমানদারের ঈমান, ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত। যথা পবিত্র হাদিসে বর্ণিত- مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ .

অর্থাৎ একজন মুসলমানের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণ সাফল্য অযথা নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করার মধ্যে।"

সুতরাং "ফানা আনিল হা'ওয়া" এর বিষয়টির ভিত্তি নিঃসন্দেহে কুরআন ও হাদিসের ওপর।

তিন ॥ فناء عن الارادة (ফানা আনিল এরাদা) : অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা। যার ফলে সুফি মতে তসলিম (تسليم) ও রজা (رضا) হাসিল হয়।

আলোচ্য মূলনীতিই হচ্ছে 'ইসলাম' শব্দের বাস্তব প্রতিফলন। ইসলাম শব্দটি আরবি, এর অর্থ হলো- الاسلام مسلمان شدن وگردن نهادن بطاعت .

ইসলাম শব্দের অর্থ হলো- মুসলমান হওয়া এবং আল্লাহ্-রাসুলের আনুগত্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম ও তসলিম এর মূল হচ্ছে سلم (সালমুন)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, রাসুল ও উলুল আম্র এর আনুগত্য কর।

"উলুল আম্র" এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জরীর তাবারী- ১৪টি রেওআয়াত পেশ করেছেন। যার মর্ম হলো- জ্ঞানী ফকীহগণ, মুজতাহিদগণ ইত্যাদি। ব্যাপক অর্থে কামিল পীর ও মুর্শিদ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। কারণ, একজন কামেল পীর তাঁর মুরীদকে শরিয়ত-তরিকত এর পথে সঠিক নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় সমাধান দিতে অবশ্যই সক্ষম। অতএব, যখন বান্দা নিজেকে আল্লাহ-রাসুল এবং "উলুল আমর" এর পরিপূর্ণ আনুগত্যে আত্মনিবেশ করবেন, তখন তার নিজস্ব ইচ্ছে আর থাকবে না। "ফানা আনিল এরাদা"র স্তরে উন্নীত হবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত সুলতানুল আরেফীন বায়েযীদ বোস্তামী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর অমূল্য বাণী– اريد ان لا اريد .

অর্থাৎ এখন আমি দৃঢ় ইচ্ছাপোষণ করছি যে, আমি আর কোনো ইচ্ছে করব না। অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ রাসুলের ইচ্ছে মোতাবেকই পরিচালিত হবো। আর মুরীদেরই সংজ্ঞাই হলো– المريدمن يفنى ارادته فى ارادة الشيخ .

অর্থাৎ মুরীদ ঐ ব্যক্তি যে নিজের ইচ্ছেকে পীরের ইচ্ছের মধ্যে বিলীন করে দেয়।

শায়খুল হাদিস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

প্রসঙ্গ উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে অবস্থিত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ইসলাম প্রচার তথা তাসাউফ চর্চার একটি 'বিশ্ব কেন্দ্র'। সেখানকার মূলধারার বর্তমান সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল ও আওলাদে অলি শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মদ্দা জিল্লুহুল আলি) এঁর একমাত্র সাহেবজাদা ও নায়েবে সাজ্জাদানশীন সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মদ্দা জিল্লুহুল আলি) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর অঙ্গসংগঠন দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (যা একটি গবেষণাধর্মী মানব কল্যাণমূলক সংগঠন) কর্তৃক 'উছুলে ছাবয়া' স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং রাসুলে কারীম, নুরে মোজাচ্ছাম, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হায়াতুন নবি, সাইয়্যেদুল মুরছালিন, আল্লাহ্র রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর প্রতি অসংখ্য অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি। অতঃপর 'উছুলে ছাবয়া' নিয়ে কিছু বলার ও লিখার ইচ্ছা পোষণ করছি, যা মাকাসিদে শরিয়াহ অনুধাবন ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এ লক্ষ্যে প্রথমেই 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নে কিছু মূলকথা উপস্থাপিত হলো–

ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর :

(ক) "ফানা আনিল খাল্ক" অর্থাৎ কারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

(খ) "ফানা আনিল হা'ওয়া" অর্থাৎ যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়।

(গ) "ফানা আনিল এরাদা" অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা, যার ফলে সুফি মতে "তসলিম ও রজা" হাসিল হয়।

মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু :

(ক) "মউতে আবয়্যাজ" অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ব হয়; যার ফলে মানব মনে আলো ও উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। মহাত্মা গান্ধী কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে উপবাস করতেন এবং বলতেন " উপবাসে আমি আলো পাই।"

(খ) "মউতে আছওয়াদ" বা কালো মৃত্যু। শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাসিল হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লিখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজে পায় তখন নিজেকে উক্ত দোষ হতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজে না পায়, নিজেকে দোষ মুক্ত বলে স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন "বন্ধু" বলে মনে করে।

(গ) "মউতে আহ্‌মর" বা লাল মৃত্যু। কামভাব ও লালসা হতে মুক্তিতে হাসিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়ে অলিয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়।

(ঘ) "মউতে আখজার" বা সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেই তা হাসিল হয়। যার ফলে মানব অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালোবাসা ছাড়া অন্য কামনা বাসনা থাকে না। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

এই কুরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পন্থা; যা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ না হয়ে বরং বন্ধুসুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়।

এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি, ইসলামি সুফি মতবাদ মতে "ফানায়ে নফ্‌ছী" প্রবৃত্তির বিনাশ এবং "বাকাবিল্লাহ্‌র" বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলামুক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা নিসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, 'উছুলে ছাবয়া' বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের এ 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি' বাস্তব জীবনে মাকাসিদে শরিয়াহ্‌ অনুধাবন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং আমাদের পরকালীন জীবনের অনন্ত শান্তির আবহ তৈরিতে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই এ শান্তির বাণী বিশ্বময় তুলে ধরতে পারলে বিশ্ব মানবতা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌। আর এ শান্তির বাণী বিশ্বময় সহজভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ অধম মুহাম্মদ আতাউর রহমান মিয়াজী কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা প্রাণাধিক প্রিয়তম নবিজি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর সাদাকায় বিষয়গুলো ধারণ করার ও বিশ্বময় পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন ! ছুম্মা আমিন ! ! ইয়া রাব্বাল আলামীন ! ! !

চেয়ারম্যান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উছুলে ছাবয়ার আলোকে ধর্মীয় স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শফিউল হাসান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাস্থ্য মানে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাস্থ্যকে বোঝানো হয়। আমরা সাধারণত শারীরিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু মানসিক ও ধর্মীয় স্বাস্থ্যকে আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করি না। কারণ হলো শারীরিক স্বাস্থ্য দৃশ্যমান আর মানসিক স্বাস্থ্য সবার কাছে দৃশ্যমান নয়। অথচ শরীর নিয়ন্ত্রণ করে মন-মস্তিষ্ক। গুরুত্বপূর্ণ মনের সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। সুস্থ মনের জন্য ধর্মীয় স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে। ইসলাম ধর্মে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন সৎকাজ করা, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা।

কুরআনে করিমে আল্লাহপাক বলেছেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ . (آل عمران: ١١٠)

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে।” মানুষ যখন সৎ কাজ করে তখন মনে প্রশান্তি আসে, আর যখন অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তখন নিজেকে অপরাধী মনে করে। যার ফলে মনে অশান্তি বিরাজ করে। ফলে মনে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন রীতিনীতি মানুষকে অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। যার ফলে মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিমদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। তার কারণ হলো ধর্মীয় ভীতি।

ইসলাম ধর্মের মতে, যারা আত্মহত্যা করে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে হবে এবং পরকালের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষ যখন দুশিন্তা রোগে আক্রান্ত হয় তখন বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করে। এমন কি দুশ্চিন্তা প্রতিরোধে সহায়তা করে। বিশেষ করে জিকির করার মাধ্যমে মন প্রফুল্ল থাকে এবং মানসিক সমস্যা দূরীভূত হয়। যারা বিবিধ নেশা জাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত হয় তাদেরকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য ইন্দোনেশীয়ার মনোবিজ্ঞানীরা ধর্মীয় ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মনোচিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন, যা সারা বিশ্বে অনুসরণ করা হচ্ছে বিভিন্ন নামে। মাদকাসক্তি সমস্যা সারা বিশ্বে বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বে মারাত্মক মানসিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সারা বিশ্বে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, তার পেছনে মাদকাসক্তির কারণ বেশি। একমাত্র

ধর্মীয় অনুশাসন মানুষকে এধরনের মারাত্মক সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। ইসলাম ধর্মে মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। যেকোন ধরনের মাদক সেবনকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে, যার ফলে মুসলিম দেশে মাদকের ব্যবহার উন্নত দেশের চেয়ে অনেক কম। আমেরিকার মতো দেশে আমার জানা মতে, মদ্যপান করা এবং গাঁজা সেবন করা আইনগতভাবে বৈধ। যার ফলে সেখানকার মানুষ বিশেষ করে যুবসমাজ মাদকাসক্তি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত। ধর্মীয় চর্চার ফলে মানুষের শরীর যেমন সুস্থ্য থাকে, তেমনিভাবে মানুষ মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারে।

মানসিক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার জন্য আমাদের দেশে ধর্মীয় পন্থা অবলম্বন করে "উছুলে ছাবয়া" এর মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ-এ সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের মনকে সুস্থ রাখতে হলে ধর্মীয় স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে তরিকত পন্থার অনুসরণকে।

যেহেতু আমাদের প্রিয় নবি বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) আখেরী নবি, সুতরাং বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে পীর-বুজুর্গরা রাসুলের তরিকা অনুসরণের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশীলন পালনের জন্য অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন। যার ফলে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন। আত্মাকে সুস্থ রাখতে পারলে মানসিক সমস্যা দূরীভূত হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা কুরআনে করিমে ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي (الفجر:٢٨-٣٠)

'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাহদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'

অধ্যাপক
মানসিক রোগ বিভাগ
ইউ.এস.টি.সি.
বি বি এম এইচ, ফয়েজ লেক
এক্স সহযোগী অধ্যাপক
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

মাকাসিদে শরিয়াহ অনুধাবন ও বাস্তবায়নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

তাসাউফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তরিকত তাসাউফ দর্শনেরই একটি পরিভাষা ও ইসলাম সমর্থিত আত্মশুদ্ধির পন্থা। মুসলিম বিশ্বে কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকাসহ সুপ্রসিদ্ধ তরিকাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত শায়খগণ তরিকতের বহু শাখা-প্রশাখা প্রবর্তন করেছেন। তন্মধ্যে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকা একটি স্বতন্ত্র রূপ। যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন তরিকতের শায়খগণ মানুষের হেদায়ত ও আত্মশুদ্ধির জন্য পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামি শরিয়তের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। الاصول السبعة (আল্-উছুলুস ছাবয়া) অর্থাৎ সপ্তকর্মনীতি বা পদ্ধতি হলো গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত বিশ্ব মানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের লক্ষে তাসাউফ চর্চায় তরিকতের একটি প্রজ্ঞাময় কর্মপদ্ধতি।

الاصول (আল-উছুল) শব্দটি الاصل (আল-আছল) আরবী শব্দের বহুবচন, এর অর্থ মূল, বংশ-গৌরব, মূল নীতিমালা, শিকড়, উৎসসমূহ, কারণসমূহ, ভিত্তি, মূলধনসমূহ, আমলসমূহ, নিয়মাবলী, রীতি-নীতি ও শিষ্টাচার। السبعة (আছ-ছাবয়া) শব্দের অর্থ হলো সপ্ত, আর الاصول السبعة (আল-উছুলুছ ছাবয়া) বলতে মাইজভাণ্ডারী তরিকার সপ্তমূলনীতি, সপ্তআমল, সপ্তকর্মনীতি, সপ্তকর্ম পদ্ধতি। মাইজভাণ্ডারী তরিকার এ কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো– নফস ইনসানী তথা কু-প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটিয়ে রূহে ইনসানী তথা সু-প্রবৃত্তি সৃষ্টির মাধ্যমে সহজ পন্থায় মহান আল্লাহর কুরবত তথা নৈকট্য লাভ ও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রেযামন্দী অর্থাৎ সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মহান আল্লাহ বলেন-.ادْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"(হে নবী!) আপন রবের পথের দিকে আহ্বান করুন পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা" (আল-কুরআন, ১৬:১২৫)।

সাধারণত মানবাত্মা তিন ধরনের হয়। যথা-

১. النفس الامارة (আন-নাফসুল আম্মারা) গর্হিত কর্মে প্ররোচনাকারী আত্মা, অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তি।

২. النفس اللوّامة (আন-নাফসুল লাওয়ামা) গর্হিত কর্মে তিরস্কারকারী আত্মা, অর্থাৎ সু-প্রবৃত্তি।

৩. النفس المطمئنة (আন-নাফসুল মুতমায়িন্নাহ) স্থির চিত্ত, প্রশান্তময় আত্মা।

উপর্যুক্ত তিন প্রকারের আত্মার মধ্যে প্রথমোক্তটি মানুষকে নফসে ইনসানী অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তির দিকে আহ্বান করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ত মানবাত্মা মানুষকে রূহে ইনসানী তথা সুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে।

মানুষের নফসে ইনসানী তথা কু-প্রবৃত্তির ধ্বংস ও বিনাশের জন্য মাইজভাণ্ডারী তরিকার দর্শন অনুযায়ী الاصول السبعة (আল-উছুলুছ ছাবয়া) বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি মানবাত্মার রিপুর বিনাশে মুক্তির দিশারী হিসেবে কাজ করে এবং মনন প্রকৃতির উন্নতি সাধন করে। ফলে এটা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। এটাই মাইজভাণ্ডারী তরিকার মূল দর্শন হিসেবে খ্যাত। এ সপ্ত পদ্ধতি দু'ভাগে বিভক্ত-

১। الفناء الثلثة (আল-ফানাউছ ছালাছা) - অর্থাৎ তিন প্রকার রিপুর বিনাশ স্তর।

২. الموت الأربع (আল-মাউতুল আরবা') - অর্থাৎ চার প্রকারের মৃত্যু।

মাইজভাণ্ডারী দর্শন অনুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করে এবং চার প্রকার মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করে মারেফাতে ইলাহী জগতে অর্থাৎ ফানা ফিল্লাহ-য় উন্নীত হয়ে স্রষ্টা সম্পর্কে এক কাশফী জ্ঞান লাভ করে। 'কাশ্‌ফ' হলো তরিকতের শায়খদের আত্মার উন্নতির একটি স্তর। ফানায়ে ছালাছা তথা মানব রিপুর ত্রিবিধ স্তরগুলো নিম্নরূপ-

(ক) فناء عن الخلق (ফানা আনিল খাল্ক)

এটা হলো, সৃষ্টির প্রতি বিমুখ হয়ে স্রষ্টার অভিমুখী হওয়া। অর্থাৎ কারো নিকট পার্থিব কোন উপকারের আশা বা কামনা না করা। এতে মানব আত্মনির্ভরশীল হয়। নিজ শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি আস্থাশীল হয়ে খোদা প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।

মহান আল্লাহ বলেন- لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না; কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ" (আল-কুরআন, ২:২৮৬)।

মহান আল্লাহ বলেন-.وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى

"নিশ্চয় মানুষের জন্য তার চেষ্টার বাইরে কিছুই নেই" (আল-কুরআন, ৫৩:৩৯)।

আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির মৃত্যু হয় না। তাদের আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী স্থায়ী হয়। তরিকত জগতে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) প্রেম, কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার ফলে যেমন খোদাপ্রাপ্তি সহজ হয়, তেমনি পার্থিব জীবনেও ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে।

মহান আল্লাহ বলেন- إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে" (আল কুরআন, ১৩:১১)।

(খ) فناء عن الهوى (ফানা আনিল হা'ওয়া)

هوى শব্দের অর্থ হলো প্রেম, ভালোবাসা, ভালোবাসার বস্তু, আবেগ, অনুরাগ, ঝোঁক, পছন্দ, ইচ্ছা, কামনা, প্রবৃত্তি, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, খেয়াল, কল্পনা। সুতরাং 'ফানা আনিল হা'ওয়া' হলো– পার্থিব আবেগ-অনুরাগ, প্রবৃত্তি ও কল্পনা থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ যা না হলে চলে এমন কাজ কর্ম, কথা-বার্তা ও অপ্রয়োজনীয় কার্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখা। ফলে মানুষের জীবন যাপনে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান পালন সহজ হয়, মাকাসিদে শরিয়াহ-এর অনুধাবন ও বাস্তবায়নে মানুষ আগ্রহী হয়। এটাই তাসাউফ দর্শনের স্বরূপ ও প্রকৃতি। 'ফানা আনিল হা'ওয়া' মানুষকে ইসলামি শরিয়তের পাবন্দ বানায়। মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى.

"ওই ব্যক্তি, যে আপন রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে এবং নফসকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, নিশ্চয়ই জান্নাতই তার ঠিকানা" (আল-কুরআন, ৭৯:৪০-৪১)।

মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.

"নিশ্চয় মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনয়-নম্র হয়েছে এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করে না" (আল-কুরআন, ২৩:১-৩)।

মহান আল্লাহ বলেন- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

"নিশ্চয় লক্ষস্থলে পৌঁছেছে, যে সেটাকে (আত্মাকে) পবিত্র করেছে এবং সে নিরাশ হয়েছে, যে সেটাকে (আত্মাকে) পাপের মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে" (আল কুরআন, ৯১:৯-১০)

রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরিহার করার মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য বিরাজমান (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৩১৮)

রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য সর্বাধিক জিনিস অধিক ভয়ের কারণ মনে করি, তা হলো- কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ লালসা ও আকাঙ্ক্ষা, নিশ্চয় কু-প্রবৃত্তি (মানুষকে) সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে আর অনাবিল আকাঙ্ক্ষা পরকালকে ভুলিয়ে দেয় (বায়হাকী, মিরকাত)।

সুতরাং মানুষকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে লোভ-লালসা ও কু-প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকতে হবে। নিজেকে মহান আল্লাহ অভিমুখে সঁপে দিতে হবে।

(গ) فناء عن الارادة (ফানা আনিল এরাদা)

إرادة (এরাদা) শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা, পছন্দ, কামনা। সুতরাং 'ফানা আনিল এরাদা' হলো– মানুষের নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বিলীন করে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া। এতে তাসাউফের দৃষ্টিতে তসলীম ও রজা হাসিল হয়। মহান আল্লাহর

বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাপনার উপর সন্তুষ্ট থাকা হলো তাসাউফের শিক্ষা। এতে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়। এতে আল্লাহর প্রতি প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে বিলীন করাই হচ্ছে আল্লাহর জন্য নিজেকে কুরবানী করা। মহান আল্লাহর বাণী- قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"হে নবী! আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানীগুলো আমার জীবন এবং আমার মরণ–সবই আল্লাহর জন্য যিনি রব সমগ্র জাহানের" (আল-কুরআন; ৬:১৬২)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন - أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ.

"আল্লাহ কি আপন বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?" (আল-কুরআন; ৩৯:৩৬)।

বান্দা যখন নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে তখন আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। তাসাউফের শিক্ষা হলো মানুষ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবে।

২. الموت الاربع (আল্-মাউতুল আরবা')

মাইজভাণ্ডারী তরিকার দর্শন অনুযায়ী الموت الاربع (আল্-মাউতুল আবরা') বলতে মানুষের কাম, কামনা, বাসনা, কু-প্রবৃত্তি এবং প্ররোচনাকারী নফসের মৃত্যুর কথাই বুঝিয়েছেন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)-এর সুফি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এ ধরনের নফসের মৃত্যুর পর কলব পুনরায় জাগ্রত হয় এবং মহান আল্লাহর কুদরত অর্থাৎ নৈকট্য অর্জন হয়। এতে মানুষের চিরস্থায়ী সুখের জীবন লাভ হয়। এটাকে তাসাউফ দর্শনে হায়াতে আবদী বলা হয়।

الموت الاربع (আল-মাউতুল আরবা') অর্থাৎ চার প্রকারের মৃত্যু নিম্নরূপ -

(ক) الموت الابيض (আল-মাউতুল আবয়্যাজ)

এটা উপবাস, ত্যাগ ও সংযমে অর্জিত হয়। ফরয ও নফল রোযার মাধ্যমে এর স্বাদ অর্জন করা যায়। ابيض (আবয়্যাজ) শব্দের অর্থ হলো সাদা, উজ্জ্বল, পরিষ্কার, মহৎ, নিষ্কলঙ্ক। মানুষ যখন সিয়াম সাধনা করে, তখন মানুষের মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। মানুষ তাকওয়া অর্জন করে এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। এতে অন্তরের তকদিস অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জিত হয়। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সর্বদা মুরিদদেরকে ফরয ও নফল রোযা রাখার তাগিদ দিতেন। রোযার মাধ্যমে মানুষের রিপুর দমন হয়। এটাই হলো الموت الابيض (আল্-মাউতুল আবয়্যাজ)। অতঃপর মানুষের কলব বা অন্তর নতুনভাবে জাগ্রত হয়।

মহান আল্লাহ বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিলো। যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়" (আল-কুরআন, ২:১৮৩)।

হাদিসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-. الصوم لى وانا اجزى به "রোযা আমার জন্য আমিই এর প্রতিদান দেবো" (বুখারী ও মুসলিম)।

রোযার মাধ্যমে মানুষের (রোযাদারের) পাপ বিদগ্ধ হয়। ফরয রোযার মাধ্যমে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি স্তম্ভ বাস্তবায়নও হয়ে যায়।

(খ) الموت الاسود (আল্-মাউতুল আছওয়াদ)

الاسود (আল-আছওয়াদ) শব্দের অর্থ হলো কালো, কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামল। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে الموت الاسود বা কালো মৃত্যু অর্জন হয়, শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দায়। ফলে অপরের সমালোচনার পর সালেক আত্মশুদ্ধির বিষয়টি বুঝতে পারে। সুতরাং দোষ পরিত্যাগ করে নিজেকে খোদার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। আর সমালোচনাকারীকে বন্ধুরূপে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে। পরনিন্দা, সমালোচনা, পরচর্চা, শত্রুতা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাই হলো الموت الاسود (আল-মাউতুল আছওয়াদ)।

মহান আল্লাহ বলেন- يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, আর কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তিনি দান করেন এবং আল্লাহ বিস্তৃতিময়, সর্বজ্ঞ" (আল-কুরআন, ৫:৫৪)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন-. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا "যে তওবা করে ও সৎ কাজ করে তবে সে আল্লাহর দিকে তেমনিভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে, যেমনভাবে করা উচিত ছিলো" (আল-কুরআন, ২৫:৭১)।

মাইজভাণ্ডারী দর্শনের দৃষ্টিতে الموت الاسود (আল-মাউতুল আছওয়াদ) অর্থাৎ কালো মৃত্যুতে মানুষের কলব জাগ্রত হয়ে পুনরায় নতুন জীবন লাভ করে এবং নিষ্কলুষ হয়ে তরিকতে উন্নতি লাভ করতে থাকে।

রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেছেন, "যে বান্দা তার কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, যা শুধু মহান আল্লাহই জানেন, সে বান্দা আল্লাহর দরবারে মার্জনা ভিক্ষার পূর্বে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দেন" (আল- মুসতাদরাক)।

(গ) الموت الاحمر (আল-মাউতুল আহ্মর)

অর্থাৎ লাল মৃত্যু। এটা লোভ লালসা ও কামভাব থেকে বিরত থাকলে অর্জিত হয়। ফলে মানুষ বেলায়ত প্রাপ্ত হয়। মাইজভাণ্ডারী দর্শন অনুযায়ী এ লাল মৃত্যুর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর বহু দলিল রয়েছে।

(ঘ) الموت الاخضر (আল-মাউতুল আখ্‌জার)

অর্থাৎ সবুজ মৃত্যু। এটা নির্বিলাস জীবন যাপনে অর্জিত হয়। এই সবুজ মৃত্যুর পক্ষেও মাইজভাণ্ডারী দর্শন অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর বহু প্রমাণাদি রয়েছে।

*** প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় (গ) ও (ঘ)-এর আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।**

উপর্যুক্ত চার প্রকারের মৃত্যুর পর মানুষ নিজেকে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। ফলে একজন বিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে। মাইজভাণ্ডারী তরিকার এ 'উছুলে ছাবয়া' একজন মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং ইসলামি শরিয়ত অনুধাবন ও বাস্তবায়নেও ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। আমিন।

সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
সাবেক ডীন, কলা অনুষদ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় পানি সম্পদ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা এবং গুরুত্ব

ড. মোঃ আতিকুর রহমান

মানুষের প্রতিদিনের চাহিদা পূরণের জন্য নানা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এমন একটি সম্পদ হচ্ছে পানি। পানি শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৬৩ বার উচ্চরিত হয়েছে এবং হাদিস শরিফেও অসংখ্যবার এসেছে। এই পানি যেমন আমাদের নানা কাজে লাগছে, তেমনিভাবে সেটা আমাদের পরিবেশকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। পানির স্বল্পতা এবং দূষণ আমাদের প্রতিবেশ-পরিবেশের উপর এমনভাবে প্রভাব ফেলেছে যে বর্তমানে মানব সভ্যতাই হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের অনেক জায়গা এখন খরার সম্মুখীন; ফলে পানির অভাব গাছপালা এবং প্রাণি জীবনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। গাছগাছালি মারা যাচ্ছে এবং প্রাণিরাও খাবার, বাসস্থান, উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে হয় ভিন্ন জায়গায় সরে যাচ্ছে, না হয় পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া চাহিদা বৃদ্ধির জন্য অনেক জায়গাতেই অতিরিক্ত পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। একদিকে অতিরিক্ত উত্তোলন, অন্যদিকে খরার কারণে রিজার্ভের স্বল্পতার জন্য ভূগর্ভের পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। পানির অভাবে এসব জায়গার গাছপালা এবং প্রাণি পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এর জৈবিক গঠনের পরিবর্তন এবং কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

উপরন্তু, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ ও শিল্পের প্রসারে পানি তথা পরিবেশ দূষণও বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। অধিক সংখ্যক মানুষের ব্যবহারে অধিক পরিমাণে দূষিত পানি তৈরি হচ্ছে। অধিক মানুষের চাহিদার জন্য শিল্পের উৎপাদন বাড়ছে। এসব শিল্পদ্রব্য তৈরিতে প্রয়োজন হচ্ছে অধিক পরিমাণে পানি, যা ফেলা হচ্ছে দূষিত পানি হিসেবে। ঘনবসতিপূর্ণ নগরে যখন বাসাবাড়ি এবং শিল্পে ব্যবহৃত দূষিত পানি ফেলা হচ্ছে, সেটা তখন ঘটাচ্ছে পরিবেশ দূষণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৪ সালের একটা প্রতিবেদন মতে, পানি দূষণের জন্য গরীব দেশগুলোতে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখের অধিক মানুষ মারা যায়। এই অবস্থা আরো বেশি ভয়াবহ হবে যদি জলবায়ুজনিত পরিবর্তন আমাদের আঘাত করে। আমরা যদি পানি তথা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি, তাহলে একদিন মানবসভ্যতার অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে পানি সম্পদ রক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। খোঁজা হচ্ছে নানা প্রকৌশল সমাধান। কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে শুধুমাত্র মানুষের প্রকৌশল জ্ঞান প্রয়োগ করে সাফল্যের হার কম, খরচ

অনেক বেশি এবং অনেক সময়ই পরিবেশের জন্য তৈরি করছে অতিরিক্ত বিপর্যয়ের ঝুঁকি। অস্ট্রেলিয়ায় একটা গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কিছু বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা পানির দূষণ কমানো এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। পানির পুনঃব্যবহার, ব্রাশ করা বা শেভ করার সময় ট্যাপ বন্ধ রাখা, বিভিন্ন পানিসাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি কিছু ব্যক্তি-নির্ভর আচারের উদাহরণ। এসব ব্যক্তি-আচার নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সহজেই পানির সুষ্ঠু ব্যবহার করে এর সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, যেটা মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

সহজ পন্থায় ব্যক্তি আচার নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ এবং একই সাথে পানি তথা পরিবেশ সংরক্ষণের একটি উপায় হচ্ছে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির অনুসরণ। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বিশ্বমানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষে প্রজ্ঞাময় উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে এমন কি আমরা পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারেও উছুলে ছাবয়া'র প্রয়োগ দেখতে পাই, যার মাধ্যমে কুরআন নির্দেশিত পথে চলা সহজ হয়ে যায়। উছুলে ছাবয়া'র অন্যতম একটি শিক্ষা হচ্ছে মিতব্যয়িতা (ফানা আনিল হা'ওয়া)। আল্লাহ তায়ালার পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ি হতে এবং এর সংরক্ষণের গুরুত্বকে ইঙ্গিত করে সূরা আল-মুমিনুন এ বলেছেন, "আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি পরিমাণমতো এবং ভূপৃষ্ঠে সংরক্ষণ করেছি এবং আমি এটাকে সহজেই তুলে নিতে সক্ষম" (আল-মুমিনুন ঃ ১৮)। মূলত আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীকে অপছন্দ করেন। আরেকটা আয়াতে তিনি বলেন, "হে আদম সন্তান। তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না, আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না" (আল-আরাফ ঃ ৭)। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সুখ-শান্তির জন্য অনাবিল এবং সুন্দর পরিবেশ-প্রতিবেশ রহমত হিসেবে তৈরি করেছেন। এই সুন্দর অনাবিল সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি এরশাদ করেন, "তিনিই দয়ার সুখবর হিসেবে বাতাস প্রেরণ করেছেন এবং আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন সুমিষ্ট পানি" (আল-ফোরকান ঃ ৪৮)। উক্ত আয়াত থেকে আমরা বিশুদ্ধ পানির গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা লাভ করি। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদেরকে বলুন, তারা কি ভেবে দেখেছে, তাদের যে সুমিষ্ট পানি দেয়া হয়েছে, সেটা যদি ভূগর্ভে হারিয়ে যায়, তাহলে কে তাদের স্বচ্ছ বহমান পানি সরবরাহ করবে?" (আল-মুলক ঃ ৩০)। উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, দূষণমুক্ত পরিবেশ আল্লাহ তায়ালার একটা বড় নেয়ামত এবং তা সংরক্ষণের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ পালনের একটা সহজ মাধ্যম হচ্ছে উছুলে ছাবয়া'র অনুসরণ। উক্ত অনুসরণে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মাধ্যমে এভাবেই আমাদের তাকওয়া অর্জিত হবে।

আমাদের প্রিয় রাসুলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পানি ব্যবহারে অনেক মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি অযু এবং গোসলের জন্য সীমিত পরিমাণ পানি ব্যবহার করতেন। আমাদের অন্তরে ধারণা যে অযুর মতো ধর্মীয় কাজে আমরা যত খুশি পানি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা। একটা হাদিসে উনি বলেছেন, "পানির অপচয় করো না, এমনকি যদি তোমরা প্রবাহমান নদীর পাড়েও থাক" (ইবনে মাজাহ ঃ ৪২৫)। উক্ত হাদিস শরিফটির মাধ্যমে আমরা মিতব্যয়িতার শিক্ষা পাই যেটা উছুলে ছাবয়া'র মূল কথা। আরেকটি হাদিসে এসেছে যে, তিনটি জিনিসে সকল মুসলিমের সাধারণ অংশ রয়েছে, যেমন সবুজ মাঠ, পানি এবং আগুন (মুসনাদ, ভলিয়ুম ২, বই ২২)। উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে আমাদের পানি বেশি থাকলেই সেটা বেশি বেশি খরচ করে ফেলা শরিয়ত সম্মত নয়, বরং সেটাকে খুব হিসাবের সাথে ব্যবহার করতে হবে যেন সমগ্র মানব তথা জীবকূল তার সুফল পায়।

পানি সংরক্ষণ করার জন্য ইসলামে নির্দেশ রয়েছে, যা সুস্থ পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোনো নালা বা নদীর উজানে অবস্থিত কোনো খামার হলেই সব পানি ব্যবহার করে ফেলতে পারবে না, কিছু পানি ভাটির জন্য ছেড়ে দিতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। পরিবেশ রক্ষার্থে ব্যবহারযোগ্য পানি অপ্রতুল হলে পানি ব্যবহার না করার নির্দেশ রয়েছে। এসবই নির্দেশ দেয়া হয়েছে পানি তথা পরিবেশ তথা মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। আমরা যদি উছুলে ছাবয়া'র নির্দেশ মতো জীবন যাপন করি, তাহলে দেখতে পাই যে এটি আসলে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রিয় রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথেরই অনুসরণ। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ আমরা সহজেই অনুসরণ করতে পারি, যদি আমরা উছুলে ছাবয়াকে আকড়ে ধরি, আর সবার পালন করার জন্য এটা একটা সহজ এবং ঝামেলামুক্ত পথ।

প্রফেসর
সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

ফানা আনিল হা'ওয়া এর তাৎপর্য

ড. মুহাম্মদ ফরিদুদ্দিন ফারুক

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে কালোত্তীর্ণ। এর সামগ্রিক সৌন্দর্য নানাভাবে নানারূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমত এর রূপ বিকশিত হবার সর্বোত্তম ক্ষেত্র আম্বিয়া কেরামের জীবন-দর্শন। কারণ তাঁদের জীবন শুধুমাত্র অহিনির্ভর। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র আউলিয়া কেরামের জীবন প্রবাহ ও সামগ্রিক প্রয়াস। কারণ তাঁদের জীবনও নবিগণের পূর্ণ অনুশীলন, তাঁর সাহাবা, তাবেঈ এবং তাবে- তাবেঈনগণের অনুকরণে পরিচালিত। আবার তাঁদের প্রতিটি বাক্যে কুরআন-সুন্নাহর অবিকল নিঃসরণ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রতিধ্বনিত হয়। অনুরূপ একটি বিষয় বাংলাদেশের সুফিবাদের জনক অলিকুল শিরোমনি হযরত গাউছুল আজম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া-সপ্ত উছুল তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি। কোনো অলৌকিক কারণে তিনি এ নামকরণ করেন তার রহস্য আমাদের জানার বাইরে। তবে আমাদের বোধের নিরিখে যদি এর ব্যাখ্যা করতে চাই, তবে ইসলামে সপ্ত মূলনীতির বহু বিষয়ের সাথে এর সুগভীর মিল পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঈমানের সাত স্তম্ভ, সপ্ত আকাশ এবং সাত নিয়মের পাঠ রীতিতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি।

এ উছুলে ছাবয়া যে, তাঁর চরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জ্বলন্ত প্রমাণ তাতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। আবার এ সপ্ত উছুলের প্রতিটি প্রকার মনে হয় মানুষকে মহামানুষে রূপান্তরের অলৌকিক কর্ম পদ্ধতি। এ উছুলে ছাবয়া হলো যথাক্রমে ফানা আনিল খাল্ক, ফানা আনিল হা'ওয়া, ফানা আনিল এরাদা, মউতে আবয়্যাজ, মউতে আছওয়াদ, মউতে আহ্‌মর ও মউতে আখজার।

উক্ত সাত উছুলের অন্যতম হলো ফানা আনিল হা'ওয়া তথা প্রবৃত্তির আনুগত্যমুক্ত হওয়া। অর্থাৎ যা না হলে জীবন চলে, সে সব কাজ-কর্ম মুক্ত হয়ে জীবন পরিচালনা করা, যা সামগ্রিকভাবে জীবনকে কালিমামুক্ত করে। এ বিষয়টি ঈমানের রক্ষাকবচ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, তার চূড়ান্ত ঠিকানা হলো জান্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى .

"যে তার প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয় করেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেছে জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।" (আন্-নাযি'আত-৪০-৪১) প্রবৃত্তির অনুসরণ নিঃসন্দেহে এতো মারাত্মক ক্ষতিকর যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের আনুগত্য থেকে নিবৃত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকারীকে আল্লাহ তা'য়ালা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে অভিধা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا .

"আপনি তার কথা মানবেন না যে, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি ও যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কার্যকলাপ বাড়াবাড়ি।" (আল্-কাহ্ফ-২৮)। প্রবৃত্তির অনুরণকারীগণ সন্দেহাতীতভাবে পথভ্রান্ত। আল্লাহ্র বাণী–

وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ .

"অবশ্যই অনেকে জ্ঞান ছাড়া প্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।" (আল্-আন'আম-১১৯)। আর প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি পথভ্রান্ত। মহান আল্লাহ্র বাণী-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ .

"আর আল্লাহ্র পথ নির্দেশনা ছাড়া যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।" (আল্-কাসাস-৫০)।

মুমিনের অন্যতম বর্জনীয় বিষয় হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং যে-কোনো প্রয়োজনহীন কথাবার্তা, কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকা। হাদিসে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ইরশাদ হচ্ছে-

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ .

"ব্যক্তির সুন্দরতম ইসলাম হলো অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় বর্জন করা।" (তিরমিযি, ইব্ন মাজাহ)।

এ বিষয়টিই তরিকতের প্রাণপুরুষ হযরত গাউছুল আজম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর সপ্ত উছুলের অন্যতম ফানা আনিল হা'ওয়া। যা মানুষের আত্মশুদ্ধির অন্যতম পথ-পন্থা।

অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

‘মউতে আছওয়াদ’ বা কালো মৃত্যুর তাৎপর্য ও স্বরূপ নিরূপন

ড. মুহাম্মদ নুর হোসাইন

মানবদেহের সুস্থতা নির্ভর করে তার আত্মার সুস্থতার ওপর। যার আত্মা সুস্থ, তার দেহও সুস্থ। তাই দেহের সুস্থতার চেয়ে আত্মার সুস্থতার গুরুত্ব বেশি। এটি পবিত্র কুরআন-হাদিসের কথা। চিকিৎসা বিজ্ঞানও তাই বলে। পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে, “মানবদেহে এমন একটি অংশ আছে, যা পরিশুদ্ধ হলে তার পুরো দেহ পরিশুদ্ধ হয়, আর তা অপরিশুদ্ধ হলে পুরা দেহ অপরিশুদ্ধ হয়।” আত্মার পরিশুদ্ধির নাম আত্মশুদ্ধি। এটাকে ইসলামি পরিভাষায় তাযকিয়ায়ে নফস বলা হয়। আত্মশুদ্ধির জন্য মনীষীগণ বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়েছেন। প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ আউলিয়া হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) দিয়েছেন উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি, যা বিখ্যাত সুফি হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর রচিত বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূলত রিপুকে দমন করার জন্যই উল্লিখিত সপ্তকর্ম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এখানে সপ্তকর্ম পদ্ধতিকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. ফানা (বিনাশ, ধ্বংস, বিমুখ) দুই. মউত (মৃত্যু, নিষ্ক্রিয়তা)। ফানাকে তিনি তিন ভাগে আর মউতকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। চার প্রকার মউতের দ্বিতীয় প্রকার হলো ‘মউতে আছওয়াদ’ বা কালো মৃত্যু। এখানে মৃত্যু মানে দমন ও নিষ্ক্রিয়তা। অর্থাৎ রিপুকে নিষ্ক্রিয় করার কর্ম পদ্ধতি; যে রিপুর তাড়নায় মানুষ অপরাধ করে, উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে বাধাগ্রস্ত হয়, সেই রিপুকে জয় করে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে, এক কথায় বান্দা তার সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার পরম সাধনার প্রতি এগিয়ে যাওয়ার একটি কর্মসূচি হলো মউতে আছওয়াদ। কোনো সালিক বা তরিকতজগতে বিচরণকারী তাঁর অভীষ্ট লক্ষের পানে এগোতে চাইলে তাঁকে শত্রুতা, সমালোচনা, নিন্দা ইত্যাদির মোকাবেলা করতে হয়। এগুলো যেদিক থেকে আসুক না কেন, সালিক সেটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখবেন। নিজের মধ্যে সেই দোষ আছে কিনা- তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখবেন। যদি সেই দোষ পাওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে তা শুধরিয়ে নেবেন। আর যদি পাওয়া না যায়, তাহলে আল্লাহ তা’য়ালার শুকরিয়া আদায় করবেন। সমালোচক বা নিন্দুককে শত্রু না ভেবে তাকে বন্ধু মনে করবেন। তিনি মনে করবেন যে, সে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছে অথবা সতর্ক করেছে। এতে সালিকের আত্মা প্রশান্তি লাভ করে, শক্তিশালী হয় এবং এগিয়ে যেতে সাহস পায়। এভাবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সালিক হয়ে যান বিশ্ববন্ধু বা বিশ্বঅলি। মূলত তরিকত জগতের অন্যতম বড় চরিত্র হলো ধৈর্য। ধৈর্যের পরীক্ষা হয় কষ্ট দিয়ে। কষ্ট শারীরিক হোক বা মানসিক। অপরদিকে সমালোচনা বা নিন্দাতে মানুষ আঘাত পায় আত্মিক, যা শারীরিকের চেয়ে কষ্টদায়ক। নবি, রাসুলগণ (আলাইহিস্ সালাম) সর্বসমালোচনা আর নিন্দাকে উপেক্ষা

করে নিজেদের মনজিলে মাকছুদে পৌঁছেছেন। তাঁদের পরিপূর্ণ অনুসারী হিসেবে অলিগণকে সেইভাবে এগুতে হয়। পার্থিব কোনো প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদকে পাওয়ার পথে সর্বকষ্ট, সমালোচনা এবং নিন্দাকে সাদরে গ্রহণ করে তেমনি সালিকও মউতে আছওয়াদের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করে বিশ্ববন্ধু বা বিশ্বঅলির মকাম অর্জন করেন।

সহযোগী অধ্যাপক
আরবি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শরিয়ত ও তরিকতের আলোকে উছুলে ছাবয়া

ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

ভূমিকা: যুগে যুগে আল্লাহ তা'য়ালা নিজকে পরিচিত করার জন্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। তবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবি হওয়ায় তাঁর পরে আর কোনো নবি রাসুল আসার সুযোগ নেই। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে ওলামা কেরাম এ দায়িত্ব পালন করবেন। যুগের চাহিদা অনুধাবন করে তাঁরা আমার দায়িত্ব পালন করবেন। মানুষকে আমার শরিয়ত ও তরিকতের শিক্ষা দিবেন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীও যুগের সংস্কারক হিসেবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছার যে সাবলীল পন্থা মানব সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন তাই উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি হিসেবে খ্যাত। নিম্নে শরিয়ত ও তরিকতের আলোকে এর গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হলো।

বুখারি ও মুসলিম শরীফের মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস 'হাদিসে জিব্রাইল' পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব যে, ধর্ম কী? একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইনি জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) তিনি তোমাদেরকে ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। ধর্মকে হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) তিন স্তরে ভাগ করেছেন। এক. ইসলাম দুই. ঈমান ও তিন. ইহসান। ইসলাম কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে- এটি আমলের নাম। যথা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়া, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমযানে রোযা রাখা, সামর্থ্য থাকলে হজ করা। আর ঈমান কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে-এটি বিশ্বাসের নাম। যথা আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল, পরকাল এবং তকদির বিশ্বাস করা। যাকে পরিভাষায় আকিদাও বলা হয়। ইহসান কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, এটি আমল ও আকিদার উপরের একটি স্তরের নাম। এটি হলো বান্দা ও আল্লাহ্র মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক। যে সম্পর্কে বান্দা ও আল্লাহ্র মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। এ স্তরে বান্দা নিজেকে মহান আল্লাহ্র কাছে এভাবে উপস্থাপন করেন, যেন বান্দা তার প্রেমাস্পদ আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন। পরিভাষায় এটি তাছাউফ, বেলায়ত অভিধায় অভিহিত। উক্ত হাদিস জিব্রাইলের ইহসান অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

অর্থ- হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমাকে ইহসান কী বলেন। তিনি উত্তরে বললেন, এটি হলো, 'তুমি এভাবে ইবাদত করবে, যেন তুনি প্রেমাস্পদ আল্লাহকে দেখছো। যদি দেখতে না পাও তবে এ বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।' উল্লেখ্য, এ অনুবাদটি لم تكن-ক্রিয়াকে ফেল নাকেছ

ধরে করা হয়েছে। যদি لم تكن কে ফেল তাম ধরা হয় তখন উদ্ধৃত হাদিসের অনুবাদ হবে- ইহসান হলো, 'তুমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত এভাবে করবে, যেন তুমি প্রেমাস্পদ আল্লাহকে দেখছো। হ্যাঁ, যদি ফানা হয়ে যাও অর্থাৎ, তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাও; তবে তুমি প্রেমাস্পদ প্রভুকে অবশ্যই দেখবে এবং তিনিও তোমাকে দেখবেন।' এ স্তরটি হলো- কামিল পুরুষদের। তারাই নিজেদেরকে বিলীন বা ফানা করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বাকা অর্জন করেছেন।

আমরা যদি শরিয়াতের বিধি বিধান বিশ্লেষণ করি তবে বুঝতে পারবো যে, শরিয়াতের বিধি বিধানের পাঁচটি উদ্দেশ্য রয়েছে, যাকে পরিভাষায় মাকাসেদে শরিয়াত বলা হয়। পবিত্র কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারকগণ এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ . (سورة الأنعام)

'আপনি বলুন! তোমরা এসো, আমি বলছি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের ওপর কী হারাম করেছেন- তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না; মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না; আমি তোমাদেরকে রিযিক দিই এবং তাদেরকেও। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। কোনো প্রাণ হনন করো না, যা আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করেছেন। তবে ন্যায় বিচারের স্বার্থে। এটিই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছেন। যাতে তোমরা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করো। তোমরা ইয়াতিমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যেতে পারো তারা বালেগ হওয়া পর্যন্ত। পরিমাপে পরিপূর্ণভাবে ও ন্যায় সঙ্গতভাবে দাও। আমি কারো ওপর সাধ্যাতীত কোনো কষ্ট দিই না। আর যখন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলো তখন ইনসাফ করো যদিও নিকটাত্মীয় হয়। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। এটিই মহান আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াসিয়াত যদি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' [সূরা আনআম -১৫১-১৫২]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা শরিয়তের পাঁচটি মাকসাদ বর্ণনা করেছেন। ইসলামি পণ্ডিতগণও শরিয়তের সকল বিধি বিধান পর্যালোচনা করে শরিয়তের পাঁচ মাকাসেদ বর্ণনা করেছেন। মাকসাদগুলো হলো নিম্নরূপ-

১. হিফযুদ দ্বীন বা ধর্ম সংরক্ষণ ২. হিফযুন নফস বা প্রাণ সংরক্ষণ ৩. হিফযুল আকল বা বিবেক সংরক্ষণ ৪. হিফযুন নসল বা বংশ সংরক্ষণ ৫. হিফযুল মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ ।

কোনো সমাজে, কারো উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় সংরক্ষিত হলে সে সমাজ কতই না সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হবে তা, বলার অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবীতে যুগে যুগে যতই আইন কানুন হয়েছে সবই মানুষের এ পাঁচটি মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য হয়েছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আজ মানুষ যা চিন্তা করছে, চৌদ্দশত বছর আগে ইসলামি শরিয়তে মানুষের এ পাঁচটি অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় হলো আমরা অধিকাংশই এ পথের অভিযাত্রী নই।

আমরা যদি মাইজভাণ্ডারী তরিকার উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি পর্যালোচনা করি, তবে আমরা দেখতে পাবো যে, মাইজভাণ্ডারী তরিকায় যে চার প্রকারের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে; তা কেউ সঠিকভাবে আমল করলে শরিয়তের মাকাসেদ বা উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, উপরিউক্ত পাঁচটি উদ্দেশ্য সংরক্ষণ পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষিত হবে। মাইজভাণ্ডারী তরিকার চার প্রকারের মৃত্যু নিম্নরূপ-

এক. মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু এটি সংযমের মাধ্যমে অর্জিত হয়। দুই. মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু, এটি শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দুকের নিন্দায় সংযমী হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তিন. মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু, এটি কাম লালসা পরিহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়। চার. মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু এটি নির্বিলাস জীবন যাপনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

উল্লেখ্য, কেউ নিজের জীবনে এ চারটি মৃত্যু বা গুণ অর্জন করতে পারলে সে বেলায়তের মাকামে উন্নীত হবে। যা উপরে বর্ণিত শরিয়তের পাঁচ মাকাসেদ অর্জনেও সহায়ক। কেননা, যার এ চারটি গুণ অর্জিত হবে তার ধর্ম যেমন সংরক্ষিত হবে, নাফ্সও সংরক্ষিত হবে, বিবেকও সংরক্ষিত হবে, বংশও সংরক্ষিত হবে এবং সম্পদও সংরক্ষিত হবে। আমরা জানি শরিয়তের মাকাসেদ পরিপালনের মাধ্যমেই বেলায়তের মাকাম অর্জিত হয়। পরিভাষায় তাদেরকে ওয়ালি-আল্লাহ বলা হয়। এ বিষয়ে ইসলামি পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤) (سورة يونس)

'সাবধান! নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র অলি তাদের (নিজেদের) কোনো ভয় নেই; আর (অনুসারীদের নিয়েও) তাদের কোনো শঙ্কা নেই। এরা প্রকৃত ঈমানদার এবং পরিপূর্ণ মুত্তাকি। তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালে সুসংবাদ। আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই শ্রেষ্ঠ সফলতা। [সূরা ইউনুস-৬২-৬৪] অর্থাৎ, বেলায়ত অর্জনকে আল্লাহ তা'য়ালা শ্রেষ্ঠ সফলতা বলেছেন।

এবার তরিকত কী তা বুঝার চেষ্টা করি। তরিকত হলো শরিয়তের উর্ধ্বে বা পরবর্তী একটি মহৎ রাস্তা। যাতে বান্দা কেবল সৎকর্ম করে ক্ষান্ত হন না। বান্দা এ রাস্তায় মহান

আল্লাহ তা'য়ালার প্রেমে বিভোর হয়ে নিজেকেও ভুলে যান। যাকে পরিভাষায় ফানা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এঁর ইশ্কের কথা প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম)কে সৃষ্টি করে জান্নাতে তাঁকে তাঁর স্ত্রী হা'ওয়া (আলাইহাস্ সালাম) সহ অবাধে বিচরণ করার অনুমতি দেন। তবে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করেন। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) (سورة البقرة)

'আমি বললাম, হে আদম তুমি এবং তোমার সহধর্মিণী জান্নাতে বসবাস করো। তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এখান থেকে খেতে থাকো। তবে এ গাছের নিকটেও যেয়ো না। যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী না হও। [সূরা বাকারাহ-৩৫]

হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম)কে সৃষ্টি করার পর তাঁর ওপর আরোপিত প্রথম বিধান ছিলো- নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল না খাওয়া। যাকে পরিভাষায় শরিয়ত বলা হয়। কেননা, মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আরোপিত বিধি-বিধানই শরিয়ত।

উল্লেখ্য, হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) জান্নাতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে বসবাসের এক পর্যায়ে তাঁর অন্তরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ইশক (কঠিন ভালোবাসা) অনুভব করতে থাকেন। এ ইশ্কই পরিভাষায় তরিকত নামে অভিহিত। যাকে পরিভাষায় তাসাউফও বলা হয়। হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম)-এঁর অন্তরে যখন শয়তান মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি তাঁর ইশ্ক দেখল তখন শয়তান তাঁকে এ রাস্তা থেকে বিচ্যুত করার জন্য কৌশল অবলম্বন করলো। শয়তান আদম (আলাইহিস্ সালাম)কে তাঁর প্রেমাস্পদের শপথ দিয়ে বললো, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এ বৃক্ষের ফল খেতে কেন নিষেধ করেছেন জানো! তোমারা এ বৃক্ষের ফল খেলে তাঁর প্রেমে চিরদিন থাকতে পারবে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١) (سورة الأعراف)

'শয়তান বললো, তোমাদের প্রভু এ বৃক্ষের ফল না খাওয়ার নির্দেশ দেয়ার কারণ কী জানো! এটি খেলে তোমরা ফেরেশতা (এর ন্যায় তাঁর সান্নিধ্যে) থাকবে অথবা তোমরা সর্বদা তাঁর (আরও ঘনিষ্ট) সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাবে। (তার কথা বিশ্বাস করার জন্য) আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ খেয়ে শয়তান বললো, আমি তোমাদের জন্য উপদেশ দাতা। [সূরা আরাফ-২০-২১]

প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের নাম শোনেন তখন তা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করেন।

হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) ও শয়তানের মুখে প্রেমাস্পদের নাম শোনার পর তার কথা বিশ্বাস করে ঐ নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল খান। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়ে বলেন, আমার আদম (আলাইহিস্ সালাম) আমার সান্নিধ্যে থাকার জন্য গভীর আগ্রহে ছিলো অর্থাৎ, আদম (আলাইহিস্ সালাম) আমার প্রেমে বিভোর হয়ে শরিয়তের কথা ভুলে গেলো। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥) (سورة: طـه)

'আমি আদম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি তিনি (প্রতিশ্রুত এ শরিয়তের কথা) ভুলে যান। কিন্তু আমি তাঁর কাছে (শরিয়ত অমান্য করার বা নির্দিষ্ট ফল খাওয়ার সংকল্প দেখিনি।) অর্থাৎ, তিনি অতিশয় ইশ্কে শরিয়তের কথা ভুলে যান। [সূরা তাহা-১১৫]

এটিই ছিলো প্রথম মানবের ইশ্কের রাস্তায় পথ চলা। এর ক্লাইমেক্স হলো, ফানা আনিল এরাদা। কেউ যদি বলে, শরিয়ত অমান্য করার কারণে হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে আল্লাহ তা'য়ালা শাস্তি দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এতে ইশ্কের কী বাকি রইল। জবাবে আশিকরা বলেন, এটি শাস্তি ছিলো না। এটি ছিলো বিরহ। আশিকই জানেন ইশ্কে বিরহের মূল্য কী। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে শাস্তি দিয়ে থাকলে নবুয়্যত কেন দিলেন। নবুয়্যতের ন্যায় উচ্চ মাকাম পাওয়া, জান্নাতে থাকার চেয়ে শ্রেয়। তাই সুফিগণ বলেন, এটি শাস্তি ছিলো না, ছিলো বিরহ। জাহেরি মৌলভী এটি কি করে বুঝবে?

আমরা পূর্বেও বলেছি, ইশ্কের চরম স্তর হলো ফানা আনিল এরাদা। অর্থাৎ, নিজের সকল ইচ্ছা পরিহার করে প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করা। এ স্তরে পৌঁছার জন্য মাইজভাণ্ডারী তরিকায় চার প্রকারের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। চার প্রকারের মৃত্যুর মাধ্যমে অর্জন করা যায় পরম প্রেম বা ইশ্ক। মওলানা রুমি এ প্রসঙ্গে বলেন,

جسم خاك از عشق بر افلاك شد ‹› كوه در رقص آمد و چالاك شد

'মাটির শরীর ইশ্কের কারণে আরশে আরোহণ করে, আর এ ইশ্কের কারণে তুর পর্বত প্রেমে নেচে উঠছিল এবং তুর পর্বতও চতুর চালাক হয়েছিল।'

عشق جان طور آمد عاشقا ‹› طور مست وخر موسى صاعقا

'হে আশেকগণ! তুর পর্বতেও ইশ্কের কারণে স্পন্দন এসেছিলো (এটি ছিলো ইশ্কের নাচ) আর এ ইশ্কের কারণেই হযরত মুসা (আলাইহিস্ সালাম) বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভালোবাসা এত গভীর ছিলো যে, তিনি নিজেকেও ভুলে গিয়েছিলেন।'

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় এটিকে ফানা আনিল এরাদা'র স্তর বলা হয়েছে। মওলানা রুমি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন-

ملت عشق از همه دینها جداست ‹› عاشقان را ملت و مذهب خداست

'ইশ্‌কের রাস্তা সকল ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। আশিকদের মিল্লাত ও মাযহাব, সবই খোদা আর খোদা।' এ স্তরে মানুষ নিজেকে ভুলে গিয়ে আল্লাহময় হয়ে যায়। তখন আশিক কেবল আল্লাহকে চিন্তা করেন। এ স্তরে আরোহণ করে মানসুর হাল্লাজ বলেছেন- আনাল হক। বায়েজিদ বলেছেন- "সুবহানি মা আ'যামু শানি"।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় এ ফানা স্তরে পৌঁছার জন্য চার প্রকারের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। কেউ যদি চার প্রকারের মৃত্যুর পথ অতিক্রম করতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই ফানার মাকামে আরোহণ করে মহান আল্লাহ্‌র কাছে মাকামে বাকা লাভ করবেন।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ফানাকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

ক. ফানা আনিল খাল্ক : সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা। এ স্তরে মানুষ গায়রুল্লাহ থেকে মুক্তি পেয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয়ভাজন বান্দায় পরিণত হন। যাকে আরবি পরিভাষায় বেলায়ত আর বাংলায় বন্ধুত্ব বলা হয়।

খ. ফানা আনিল হা'ওয়া : এটি হলো নিজের মধ্যে যে আমিত্ব রয়েছে, তা বিনাশ করা। কোনো বান্দা যখন নিজের নাফ্‌সের বিরুদ্ধে জেহাদ করে বিজয়ী হন এবং রূহানি শক্তি অর্জন করেন, তখন বেলায়তে এক উঁচু মাকাম লাভ করেন।

গ. ফানা আনিল এরাদা : এটি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাশক্তির কাছে সোপর্দ করা।

উপসংহার : মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে থেকেই কীভাবে সহজে উন্নততর চরম স্তরে পৌঁছানো যায়, তা উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে সহজে অনুমেয় হয়। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী এ পথকে খুবই সহজে মানব সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতিতে শরিয়ত ও তরিকতকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করা হয়েছে। এটিই মাইজভাণ্ডারী তরিকার সৌন্দর্য।

সহযোগী অধ্যাপক
আরবি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

যাপিত জীবনে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা

ড. মোহাম্মদ শেখ সাদী

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। চিন্তা-চেতনায়, বুদ্ধিতে-যুক্তিতে অন্যান্য সৃষ্টিকূল হতে নিঃসন্দেহে মানুষ উন্নত। তবে এই উন্নত কিংবা শ্রেষ্ঠতর হবার জন্য মানুষকে নিরন্তর মনুষ্যত্ব বিকাশ-সাধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হয়। তা না হলে জন্মগতভাবে প্রাপ্ত পাশব-বৃত্তি যথার্থ মানবজনম লাভে ব্যক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। সহজাত এসব রিপুর তাড়না মানুষকে সত্যিকারের পথ-পন্থা থেকে বিপথগামী করে। গভীরভাবে ধ্যান করলে আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, মানবজীবনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তা নিছক খামখেয়ালীপূর্ণ কোনো ঘটনা নয়। ইহজাগতিক কিংবা পারমার্থিক জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথে হাঁটতে হয়। আত্মোন্নয়নের অভিযাত্রায় মানুষকে সত্যান্বেষী হয়ে জীবন-সাধনা করতে হয়। এই জীবন-সাধনা কখনো কখনো ধর্ম-সাধনার সমার্থক তাৎপর্যে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মানবজীবনের অগ্রযাত্রায় যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে বহু মহামানব মানব-মুক্তির দূত হয়ে এসেছেন। সকলেরই লক্ষ ছিল মানুষকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময়তার বার্তা প্রদান এবং চূড়ান্ত মুক্তির পথ-নির্দেশ। প্রাচীন গ্রিসে সক্রেটিস সত্যান্বেষণে সকলকে উজ্জীবিত করেছেন, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরাও মানব কল্যাণে কাজ করে গেছেন। আরব সমাজে বহু মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন সংক্রান্ত মতবাদ দ্বারা আলো ছড়িয়েছেন। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে এবং মহাকালের মানবমুক্তির দূত হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা)। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অনির্বাণ আলোকশিখার নাম 'আল-কুরআন'। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর মুখ-নিঃসৃত বাণীসমূহ (আল-হাদিস) মানুষের জীবন-প্রণালী পরিচালিত করার অমোঘ নির্দেশাবলি। তবুও থেমে থাকেনি মানুষের আত্মোন্নয়নের নব নব কর্মপন্থা, নির্বাচনের কার্যকরী প্রয়াশ। পবিত্র 'কুরআন' ও 'সুন্নাহ'-এর নির্যাস থেকে সাধন-ভজনের নানা-সূত্র সৃজন করেছেন বহু অলি-আউলিয়া, গাউস-কুতুব, সুফি-দরবেশ। নিজস্ব সাধন-প্রণালী নির্মাণের মাধ্যমে প্রত্যেক সাধকই স্ব-স্ব অনুসারীদের জাগোতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে সাধনের উপযোগী স্বভাব-গঠন করতে হয়। মানুষের সহজাত যে অহম্ (নফ্স) (Ego), আত্মার (রূহের) উৎকর্ষের জন্য তাকে ক্রমাগত ছেঁটে ফেলতে হয়। অহমের বা নফ্সকে বিলোপের মাধ্যমে পরমকে দর্শন সম্ভব হয়। অহমের সম্পূর্ণ বিলয়ে মানুষ জগতে নির্মোহ হয়ে ওঠে। ফলে সে লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধহীন এক অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। এই অবস্থায় নির্মোহ ব্যক্তিসত্তা কেবল পরম সত্তায় লীন হতে ব্যাকুল থাকে। ফলে এমন মানুষ পৃথিবীর অন্য সকল মানুষের জন্যই হিতকরী এবং কল্যাণময়। পরম সত্তার ধ্যানে নিমগ্ন সত্তা কখনো মনুষ্য-সমাজে অশান্তি-অনিষ্ট সংঘটনে সোচ্চার হন না। অপরদিকে, পরম করুণাময়ও এমন বিশুদ্ধ মানবাত্মাকে

সাদরে গ্রহণ করেন। ফলে দ্বিবিধ সাফল্য লাভে এরকম সাধন-পন্থার সবিশেষ আবেদন রয়েছে।

সুফি-চর্চার ইতিহাসে অনেক তরিকা রয়েছে। প্রত্যেক তরিকারই রয়েছে নিজস্ব পথ-পন্থা। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভে এসব তরিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে উদ্ভূত মাইজভাণ্ডারী তরিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা যায়, এদেশে সবচেয়ে প্রভাববিস্তারী ও জনপ্রিয় সুফি চর্চার তীর্থভূমি এটি। এই তরিকার প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) আত্মশুদ্ধি লাভের 'উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পন্থা নির্ধারণ করেন। এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক সাধন-পন্থা- যা মহাগ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ।

'ফানায়ে ছালাছা' এবং 'মউতে আরবা'য় বর্ণিত শর্তাবলি মেনে চললে যে কোনো ব্যক্তির পরিপূর্ণ আত্মশুদ্ধি লাভ সম্ভব। ফানায়ে ছালাছা'তে প্রথম ধাপেই 'ফানা আনিল খাল্ক' এর কথা বলা হয়েছে– যেখানে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো কিছু প্রত্যাশা না করার কথা বলা হয়েছে। যাতে মানবমন আত্মশক্তির ওপর আস্থাশীল হয় এবং আত্মপ্রত্যয় জাগে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আত্মপ্রত্যয় খুব জরুরি একটি বিষয়। যা না থাকলে মানুষ কখনো মনোবল নিয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাতে পারে না; বরং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে জীবনে এবং অধ্যাত্মসাধনায় ব্যর্থতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় ধাপে 'ফানা আনিল হা'ওয়া'র কথা বলা হয়েছে। এতে অকারণ বা বাহুল্য আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এটি মেনে চলতে পারলে সমাজ-জীবনে অযাচিত ঝামেলা-কলহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়ানো যায়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এটি অত্যন্ত কার্যকরী সূত্র। এছাড়া 'গীবতের' মতো পাপ থেকেও মুক্ত থাকা যায়। তৃতীয় ধাপে 'ফানা আনিল এরাদা'র কথা বর্ণিত হয়েছে। যেখানে ব্যক্তির নিজ ইচ্ছাকে স্রষ্টার ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করার কথা বলা হয়েছে। গভীরভাবে খেয়াল করলে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যে, এটিই সুফিবাদের প্রকৃত পাঠ বা আত্মনিবেদনের পাঠ। এখানে 'আমিত্ব' (নফ্সের) বা অহমের বিলোপ সাধনের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই দুরূহ কার্যটি সফলভাবে করতে পারলে যেমন স্রষ্টার নৈকট্য লাভ সম্ভব, তেমনি জাগতিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, হানাহানি, লাভ-লোকসানের সংকীর্ণতার বেড়াজাল ডিঙানো সম্ভব হবে। এমন বোধের অধিকারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই সমাজ-রাষ্ট্রে শান্তিময় ও কল্যাণময় ভূমিকা পালন করে।

'মউতে আরবা' বা প্রবৃত্তির চার প্রকার মৃত্যু বা বিনাশের কথা বলা হয়েছে 'সপ্তকর্ম পদ্ধতিতে। এই বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পৃথিবীতে যত মহামানব, মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত, পীর-দরবেশ, অলি-আউলিয়া পরমাত্মার স্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন– তাঁরা সকলেই প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে শুদ্ধ স্বভাব গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন এবং মানুষের সামূহিক রিপুর তাড়নাকে মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রতিবন্ধক বলে বিবেচনা করেছেন। বাস্তবিকই তাই। কারণ, মানুষ যদি সহজাত এসব প্রবৃত্তির বশেই থাকে, তবে পশু আর মানুষে বিশেষ তফাৎ থাকে না। মনুষ্যত্ব তাই অর্জন করতে হয় এবং কষ্টসাধ্য কর্ম দ্বারা তাকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। জন্মগতভাবে মনুষ্যজীবন

পেলেও যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে তাকে কিছু রীতি-পদ্ধতি ও সাধন-পন্থা অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে 'উছুলে ছাবয়া'র চার প্রকার মৃত্যুর তাৎপর্য গ্রহণ খুব জরুরি। প্রথমেই 'সাদা মৃত্যু' বা 'মউতে আবয়্যাজ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপবাস এবং সংযমে এটিকে হাসিল করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান পুঁজিবাদী নয়া বিশ্বব্যবস্থায় ভোগবাদী তথা সর্বগ্রাসী বস্তুবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে 'সাদা মৃত্যু' বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত 'কালো মৃত্যু' বা 'মউতে আছওয়াদ' সম্পর্কে বলা হয়েছে– এটি শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দায় হাসিল হয়। বস্তুত- মানুষ নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে। নিন্দা শুনলে ক্রুদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি নিজের দোষ-ত্রুটি বা দুর্নাম শুনে রাগান্বিত না হয়ে নিজের সীমাবদ্ধতা খুঁজে পায় এবং তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে, তবেই ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক মুক্তি। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি অসীম ধৈর্য ও আন্তরিকতায় এই কালো মৃত্যুর তাৎপর্যকে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করতে পারে– এই সমাজ নিশ্চিতভাবে ইতিবাচকতা খুঁজে পাবে। তৃতীয়ত, 'মউতে আহ্‌মর' বা 'লাল মৃত্যু'র তাৎপর্য সমকালীন স্থূল- ভোগসর্বস্ব বিশ্বে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'লাল মৃত্যু'র ব্যাখ্যায় কামভাব ও কাম লালসা নিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। যেটিকে বহু সাধকগণও অত্যন্ত দুরূহ কর্মরূপে চিহ্নিত করেছেন এবং সাধন-ভজনের তীব্রতর প্রতিবন্ধকরূপে বিবেচনা করেছেন। এটিকে জয় করা গেলে সমকালীন সমাজে সংঘটিত অজস্র অশান্তি, ব্যভিচার, ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনার বিলোপ সাধিত হবে। সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। চতুর্থ ধাপে 'মউতে আখজার' বা 'সবুজ মৃত্যু'র কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় নির্বিলাস অর্থাৎ অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন-যাপনের কথা বলা হয়েছে। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, উল্লিখিত তিন প্রকার মৃত্যুর পর চতুর্থ ধাপে 'সবুজ মৃত্যু'র কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি ধাপের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ একটি আরেকটির পরিপূরক। শুরু থেকে শেষ অবধি এর একটি ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা রয়েছে। একটি অর্জনের মধ্য দিয়ে আরেকটি ধাপে প্রবেশ করতে হয়।

'উছুলে ছাবয়া' বা 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি' শুধু আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক সাফল্য লাভের পথ এবং পাথেয় নয়; বরং তা আমাদের সমকালীন বিশ্বের সামূহিক সংকটে অত্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ তথা মানবমুক্তির অন্যতম নিয়ামক। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিটি ব্যক্তি আলোকিত হতে পারে, গড়ে তুলতে পারে অপার শান্তিময় এক মানবিক বিশ্ব।

সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সামাজিক নিরাপত্তায় ও জাতীয় উন্নয়নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা

মোহাম্মদ ইকবাল সরোয়ার

সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ-সরল পন্থা।

সপ্তকর্ম পদ্ধতির মূল বিষয়সমূহ হলো–

(১) পরনির্ভরশীলতা পরিহার এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

(২) অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার, পরনিন্দা পরিহার।

(৩) মহান আল্লাহ্র ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

(৪) সর্বক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ ও সংযম প্রদর্শন।

(৫) আত্মবিশ্লেষণ করে সংশোধন হওয়া।

(৬) লোভ-হিংসা, কামনা বাসনা পরিহার করে অতিরিক্ত চাহিদা নিয়ন্ত্রণ।

(৭) বিলাসী জীবন পরিহার।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতীয় উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি সর্বত্র ব্যাপক আকারে প্রচলন করা প্রয়োজন। সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ এই দুই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সমাজকর্মের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বস্তুত বেশ কিছু প্রতিকূল অবস্থা হতে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বেকারত্ব, অসুস্থতা, বার্ধক্য, দুর্যোগজনিত ক্ষতি ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক জীবনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নের জন্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যেমন :

(১) সামাজিক বীমা (আর্থিক অবদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ)।

(২) সামাজিক সাহায্য (সরকার কর্তৃক রাজস্ব আয় থেকে বণ্টনকৃত)।

(৩) সমাজ সেবা (বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

সামাজিক নিরাপত্তার সুফল পেতে হলে আমাদের পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিলাসী জীবন পরিহার করে আত্মবিশ্লেষণ ও ধৈর্য ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর এই বিষয়গুলোর কথাই বলা হয়েছে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতিতে।

পবিত্র কুরআনের সূরা-আররা'আদ (আয়াত-১১০)-এ বলা হয়েছে "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে"। সুতরাং এই আয়াত মেনে আমরা যদি আমাদের প্রতিকূল

অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সৎভাবে, বিলাসী জীবন পরিহার করে, ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করি, ইনশাহ্ আল্লাহ আমরা যে কোনো ধরনের প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারব। আর এর মাধ্যমেই নিশ্চিত হবে সামাজিক নিরাপত্তা। বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, কমিউনিটি পুষ্টি কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য প্রতি অর্থবছর জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ (৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সুতরাং সপ্তকর্ম পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন, সরকারের উদ্যোগ এবং মানুষের চেষ্টা অব্যাহত থাকলে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।

একটি দেশ, একটি জাতির উন্নয়নে যে কোনো ব্যক্তির একক ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ একটি জাতি সভ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি একক বা স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে এগিয়ে আসলে তৈরি হয় সমষ্টি। এমন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সমষ্টি তৈরি হলে সেই দেশকে আর কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না। ব্যক্তির প্রচেষ্টা নিজেকে যেমন উন্নতি এনে দিতে পারে, তেমনি দেশের উন্নয়নও ত্বরান্বিত করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য উছুলে ছাবয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ এবং অতিরিক্ত চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ সময়ের দাবি। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নকে অনেকাংশে ব্যাহত করেছে দুর্নীতি। আমাদের অবৈধ ধন-সম্পদ অর্জন পরিহার করলে জাতীয় উন্নয়ন দ্রুত হবে।

রাষ্ট্রীয় বা সরকারী পদ-পদবী ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণই দুর্নীতি; অর্থাৎ, নীতির বাইরে যা তা-ই দুর্নীতি। দুর্নীতি হতে পারে বিভিন্ন আঙ্গিকে যেমন- আর্থিক, বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ অথবা কাজে ফাঁকি দেয়া। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে শুধু দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলে মানুষের ৩০ ভাগ দুঃখ-দুর্দশা লাঘব সম্ভব হবে। পবিত্র হাদিস শরীফে বলা হয়েছে- "সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা ইসলাম দ্বারা হেদায়েত পেয়েছে এবং শুধু প্রয়োজন পরিমাণ মালামাল লাভ করেছে আর তা নিয়ে তুষ্ট থেকেছে" (তিরমিজি শরীফ–শরহে রিয়াজুচ্ছলিহিন)।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে শান্তি নিশ্চিত করণের নিমিত্তে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল আর তোমরা প্রত্যেকেই স্বীয় অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে" (সহীহ বোখারী)।

দুর্নীতি হলো এক ধরনের সামাজিক সমস্যা। এই সামাজিক সমস্যাটি কেবল ব্যক্তি জীবনকেই

দুর্বল করে সামাজিক সংহতি নষ্ট করে না বরং জাতীয় উন্নয়ন তথা নাগরিকের সার্বজনীন মৌলিক অধিকার পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দরিদ্রতা, লোভ ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন।

সুতরাং সর্বত্র সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জাতীয় উন্নয়নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন। স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে হলে, অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ পরিহার করে সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হলে, সর্বক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন পূর্বক শান্তি স্থাপন করতে হলে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বা মাধ্যম। আসুন সবাই যার যার ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে এই পদ্ধতি অনুসরন/প্রচলন শুরু করি। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

সহযোগী অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থায় "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

ড. মোস্তফা কামাল

মানুষ তার পরম সত্তাকে জানার জন্য সর্বদাই আকুল। এ অবিরত জানার আগ্রহ মানুষকে এক নৈর্ব্যক্তিক স্রষ্টার ধারণায় পৌঁছে দেয়। মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজের অন্তরে সেই পরম সত্তাকে খুঁজে বের করে তার সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়তে চেয়েছে। পরম সত্তাকে জানার জন্য এ দীর্ঘ প্রয়াস মুসলিম দর্শনে সুফিবাদ নামে পরিচিত। সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের 'বাতেনী' (গূঢ়) দিকের পরিচায়ক, শরিয়ত যেমন এর সামাজিক বিধি-বিধানের নির্দেশক। মুসলিম জাতির চিন্তাধারার অন্যান্য দিকের মতো সুফিবাদ কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমই ধর্ম, খোদার প্রেম লাভই মানব জীবনের পরম সম্পদ। খোদা নির্মম নন, মানুষকে শাস্তি প্রদান করাই তাঁর কর্ম নয়। এগুলো সবই 'উছুলে ছাবয়া' নামে পরিচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে মানবজীবনে ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে এ মূলনীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম একটি ইতিবাচক বিষয় হলো সবর করা। এটি হলো মানুষের ভেতরগত একটি উত্তম স্বভাব, যার মাধ্যমে সে অসুন্দর ও অনুত্তম থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের এক আত্মিক শক্তি, যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে পারে। হযরত জুনাইদ বোগদাদী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন, হাসি মুখে তিক্ততার ঢোক গেলা-ই হলো ধৈর্য। আর জুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকা, বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবনের করুণ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কষাঘাত সত্ত্বেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করাই হলো ধৈর্য।

ধৈর্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ইসলাম এক অসাধারণ বাণী দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০।)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্য ধারণ করার প্রতিফল সরাসরি উল্লেখ করে বলেন, "নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।" (সূরা যুমার, আয়াত : ১০।)

এ প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত : ৪৩)

'উছুলে ছাবয়া'-এর অপর একটি বিষয় হলো পাপ থেকে বিরত থাকা। ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয় জুড়ে থাকে প্রতিপালকের ভয়, যার মহিমা-মাহাত্ম্য আলোড়িত করে রাখে তার অন্তর জগৎ সারাক্ষণ। প্রতিপালকের অবাধ্য হওয়া কখনোই শুভ মনে হয় না তার

কাছে। পাপ তার কাছে ঘৃণ্য-প্রত্যাখ্যাত বস্তু। ঈমানের পরিধি-পর্যায় অনুযায়ী মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহকে মনে করে বড়, আর পাপকে মনে করে ঘৃণ্য অপরাধ। আল্লাহ ভীতি ও নৈতিক দায়িত্ববোধের কারণেই উল্লিখিত মু'মিনগণ শেষ রাতের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ ক্ষেত্রে সকলের উচিত হলো পাপ করে প্রকাশ না করা, সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, পাপের পর সৎকর্ম করা যাতে সৎকর্ম পাপকে মিটিয়ে দেয়, সৎলোকের সাহচর্য অবলম্বন করা, ধৈর্য ও অন্তরের দৃঢ়তা অবলম্বন করা, পাপের বিপদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং অন্তরের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকা জরুরি।

কারো নিন্দা-গীবত না করা ও নিজের দোষ স্বীকার করা অপরের দোষ অনুসন্ধান না করা 'উছুলে ছাবয়া'-এর অন্যতম বিষয়। গীবত একটি ভয়ঙ্কর ও জঘন্যতম গোনাহের কাজ। কারো অগোচরে তার পোশাক–পরিচ্ছদ, বংশ, চরিত্র, দেহাকৃতি, কর্ম, দ্বীন, চলাফেরা, ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে কোনো দোষ অপরের কাছে প্রকাশ না করা। (ইহয়িয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩য় খ., পৃ. ১৪৩।)

এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, পরচর্চায় তিন ধরনের পাপ হতে পারে। অপরের মধ্যে যে দোষ বিদ্যমান, তা আলোচনা করা গীবত; যে ত্রুটি তার মধ্যে নেই তা আলোচনা করা অপবাদ; আর তার সম্বন্ধে যা কিছু শ্রুতি তা আলোচনা করা মিথ্যা বলার শামিল। (ইহয়িয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩য় খ., পৃ. ১৪৪।)

ইসলামি শরিয়াতে গীবত হারাম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনেক অনুমান বর্জন কর। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা কারো দোষ অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১২।)

'উছুলে ছাবয়া'-এর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লোভ-লালসা ত্যাগ করা। কারো কোনো জিনিস দেখে তা লাভের আশা করা, যা মানুষকে সর্বদাই আল্লাহ বিমুখ করে দেয় এবং দুনিয়ামুখী করে দেয় তাকেই লোভ-লালসা বলে।

লোভ-লালসার একমাত্র কারণ হলো মানুষের বড় হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা করা। এখানে উল্লেখ্য যে, বড় হওয়া বলতে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যে জিনিসের অধিকারী আমি নই বা যা আমার প্রাপ্য নয় তার আশা করাই হলো লোভ-লালসা। এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, বৈধভাবে মানুষ যদি বড় হতে চায় যেমন, কোনো ছাত্র ইচ্ছা করলো, সে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষক হবে এটি তার জন্য হারাম নয়। মূলকথা হলো এমন কোনো লোভ-লালসা করা, যা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করে একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই মহান স্রষ্টার মুখোমুখি হতে হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত যে, মানবজাতির গোটা হায়াতে জিন্দেগীই হলো ইবাদত; তা সে চাকরি করুক বা ব্যবসায় করুক বা অন্য কোনো কাজ করুক না কেনো। মানুষ সামাজিক জীব; এ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে তাকে তাল মিলিয়ে চলতে হয়, অন্যথায় সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিপদের মধ্যে পড়তে পারে বিধায় পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও সহমর্মিতা রক্ষা করে চলা একান্ত আবশ্যক। আর মানুষের জীবনে এ শান্তি রক্ষায় 'উছুলে ছাবয়া'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিত সমাজে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য এ সকল গুণাবলির মধ্যে অর্জিত গুণাবলি মানবচরিত্রে অনুপ্রবেশ ও বর্জিত দোষত্রুটি মানবচরিত্রে যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তার চেষ্টা করা।

সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Reflecting on the Importance and Usefulness of "Usule Sabya" in the Context of Present Socio-Economic Predicament of the World

Mohammed Sarwar Alam

What could be considered as the chief predicament of modern world- both locally and globally? One might argue that there are so many. But, in line with Talal Asad as exposed in his essay "Thinking About Tradition, Religion, and Politics in Egypt Today", I would echo that, in modern times "morally sovereign individuals" and "the politically sovereign states" are "driven by an ever-present desire for increasing profit, consumption, and power, all under the auspices of financial and industrial corporations". In another essay titled "Mohammad Asad: Between Religion and Politics", Talal Asad focuses on the moral vision of his father who used to recite the Sura at-takathur with great feeling. The opening verse is: "You are consumed with unending desire for more even until you die". Accordng to Talal Asad's father the verses of the Sura "condemn the unending consumerism and greed in which humans, especially in our time, are entrapped". Talal Asad argues that "traditional forms of life have sought to control" these unending desires and greed.

I would like to situate the objectives of "Usule Sabya" identifying with the "traditional forms of life" that have been followed and embodied by the adherents of traditions. It is argued that modern worldview advocates earthly human perfection through materialistic demands of economic efficiency and rationality. It overlooks the soul and the transcendent divine reality. On the contrary, in traditional worldviews, the soul which is considered non empirical essence of human beings exists in a condition of "In-Between". Thus, it appears that in modern and traditional worldviews the essence and purpose of life are configured

towards incompatible directions. It is argued that traditional worldviews are inspired and guided by religious visions of life.

Modernity proposes 'change, 'development' and 'progress' culturally and institutionally. But, according to Syed Muhammad Naquib Al-Attas, it fails to propose "certainty (yaqin) of the ultimate Truth and fulfillment of action in conformity with that certainty". He also, critiquing modern proposition of 'change, 'development' and 'progress', Al-Attas asserts, "the world cannot develop as it is already perfect according to its own fitrah, only life in the world can develop". Moreover, one of the major considerations of modernity is that it considers evil mostly external to human beings whereas in Islamic tradition fighting against internal evil (nafs) is considered as jihad-e-akbar.

By ignoring religious/spiritual visions of life, by encouraging people to fulfill mundane desires only and by emphasizing quantitative aspects of life modern condition has invited more disasters in human life than ever before, modern condition is characterized by restlessness, alienation, frustration, ever increasing greed for power and wealth, ever increasing economic disparity, environmental disaster etc. Thus in the context of modern societies, the self-purifying practices of "Usule Sabya" intiated and promoted by Maizbhandari tariqa could bring qualitative peace, happiness and prosperity to a large extent both at individual and collective levels.

Works consulted:

1. "Thinking About Tradition, Religion, and Politics in Egypt Today" by Talal Asad
2. "Muhammad Asad: Between Religion and Politics" by Talal Asad
3. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Worldview of Islam by Syed Muhammad Naquib Al-Attas
4. Literatures on "Usule Sabya"

Education professional and researcher

Sustainable Development Goals: Role of Usule Sabya

Dr. Md. Golam Rabbani

In the name of the Merciful and peace be upon His most beloved Prophet (Pbuh)

Man turns into a spiritual being when enlightened with the spiritual blessings of the Almighty Creator through His most beloved Creation, His Greatest Creation Prophet ((Pbuh), the Best of Creation of uswatunhasana. Love for the Prophet (Pbuh) made his companions greatest of the mankind (Qarni Ummaati Khayrunnas) because of cherishing and getting enlightened with his love which is the prerequisite to the success here and the world hereafter.

'La NabiaBaadye' so till the last day, after our Prophet (Pbuh), no prophets to come but the friends of Allah who (10:62 Laa Khawfun alihim walaahum yahzanun), in fact, are assigned to purify us mentally, intellectually and spiritually leading us to be in possession of the attributes of the Almighty Allah as He desires us to be adorned with His attributes and He has created His Best of Creation with Best Chosen attributes He loves Most!

Sustainable Development Goal is the name of the organizing principle in attaining sustainability in using human potentials and natural resources effectively.

Sustainable development, in fact, leads to obtaining 'sustainability'; henceforth, sustainability refers to being existent constantly. It is viewed that modern economics is facing the conflicts between the two; one is endeavoring to reconcile ambitious economic development and the other is the obligations of preserving natural resources and ecosystems. So the organizational principles of sustainability involve sustainable development meeting the demands of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Nonetheless, SDGs are the target oriented development programs meant to inspire the whole world. It claims the positive impact of development infrastructures to ensure and assure peace and prosperity affecting all visible and invisible, far or near, and there lies the role of human beings with positive mindset which can help the development projects translate into reality!

Visible infrastructures are the visible development work but inside there are the invisible minds functioning inwardly all the time; that's why, when human being is enlightened with inner spiritual power then it seeks to produce conducive inputs helpful both for himself and others.

Human development goals depend on the proper development of human values and ideals of a mindset in which the practice of the seven norms can play effective role in translating the project plans into reality with a successful consequence providing perennial impact upon life and society.

Man is born innocent but untrained although helpless, sinless; in other words, man is born ignorant and weak; that is why, he needs being educated, trained, enabled, enlightened with the attributes suitable to sustain on the surface of the earth! His being sustainable physically, mentally spiritually sound is a must to be a helpful creature for promoting peace and prosperity for both for his own as well as for the others around him.

The hearts of humans that are invisibly functioning in two ways like circulating blood and invisibly getting polluted or purified but never remain inactive because the moment heart is inactive the moment death arrives; in other words, active heart or sound heart is the symbol of life! However, human hearts are affected by malady which is caused by the Satanic forces, I mean, evil forces that are our real foes leading us to the against the will of God.

A man of polluted heart appears human shaped creature physically but turns into a beast inwardly; that is why, he is

dangerous to all surrounding him as well as harmful for himself (95:5 summa radadnahu asfala saafeleen).

A family, a society, a country, and no institutions are comfortable and safe having the corrupt hearted humans, and they are not on 'Syratul Mustaqim' which guides you the way practiced by Ahle Sunnat al Jamayat (ma anaalyhi wa ashabihee). The word 'nafs', an abode of basic instincts, in various forms is cited in the Holy Quran nearly 295 times which become prey to Satanic whispers and Allah loves people having the 'nafse mutmayinna' or pure nafs; and other phases of 'nafs' need to be purified which can be attained through the methodology of usul e sabya. When people are inwardly developed or purified in the context of controlling himself from the evils like envy, jealousy, high ambition, ego, conceit, lust, greed, selfishness, pride, malice, hatred, enmity, anger, fascination, etc. that may come in the apparels of attractive elements but the negative instincts proving nothing good and positive.

Against all the above mentioned inward evils, Usul e Sabya is a Shield! Because without the manners of sacrificing attitude and applying spiritual methodology which are the ways and practices by which all the goals noted above become smoothly attainable.

Influence and practice of Usul e Sabya would stop all kinds of system loss, and would heighten the implementation of the master plans effectively. It would also strengthen the potentials of the initiatives required to appease the anti-corruption, anti-social, anti-peace situation because when professionals or people are motivated to work under moral obligation; they are supposed to work with self-commitment for the commoners. Hadith tells that there is a piece of flesh in everyman; if it is sound then the whole body remains good and when it is sick; his whole body gets sick and that is Qulb or heart. The holy Quran says-'Qa'daflaha man tazqqa! 'He who purifies himself becomes successful'.

Almighty Allah desires and seeks His whole creation to love and cherish His most beloved Prophet(pbuh) more than their lives and everything they have as He Himself loves him most above all the creation! Almighty Allah wants His whole creation to love him. However, in obtaining the attributes or qualities of God through the imbibing of the greatest prophet (pbuh) is the Will of the Almighty as man is not God but Godly. Almighty has created humans to satisfy His desire to be Godly by loving His most beloved prophet(pbuh) most and thus worshipping Him. Henceforth, Usul e Sabya refers to that approach or methodology which must help a commoner attain the above discussed purpose of the Almighty.

Usul e Sabya means the seven approaches or norms; practice and cherishing of these ideals are sure to help a person to attain the attributes of the Almighty and power of love for the Prophet that can help this planet with full of heavenly blessings and peaceful abode for all the creatures in this universe!

So, Usul e Sabya is the way by which one can be Godly as all these seven practices can make a man a real contributor in establishing the peaceful environment in the society.

Accordingly, he is expected free from being allured by anything as return fulfilling his self-interests and benefits, which is supposed to be obtained only through the practice of ‘Faana anil khalq’ seeking no return from others of being benefitted, rewarded by anyone or anything of others!

‘Faana anil Hawa’ refers to being away from all the unnecessary activities or being silent about and talks which serves no purpose; consequently, this habit leads to the practice of simplicity of life. It presents one a very simple life having no turmoil and hazards; as a result, people can enjoy heavenly peace and can afford to exert full concentration on the targets of his or her project plans. ‘Faana anil erada’ refers to being committed to sacrifice and do everything in the Will of the Almighty which claims one to be particular about satisfying the desires of Allah ignoring one’ own individual or personal gains!

The Four Deaths:

a. White Death develops one's self-control and fasting habit leading him to remain unselfish and unambitious; as a result, people enlightened with that status must be able to work objectively. People belonging to organizations and institutions, if become subjective; are common threats of one's personal egos and whims giving no benefits but negative consequence. Sustainable Development goals are under certain methodologies in obtaining the consequences so white death attitude is sure to be a contributing factor in sustaining the productivity.

b. Black Death brings the death of the fear of others criticism and backbiting; when people motivated to work positively then there come huge venues of criticism or hostility, and if one is thwarted or halted facing these challenges then the target achievement would be handicapped.

   So this Black Death approach would save one's being preoccupied with and heedful about the impediments caused by the inimical or hostile attitude as well as unfriendly obstacles which are common on the way of one's individual or an institution's progress. So when people if remain aware of others oblique remarks and criticisms and take everything positively with patience then no fear rather it must enhance the speed of success journey!

c. Red Death is an inevitable approach not only for a family peace rather to sustain peace and prosperity in the society. The practice of Rad Death has no alternative. Nowadays, it has been an absolute criterion to determine the values and peace ; lack of which, the whole world appears to be a hellish abode which is now everywhere and every moment sought to check the beast of man!

The Holy Quran says ‘ LaaTaqrabuzzena’ is a must for peace and prosperity as well as to the SDGs and Red Death is considered to be the shield to heighten the spiritual and social progress. It creates basically the extinction of greed or lecherous instincts of man; simultaneously, keeps man pure in character.

d. Green Death , to a great extent, has become an absolute practice as to serve the humanity as well as to save millions of people all over the world from artificial hunger and hapless wretched status of life which is visible in the third world!

Its practice makes one unselfish and unambitious, at the same time, keeps people away from being guided by their lustful and lascivious ways of life harmful for his familial as well as national or institutional developments.

Hazrat Ghawth-ul- A’zam Shah Sufi Syed Ahmed Ullah Maizbhandari (Q.) was one of the greatest saints, who established Maizbhandari Tariqa enlightened with the ideals and teachings of the Holy Quran and Hadith emphasizing on the inner purification by gleaning divine love and attraction adorned with the practice of attaining spiritually strong and purified life through Usul-e-Sabya. The Usul-e-Sabya holds the authority in tying universal brotherhood, humanitarian values, helpful human beings regardless of their caste, sect, creed or religious identity. This Usul-e-Sabya is the essence of his great lesson for all of us to go ahead.

Chairman
Department of English
Mohammadpur Government College
Dhaka.

ভাণ্ডারী দর্শনের সাতটি কর্মনীতি ও সংগীতের পারম্পর্য

ড. সাইম রানা

মানুষের প্রকৃত কাজ হলো নিজেকে উন্মোচন ও বিকশিত করা। সৃষ্টি লগ্ন থেকে যে সকল ধর্মের প্রবর্তক, অবতার, মনীষীগণ এসেছেন, প্রত্যেকেই এতদ্‌বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন। অথচ মানুষ বার বার পথ-বিচ্যুত হয়েছে এবং সম্পত্তি ও লোভের বশবর্তী হয়েছে। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, প্রাচুর্যের মোহে পতিত হয়ে নিজেকে বিকশিত করার পথ ভুলে যায়। কিন্তু যারা এই মোহের পথ থেকে সরে আসতে চায়, তারা কীভাবে জীবনের দর্শনকে উপলব্ধি ও সাধন করবে, তা নিয়ে শতপথ-মতামত রয়েছে। অসংখ্য জ্ঞানরাজ্য, প্রজ্ঞার আধার বা উপলব্ধির আলোকরশ্মি দিয়ে জীবনকে উন্মোচন করতে হয়। কিন্তু এসবের মধ্যেও অনেক সংকীর্ণ ও বিভ্রান্তির ফাঁদ রয়ে গেছে। সঠিক তত্ত্ব ও জ্ঞানকে শনাক্ত করা কঠিন। সবাই সঠিক বলে প্রচার করে, কিন্তু নিজেকে বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও উন্নত শিক্ষা দিয়ে নির্বাচন করতে হয়। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় আত্মশুদ্ধির জন্য সাতটি কর্মপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিসমূহ হলো- আত্মনির্ভরতা, অপ্রয়োজনীয়তাকে পরিহার, প্রভুর ইচ্ছাকে প্রাধান্য, সংযম, সংশোধন, লালসামুক্ত জীবন এবং প্রভুর আনুগত্যে নির্বিলাস জীবন যাপন। যে কোনো মানুষ অর্থাৎ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নানা ধর্মীয়-বর্ণ সকলের জন্য তা প্রযোজ্য। এমনকি সংসারী-বৈরাগী, ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু সব জাতি-গোষ্ঠীর যে প্রভুর ধারণা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার প্রতি নিবেদনও এই মতাদর্শে গৃহীত হয়েছে। কৈশোর থেকে মাইজভাণ্ডারী দর্শনকে জেনেছি সংগীতের মাধ্যমে। গান সাধনা, সংঘ প্রতিষ্ঠা বাংলায় বিরল নয়। ভারতীয় ও পারস্য সুফিবাদী ধারার চর্চায় সংগীতের ব্যবহার অতি পুরোনো। এমনকি সংগীতের মাধ্যমেই ধর্ম-দর্শন প্রচার ও বিস্তারের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। এখনো দেখা যায় বাউল না হয়েও বাউল গান করা, বৈষ্ণব না হয়েও কীর্তন ও হরিনাম জপ, সুফিবাদী না হয়েও কাওয়ালি-গজল গান করা হয় বাংলায় সর্বত্র। দর্শনকে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে বিকশিত করতে পারলেই তখন তা সমাজে দৃঢ় ভিত্তি গাড়ে, অন্যথায় সেই দর্শন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত থাকে। মাইজভাণ্ডারীর সমৃদ্ধ দার্শনিক মতাদর্শ রয়েছে, তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের নিকট বোধগম্য হতে পারা বিরল। কিন্তু সংগীতের মাধ্যমে তা সহজেই গ্রামে-গ্রামান্তরে, প্রান্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে। সংগীত ছাড়া এই দর্শন সম্পর্কে হয়তো কৈশোর থেকে জানা সম্ভব হতো না।

একে বাংলায় একটি নিজস্ব স্কুল হিসেবে প্রতিপন্ন করা করা যায়। রমেশ শীলের একটি জনপ্রিয় গানে তার ইঙ্গিত পাই-

"স্কুল খুইলাছে রে মাওলা ইস্কুল খুইলাছে,
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইস্কুল খুইলাছে।

মাইজভাণ্ডারী এই স্কুলের মাধ্যমে গায়কী-সুরশৈলী ও ছন্দের বিবেচনায় নিজস্ব একটি ধারা তৈরি করতে পেরেছে যা পশ্চিম এশিয়ার কাওয়ালি ও সেমা সংগীত এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। এটা সংগীত বিজ্ঞানীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চট্টগ্রাম অঞ্চলে অসংখ্য শিল্পী ও গীতিকার নতুন নতুন ভাণ্ডারী গান রচনার মধ্য দিয়ে এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ফলে তা গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্ত হয়ে উঠেছে।

ভাণ্ডারী দর্শন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বীক্ষণের জায়গায় থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যাবে, এতদঞ্চলের মানুষের জীবন ও বোধের সাথে সমন্বয় রেখে এই মতপন্থীগণ নিজেদের উন্মোচিত করেছেন। ফলে মৌলবাদী-উগ্রবাদী অসংখ্য মতপন্থীদের বিপক্ষেও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঙালি উদারপন্থী মুসলমানগণ এমনকি যে কোনো ধর্মানুসারীর কাছে ভাণ্ডারী সংগীত একটি সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতার উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

সহকারী অধ্যাপক,
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা

মেহেদী হাসান

সার-সংক্ষেপ ঃ তাসাউফ বা সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক রূপ। ভক্তি, বিনয় এবং প্রেমসাধনার মাধ্যমে যে ইসলাম মানুষের মধ্যে অর্জিত হয়, তা-ই হচ্ছে তাসাউফ। স্রষ্টার প্রতি অগাধ ভক্তি, বিনয় এবং সৃষ্টির প্রতি প্রেমের মাধ্যমেই তাসাউফ অর্জিত হয়। সুতরাং যার মধ্যে ভক্তি, বিনয় এবং প্রেম-এ তিনটি গুণ নেই, তার মধ্যে তাসাউফ অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমেই কেবল এ গুণাবলি অর্জন করা সম্ভব। মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রদর্শিত উছুলে ছাবয়া চর্চার মাধ্যমে এলমে তাসাউফের স্বরূপ লক্ষ আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ন অতি সহজে হাছিল হয়, যা বক্ষমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় বক্ষমান।

সূচক শব্দ ঃ সুফিবাদ, মাইজভাণ্ডারী তরিকা, উছুলে ছাবয়া, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)

তাসাউফ এমন একটি বিষয়, যা স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে শেখায়, স্রষ্টার হাকিকত ও মারফতের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। মহানবীর ওফাতের পর রাজনৈতিক ইসলামের ধ্বজাধারী জাহেরি আলেমরা ইসলামকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, যা কেবল একে-অপরকে আক্রমণ, হত্যা ও ঘৃণার দিকেই মুসলমানদের পরিচালিত করছিল। তখন থেকেই তাই কিছু সংখ্যক অলি-আউলিয়া এলমে তাসাউফ চর্চা করে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে অর্জিত হাকিকত ও মারফতের বাণী সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন এবং মানুষকে স্রষ্টার আনুগত্য, ভক্তি ও বিনয় এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এমনকি মওলানা জালালুদ্দিন রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর বিশ্বপ্রেমের আকর গ্রন্থ মসনবি শরিফে জাহেরি আলেমদের মন-মানসিকতার ইসলাম থেকে নির্বাসিত এ প্রেমকে আলাদা এক মাযহাব হিসেবেই ধার্য করেন এবং ঘোষণা করেন–

ملت عشق از همه دینها جداست ‹› عاشقان را مذهب وملت خداست

প্রেমের সম্প্রদায় অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায় হতে ভিন্ন। যাঁরা প্রেমিক, তাদের মাযহাব ও সম্প্রদায় একমাত্র আল্লাহ্। (মসনবি, ২য় খণ্ড, অধ্যায়-৩৬) (হক, ১৯৯৬:১৩)

তিনি 'মসনবি শরিফে' সার্বজনীন প্রেমের প্রশংসা করে বলেন–

هر کرا جامه ز عشقی چاق شد ‹› او از حرص و عیب کلی پاک شد

প্রেমের কারণে যার গায়ের জামা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, সে যাবতীয় লোভ-লালসার দোষ হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়েছে। (মসনবি, ভূমিকাংশ) (করিম-১,২০১৭:৬৮)

তিনি কেবল প্রেমকেই আমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক সকল সমস্যার সমাধান বলে চিহ্নিত করে বলেন–

شاد باش ای عشق خوش سودای ما ‹› ای طبیب جمله علت های ما

সুখে থাক হে আমাদের প্রেমরূপী মূলধন! ওহে, তুমিই সমস্ত ব্যধির চিকিৎসক। (মসনবি, ভূমিকাংশ)

বেলায়তের প্রথম যুগ থেকেই সুফি-দরবেশগণ সবাই কোনো না কোনো তরিকার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা অনুযায়ী স্বীয় অনুসারীদেরকে ধর্মাচরণ শিক্ষা দিতেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। এসব তরিকার সাধনাসমূহের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে হাকিকত ও মারফতের জ্ঞানার্জন। এসব তরিকার মধ্যে যে চারটি তরিকা সময়ের বিবর্তনে সমগ্র উপমহাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করে, সেগুলো হচ্ছে: কাদেরিয়া তরিকা, চিশতিয়া তরিকা, নকশবন্দিয়া তরিকা এবং মোজাদ্দেদিয়া তরিকা। বাংলাদেশেও এ চারটি তরিকার অনুসারিদেরই বেশি দেখা যায়। তবে এর প্রথম তিনটি তরিকা আরব-ইরান তথা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তরিকা এবং শেষটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ভারতের দিল্লী এলাকা। ইসলাম আবির্ভাবের পর থেকে প্রায় বারোশত বছর ধরে এ তরিকাগুলো এদেশের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অদূরে মাইজভাণ্ডার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণকারী নবি বংশীয় মহান অলি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)-এঁর মাধ্যমে খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর মন-মানসের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ একটি নতুন ধারার ইসলামি তরিকার উদ্ভব ঘটে, যেটি উল্লিখিত গ্রামের নামানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করে 'মাইজভাণ্ডারী তরিকা' নামে। (মাইজভাণ্ডারী; ২০১৮:০৪)

মহানবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর দুই মোবারক নাম মোহাম্মদ ও আহমদ। এ দুই নামই বেলায়তের দুটি মশরবের উৎস: মোহাম্মদিউল মশরব উৎসরিত গাউসিয়াত এবং আহমদিউল মশরব থেকে উৎসরিত কুতুবিয়ত। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ছিলেন বেলায়তে মোকাইয়াদার যুগের সমাপনীতে বেলায়তে মোত্লাকার প্রতিশ্রুত আহমদিউল মসরবের খাতেমুল অলি, যা আমরা তাঁর পৌত্র হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) রচিত বেলায়তে মোত্লাকা নামক

গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। (মাইজভাণ্ডারী, ২০১৪:০৪) বাংলাদেশে তাসাউফ জগতে এমন একটা তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য বই দ্বিতীয় আরেকটি নেই। এ বইয়ে তিনি এলমে তাসাউফ, বিশেষ করে মাইজভাণ্ডারী তরিকার যে প্রামাণ্য পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মাইজভাণ্ডারী তরিকার উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি। 'ফানায়ে ছালাছা এবং মউতে আরবা' নামে দুই ভাগে বিভক্ত এ উছুলে ছাবয়াকে নফ্সে ইনসানি বা কুপ্রবৃত্তি পরিশুদ্ধির মোক্ষম পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমান সময়ের বাস্তব ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে পীরগিরিকে অনেকে একটা পুঁজিহীন লাভজনক ব্যবসা বলে মনে করে থাকে। এক ধরনের ধর্ম-ব্যবসায়ী পীর নামধারী মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে এলমে তাসাউফ সম্পর্কে সমাজে এমন একটি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের পীর নামধারী লোকেরা কেবল মানুষের সরল বিশ্বাস নিয়ে ব্যবসাই করে না, বরং তাদের মধ্যে এরকম বিশ্বাসেরও উন্মেষ ঘটায় যে, মুক্তি পেতে হলে তাকে এই পীরের কাছেই আসতে হবে এবং তার দরবারেই পড়ে থাকতে হবে; এছাড়া তার মুক্তির কোনো আশা নেই। সুতরাং জান-মাল-সময় সবকিছুই পীরের জন্য উৎসর্গ করে তাকে সংসারবিমুখ সন্ন্যাসী হতে হবে। মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এ বিষয়টি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যেহেতু বেলায়তে মোত্লাকা বা মুক্ত সুফিবাদের উন্মোচনকারী ছিলেন, তাই সুফিবাদের সাধন পদ্ধতিকে পীরের হাতে কুক্ষিগত না রেখে এটিকে তিনি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবীর সব মানুষ মাইজভাণ্ডারী তরিকাকে গ্রহণ করবে না এবং যারা গ্রহণ করবে, তারাও কর্মব্যস্ততার কারণে সবসময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে এসে একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন হতে পারবে না। তাই তিনি মাইজভাণ্ডারী তরিকা বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য তাসাউফ সাধনার এক সার্বজনীন পদ্ধতি নির্ধারণ করেন, যেটি চর্চার মাধ্যমে যে কোনো দেশে অবস্থানকারী যে কোনো ধর্মের মানুষ তার নফ্সে ইনসানি বা কুপ্রবৃত্তি পরিশুদ্ধির মাধ্যমে ইনসানে কামেল বা সার্বজন কল্যাণকামী একজন মানবিক গুণসম্পন্ন পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারবে। যার দ্বারা জীবন-জগত-মানবতা কেবল উপকৃতই হবে। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নির্ধারিত এ পদ্ধতিটি 'উছুলে ছাবয়া' বা আধ্যাত্মিক সাধনার সপ্তপদ্ধতি নামে সুপরিচিত। মাইজভাণ্ডারী তরিকার এ সপ্ত পদ্ধতি নফ্সে ইনসানি বা কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করে রূহে ইনসানি তথা সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য একটি নির্বিঘ্ন ও সহজসাধ্য মাধ্যম। আধ্যাত্মিক সাধনার এ সপ্ত পদ্ধতি দুটি স্তরে অনুশীলিত হয়:

১. ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তরঃ

ক. ফানা আনিল খাল্ক: খোদার সৃষ্টির উপর নির্ভরশীলতা অর্জনপূর্বক পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা।

খ. ফানা আনিল হা'ওয়া: স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে অনর্থক কাজকর্ম, কথাবার্তা ও প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত থাকা।

গ. ফানা আনিল এরাদা: নিজ ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করে তসলিম বা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ পূর্বক তাঁর রজা তথা সন্তুষ্টি অর্জন করা। (আযহারী, ২০১৫:০১)

২. মউতে আরবা' বা প্রবৃত্তির চতুর্বিধ মৃত্যুঃ

ক. মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু: উপবাস ও সংযমের মাধ্যমে এ মৃত্যুর গুণ অর্জিত হয়। ফলশ্রুতিতে মানবমনে এক পুতঃপবিত্র উজ্জ্বলতা ও আলো দেখা দেয়।

খ. মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু: সমালোচনা সহ্য করার মানসিক শক্তি অর্জন করে এতে বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধনের মন-মানসিকতা অর্জনই কালো মৃত্যু। (চৌধুরী, ২০১২:২২৮)

গ. মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু: প্রচণ্ড মানসিক শক্তি এবং কঠিন আত্মিক সাধনার মাধ্যমে নিজের মধ্য থেকে কামস্পৃহা ও লোভ-লালসার মৃত্যু ঘটাতে পারলেই মানুষের মধ্যে মউতে আহমরের গুণ অর্জিত হয়।

ঘ. মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু: সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভোগ-বিলাস ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ত্যাগ করে নির্বিলাস ও সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে সবুজ মৃত্যুর গুণ লাভ হয়। (মনছুর, ২০১৯:০৪)

উছুলে ছাবয়ার বিশ্লেষণে হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বলেন, "এই সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজ সাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ না হইয়া বরং বন্ধু সুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়।" "অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধির নিয়মানুবর্তীর সঙ্গে বিরোধাত্মক নহে। বরং উৎসাহ বর্দ্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী।" (মাইজভাণ্ডারী, ২০১৪:৭১)

এ উছুলে ছাবয়া অনুসরণ ব্যতীত কেউ এলমে তাসাউফের জগতে টিকে থাকতে পারবে না, সেটা সুনিশ্চিত। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষকে মানবিক গুণ সম্পন্ন এক অসাধারণ মানুষে পরিণত করা এবং তরিকত সাধনার পন্থা হিসেবে হাকিকত ও মারেফাত লাভে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ইতোমধ্যেই তাসাউফ জগতে প্রমাণিত হয়েছে।

আত্মশুদ্ধি বা আত্মোন্নয়ন ও তরিকত সাধনার ক্ষেত্রে এবং হাকিকত ও মারফত লাভের ব্যাপারে উছুলে ছাবয়ার বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে তাসাউফের যে ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ব্যাপারে সুফি গবেষক সৈয়দ আহমদুল হকের একটি মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, তাসাউফের ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডার শরিফের বহু অবদান রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে যে চারটি অবদান তাঁর কাছে প্রধান বলে মনে হয়, তা হলো: ১. রূহানি বা পবিত্র প্রেম, যে প্রেমের কথা মওলানা রুমি তাঁর ছাব্বিশ হাজার মসনবি মারফত বলে গেছেন; ২. এবাদতের জন্য বাংলাদেশের সঙ্গীত মার্গে এমন একটি সম্পূর্ণ নতুন সুরের প্রবর্তন, যেটা মানুষের মন-প্রাণে প্রবল ভাবাবেগ এনে দেয়; ৩. আধ্যাত্মিক সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠা এবং ৪. বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধন। (হক, ১৯৯৬:৬২)

১. রূহানি প্রেম: এটি হচ্ছে পবিত্র প্রেম বা এশ্‌কে পাক। যে প্রেমের শিক্ষা মাইজভাণ্ডার হতে পাওয়া যায়, তা হলো নিঃস্বার্থ প্রেম। উহা হুব্বে রাসুল বা রাসুল প্রেম। এতে "কি ও কেন" এর স্থান নেই, যুক্তির অবকাশ নেই। এজন্য বলা হয়, When Love is in, Reason is out অর্থাৎ, প্রেম যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন যুক্তি বের হয়ে যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে যুক্তি চলে না, এটা হৃদয়ের ব্যাপার। এ প্রেম নিকষিত হেম, ওটাতে কোনোরূপ ক্লেদ বা কামগন্ধ নেই। এজন্য কবি হাফিজ বলেন–

به وادیه که بگذشتم نه جای چون وچر است
نه صورت است ، نه شکل، نه جسم و جان آنجاست

আমি এমন এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলেছি যেখানে "কিরূপ" ও "কেন" এর স্থান নেই। ওখানে কোনো সুরত নেই, কোনো আকার নেই, কোনো শরীর নেই বা কোনো প্রাণও নেই।

خطاست کلمهٔ منصور در راه وحدث
چه گناه صوت لب وجنبش زبان است

একত্বের পথে মনসুরের বাণী অপরাধজনক বটে। ওখানে ওই সময় কি করে ঠোঁটের শব্দ বা জিহ্বার নড়াচড়া হতে পারে? প্রেমের টান অদৃশ্য। (দিওয়ানে হাফিজ)

রমেশ শীল বলেন :

কত খেলা জানরে মওলা কত খেলা জান
প্রেমের রশি গলায় দিয়ে আস্তে আস্তে টান।

প্রেমের রশি দেখা যায় না, ওটা অদৃশ্য। ওই রশি কেন বা কিভাবে গলায় পড়ল, তা বলা যায় না। (করিম-২, ২০১৭:১৪৮-১৪৯)

২. আধ্যাত্মিক গান: আরেকটি হলো আধ্যাত্মিক গান-বাজনা। এ ধরনের গান-বাজনা যে অজ্‌দ আনে, তা পবিত্র। মওলানা রুমি শুরুতেই বাঁশীর কাহিনী দিয়ে তাঁর মসনবি

আরম্ভ করেছেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র ধ্যানে নাচতে নাচতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় মুখে ফেনা ওঠা চাই।' ইউরোপে মওলানা প্রবর্তিত মৌলবিয়া তরিকার লোককে Dancing Dervish বা নাচুনি দরবেশ বলা হয়। মাইজভাণ্ডারীদের নাচ ও গানের তালও একই রকম। (হক, ১৯৯৬:৬৪)

৩. সংশোধনাগার: মাইজভাণ্ডারী তরিকায় একটি সংশোধনমূলক দিক রয়েছে। একথা প্রমাণিত যে, এখানে এসে অনেক কুখ্যাত ডাকাত, খুনি, চোর ও বদমায়েশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এবং তারা সুপথের সন্ধান পেয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, গাউসে পাক হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানির সংস্পর্শে এসে একটি ডাকাতের দল ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল। ফরাসি ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগো (১৮৩২-১৮৮৫ খ্রি.) তাঁর উপন্যাস লা মিজারেবল্‌স্ (Les Miserables-1862)-এ দেখিয়েছেন, একজন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী (Convict) একজন বিশপের সংস্পর্শে এসে সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এজন্য মওলানা রুমি বলেন:

صحبت صالح ترا صالح کند ‹› صحبت طالع ترا طالع کند (مثنوی)

একজন সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শ তোমাকে সাধু করবে, আর একজন খারাপ ব্যক্তির সংসর্গ তোমাকে খারাপ করবে। (মসনবি)

گر تو سنگ خاره و مر مر شوی ‹› چون به صاحب دل رسی گو هر شوی

তুমি যদি পাহাড়ের শিলা বা মর্মর পাথরও হও, তথাপি যদি একজন সাধু ব্যক্তির নিকট পৌঁছ, তাহলে তুমি রত্নে পরিণত হবে। (মসনবি, ১ম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ-৩৪)

নিজের উপর জুলুম করার পর যাঁরা মাইজভাণ্ডারী তরিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং শুদ্ধচিত্তে অকৃত্রিম তওবা, অর্থাৎ অনুশোচনা করেছেন, তাঁদেরকে শুদ্ধ করার জন্য কোনো দণ্ডবিধি আইন বা অপরাধ দমন অধ্যাদেশের প্রয়োজন হয় না। মাইজভাণ্ডারী খানকাকে আধ্যাত্মিক সংশোধনাগার বলা চলে। এটা ভিন্নধর্মী বোর্স্টাল স্কুল বা সংশোধক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটা লক্ষ করে রমেশ শীল গেয়েছেন–

চলরে মন ত্বরায় যাই, বিলম্বের আর সময় নাই
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী স্কুল খুইলাছে।
আবাল-বৃদ্ধ, নর-নারী করে সবে হুরা হুরি
নাম করে রেজিস্টারি ভর্তি হইতাছে।
সেই স্কুলের এমনি ধারা বিচার নাই জোয়ান বুড়া
সিনায় সিনায় লিখা-পড়া শিক্ষা দিতাছে

মাস্টার ও মাহিনা ছাড়া এলমে লদুনি পড়া

কাগজ কালি দোয়াত কলম কি দরকার আছে।

নফ্সানিয়তে ভাগ বিয়োগ, রূহানিতে পূরণ যোগ

ঈমানী সাহিত্য তার নির্দিষ্ট আছে

খেদমত বিজ্ঞান যার, দয়া করলে হেডমাস্টার

তামাম দুনিয়া হবে নজরের কাছে (করিম-২, ২০১৭:২৫০-২৫২)

৪. সম্প্রীতি: মাইজভাণ্ডার সব সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র। গাউছে পাক হযরত বড়পীর ও খাজা মইনুদ্দিন চিশতির মাজারে যেমন সব রকমের লোক- হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বড়-ছোট সকলে উপস্থিত হয়ে দোয়া কামনা করেন, তেমনি মাইজভাণ্ডারি দরবার শরিফেও সব রকমের নর-নারী উপস্থিত হয়ে দোয়া-খায়ের কামনা করেন। এটা অবাধ ও মুক্ত প্রেমের প্রাসাদ। এটা এমন এক দরবার, যেখানে হাফিজের ভাষায় বলতে গেলে-

هر که خوا هد گو بیا و هر که خواهد گو برو

کبـر وناز و حاجب و در بان بدین در گاه نیست

যার ইচ্ছা তাকে আসতে বলো, যার ইচ্ছা তাকে ওখানে যেতে বলো। এ দরগাহে কোনো ঔদ্ধত্য, ঘৃণা, দারোয়ান বা দ্বাররক্ষক নেই–

بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود

خود فر وشان را به کوی مـی فر وشان راه نیست

শারাবখানায় (আল্লাহ্র প্রেম দরবারে) যাওয়ার জন্য সরলমনা একরঙা মানুষের প্রয়োজন। শারাবখানার গলি অহংকারীদের রাস্তা নয়। (দিওয়ানে হাফিজ, গযল নং-৭১)

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া

বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান

এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান.

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন, ধরে হাত সবাকার। (হক, ১৯৯৬:৬৫-৬৬)

এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার। (গীতাঞ্জলি) (ঠাকুর, ১৩২০:১১৯)

তথ্যসূত্রঃ

১. আযহারী, শায়খ মুহাম্মদ মুহি উদ্দীন; *মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি*; জ্ঞানের আলো, চট্টগ্রাম- ২০১৫।

২. করিম, সৈয়দ রেজাউল ও অন্যান্য (সম্পাদিত); *সৈয়দ আহমদুল হক রচনাবলি (প্রথম খণ্ড)*; আল্লামা রুমি সোসাইটি, চট্টগ্রাম-২০১৭।

৩. করিম, সৈয়দ রেজাউল ও অন্যান্য (সম্পাদিত); *সৈয়দ আহমদুল হক রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড)*; আল্লামা রুমি সোসাইটি, চট্টগ্রাম-২০১৭।

৪. চৌধুরী, প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান; *মাইজভাণ্ডারী দর্শন উৎপত্তি, বিকাশ ও বিশেষত্ব*; আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী, চট্টগ্রাম-২০১২।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; *গীতাঞ্জলি*; ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস; কলকাতা-১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৬. মাইজভাণ্ডারী, খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন; *বেলায়তে মোত্লাকা*; মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম-২০১৪।

৭. মাইজভাণ্ডারী, মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন; *গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত*; মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম-২০১৮।

৮. মনছুর, মুহাম্মদ আবুল; *গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) কর্তৃক প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি*; মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম-২০১৯।

৯. হক, ছৈয়দ আহমদুল; *মুরলীর বিলাপ*; আল্লামা রুমি সোসাইটি; চট্টগ্রাম-১৯৯৬।

১০. شیرازی، شمس الدین محمد حافظ؛ *دیوان حافظ*؛ انتشارات امیر کبیر، تهران-۱۳۷۴

১১. مولوی، مولانا جلال الدین محمد؛ *مثنوی*؛ سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی ایران؛ تهران-۱۳۸۵

সহকারী অধ্যাপক,
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু

মুহাম্মদ আবুল হোসাইন

মানুষের মধ্যে দুই ধরনের ব্যাধি রয়েছে, একটি হলো- আত্মিক ব্যাধি, অপরটি হলো- শারীরিক ব্যাধি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার কারণে মানুষ যেভাবে বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ঠিক তেমনিভাবে নাফ্‌সের প্ররোচনার কারণে মানুষ আত্মিক ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়। আত্মিক ব্যাধির কারণে মানুষের অন্তর কলুষযুক্ত হয়ে যায়। যার কারণে মানুষের ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। তাই বিখ্যাত সুফি সাধকগণ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ইবাদত কবুলের ক্ষেত্রে কাপড় ও শরীর পবিত্র হওয়ার শর্তের সাথে অন্তর পবিত্র হওয়াকেও শর্ত হিসেবে যুক্ত করেছেন। আর আত্মার অন্যতম ব্যাধি হলো, কামভাব ও লোভ-লালসা। এই দুটি ব্যধি মানুষের হৃদয়কে এমনভাবে গ্রাস করে যা তাকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তাই আধ্যাত্মিক সম্রাট গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির অন্যতম 'মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু' অর্জনের জন্য শর্ত হলো, কামভাব ও লোভ-লালসা হতে মুক্ত হওয়া। মূলত এগুলোর কারণেই বর্তমান সমাজে ধর্ষণ, খুন ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোচ্য কলামে 'মউতে আহ্‌মর' বা লাল মৃত্যুর মর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

কামভাব বা কামরিপু :

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের হৃদয়ে কামভাব এ জন্য দিয়েছেন, এ উত্তেজনায় সে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়ে সঙ্গমের মাধ্যমে বীজ বপন করবে, যার মাধ্যমে মানব বংশ অবশিষ্ট থাকবে এবং সঙ্গমের মাধ্যমে সে স্বর্গীয় সুখ-আস্বাদের একটু নমুনা পাবে। এটাই হৃদয়ে কামভাব দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কামভাবকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে পুরুষ-মহিলা অবৈধ ভাবে মেলামেশা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এমনকি কামভাব উত্তেজনার সূচনা দৃষ্টিকেও সংযত রাখার জন্য আল্-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে নবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা)! আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে (সূরা আন্-নূর, ২৪: ৩০)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: হে নবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা)! আপনি মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে (সূরা আন্-নূর, ২৪: ৩১)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিন নর-নারীকে চক্ষু ও লজ্জাস্থানকে সংযত ও হেফাজত করার জন্য সরাসরি নির্দেশনা দিয়েছেন। আর চক্ষু সংযত না রাখার কারণে মানব হৃদয়ে কামভাবের উদ্ভব হয়। যার কারণে মানুষ লজ্জাস্থানকে

হেফাজাত করতে সক্ষম হয় না। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে কুবাসনায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অন্তরের ব্যাধিতে ব্যাধিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: সে ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩২)

রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) বলেন: "শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে (অসংযত) দৃষ্টি একটি বিষময় তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে স্বীয় চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখে, আল্লাহ তাকে এ রূপ ঈমান দান করেন, যার মাধুর্য সে আপন অন্তরে অনুভব করে।

সুতরাং কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য বর্ণনায় ক্বলবের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামভাব বর্জনের মাধ্যমে ক্বলবের পবিত্রতা হাসিলের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক উদ্ভাবত সপ্ত পদ্ধতির অন্যতম 'মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যুর' অর্জনের অন্যতম শর্ত হলো কামভাব বর্জন। কারণ এ কামভাবই মানুষের অন্তরকে কালো রেখায় আচ্ছাদিত করে। যার কারণে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তাই হযরত কেবলা (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অলিয়ে কামেল হওয়ার জন্য কামভাব থেকে মুক্ত হওয়াকে শর্তযুক্ত করেছেন।

লোভ-লালসা:

এটি হলো নাফ্‌সের সবচেয়ে মারাত্মক গোপন ব্যাধি ও সকল অপকর্মের মূল। এই লোভ-লালসা মানুষের মধ্যে যতই বৃদ্ধি পায়, ততই তার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে, এমনকি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যাদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করে দেয়। ইয়াতীমদেরকে নিজেদের অংশ না দিয়ে সে নিজেই তা গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: এটা অমূলক, তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না। এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। আর তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালোবাস। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ : ১৭-২০) আর দুনিয়াতে মানুষ দুই প্রকারের জিনিসের জন্য লোভ করে থাকে, একটি হলো- সম্পদ, আর অপরটি হলো- সম্মান। সম্পদ ও সম্মানের লিপ্সা ব্যক্তির দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। এ জন্যই রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) বলেছেন, মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দেয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের জন্য ততটুকু ক্ষতিকর নয়, যতটুকু মানুষের সম্পদ ও মান-সম্মানের প্রতি লোভ তার দ্বীনদারির জন্য ক্ষতিকর"। (সুনানু তিরমীযি, হাদিস নং- ২৩৭৬)

অন্য হাদিসে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন, যদি আদম সন্তান একটি স্বর্ণের উপত্যকার মালিকও হয়, তবুও সে অন্য আরেকটি স্বর্ণের উপত্যকা

পেতে লোভ করবে। তার মুখ কখনো ভরাট হবে না; তবে একমাত্র (কবরের) মাটিই তাকে ভরাট করতে পারে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে একান্ত মনোবিষ্ট হয়, আল্লাহ তা'য়ালাও তার মনোনিবেশকে কবুল করেন। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৪৬৪)

সুতারাং সম্পদ ও সম্মানের অতি লোভ নিতান্তই ক্ষতিকর। এ কারণে মানুষ পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবিতে লিপ্ত হয়। দুনিয়াতে মানুষ যত অপরাধই করে থাকে, তার অধিকাংশই লোভ-লালসার কারণেই হয়ে থাকে। তাই সপ্ত পদ্ধতির অন্যতম মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু অর্জনের জন্য শর্ত হলো, লোভ-লালসা মুক্ত হওয়া।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক উদ্ভাবিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি মানুষকে আত্মার ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার অন্যতম একটি ব্যবস্থাপত্র। যা অনুকরণে মানুষ ইন্‌সানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষরূপে পরিগণিত হতে পারবে। আর উক্ত সপ্ত পদ্ধতির অন্যতম 'মউতে আহ্‌মর' বা লাল মৃত্যু অর্জনের জন্য শর্ত হলো কামভাব ও লালসা হতে নিজেকে মুক্ত রাখা। আর এ ঘাতক মন্দ স্বভাব বর্জনের মাধ্যমেই মানুষ 'মউতে আহ্‌মর' বা লাল মৃত্যু অর্জন করে বেলায়ত প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র বন্ধুতে পরিণত হতে সক্ষম হবে।

সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা

ড. মোহাম্মদ রেজাউল হোছাইন

ইসলাম মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মনোনীত বিশ্বশান্তির শাশ্বত ব্যবস্থাপত্র। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দ্বারাই কেবল পরিপূর্ণ বিশ্বশান্তির নিশ্চয়ন সম্ভব। ইসলামের শাশ্বত বিধানাবলি উল্লেখ রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এর সুন্নাহর মাঝে। কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করে, আধ্যাত্মিক মহাশক্তি অর্জনের মাধ্যমে এবং বেলায়তের মর্যাদাপূর্ণ সিংহাসনে আসীন হয়ে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত অলী হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক মর্মার্থবোধক কতিপয় উছুল নির্দেশ করেছেন, যা শব্দ বিচারে সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্ব, মর্ম ও মহত্ত্বের বিচারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী। তিনি উক্ত আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যময় উছুলগুলোর নামকরণ করেছেন 'উছুলে ছাবয়া' তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি, যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অকল্পনীয় অবদান রাখতে সক্ষম। বক্ষ্যমান আলোচনায় সপ্তকর্ম পদ্ধতির কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রামাণ্যতা উপস্থাপন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তকর্ম পদ্ধতিকে প্রথমত দুটি স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। যেমন :

১. ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর

ক. ফানা আনিল খাল্ক : ফানা আনিল খাল্ক হলো কারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা না থাকা; যার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি আস্থা জন্মে। এ পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল হয়ে আত্মশান্তি খুঁজে পাবে এবং এর ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে এবং শান্তিময় বিশ্ব গড়ে উঠবে।

খ. ফানা আনিল হা'ওয়া : ফানা আনিল হা'ওয়া বলা হয়, যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়। এ উছুল মানবজাতিকে আতিশয্য, বিলাসিতা ও কৃত্রিমতা পরিহার করে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পবিত্র সুখ সম্ভোগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি আপনার জন্য সহজ শরিয়ত সহজতর করে দেবো।" অতএব ইলমে তাসাউফের এ পদ্ধতি ব্যক্তির জীবনযাপনে শান্তির সংযোগ সম্পন্ন করার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পেরিয়ে বিশ্বশান্তি অবধারিত করে দেয়।

গ. ফানা আনিল এরাদা : অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা ও বাসনাকে তাঁর ইচ্ছার নিকট বিলীন করা, যার ফলে "তসলিম ও রজা" হাসিল হয়। হাদীস শরিফে এসেছে, "আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত শরিয়তের অনুগত না হয়।"

উল্লেখ্য যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপত্তির দিকে ঠেলে দেয়, যা মানবসমাজকে অশান্তির কালো মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই এ স্তরে প্রবৃত্তির বিনাশ করে ব্যক্তি জীবনে প্রশান্তি আনয়নের মাধ্যমে মূলত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে প্রসারিত করা যায়।

২. মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু

ক. মউতে আবয়্যাজ : অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। এটি উপবাস এবং সংযমের মাধ্যমে আয়ত্ত হয়; যার ফলে মানুষের মনে আলো ও উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। উপবাস-সংযমে মানব অন্তর পাপমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত হয়। আর আলোকিত মানুষরাই আলো বিকিরণের মাধ্যমে বিশ্বাকাশে শান্তির পায়রা ওড়াতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও চেতনা সহকারে রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।"

খ. মউতে আছওয়াদ : কালো মৃত্যু। এটি শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে অর্জিত হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লিখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজে পায়, তখন নিজেকে উক্ত দোষ হতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজে না পায়, নিজেকে দোষমুক্ত বলে স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট শুকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়।

গ. মউতে আহ্‌মর : লাল মৃত্যু। এটা কামভাব ও লালসা হতে মুক্তিতে হাসিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়ে অলীয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়। লোভ-লালসা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য প্রবাদ আছে- 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' যে কোনো মানুষ কাম ও লালসা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন পরিচালিত করতে পারলে সহজেই স্রষ্টার সান্নিধ্য পায়। সমাজে যারা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তারা অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে কাম বা লালসার বশবর্তী হয়। তাই উছুলে ছাবয়া'র এ পদ্ধতি অনুকরণ-অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ঘ. মউতে আখজার : অর্থাৎ সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হলেই এটি হাসিল হয়। যার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালোবাসা ছাড়া অন্য কামনা বাসনা থাকে না। এটি বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত। বিশ্বব্যাপী যারাই বিলাসী জীবনযাপন করে তারা অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। নিজেদের বিলাসিতার

জন্য অন্য অনেকের অধিকার নষ্ট করে এবং সমাজে নানা প্রকার অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও অসংগতির সৃষ্টি করে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, সবুজ মৃত্যুর এ স্তরে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত উছুলগুলো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার এক একটি সোপান, যার বাস্তবায়নের মধ্যে মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-মুক্তি নিহিত রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারিম।
২. হাদীস শরিফ
৩. মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ), বেলায়তে মোত্লাকা, (মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম)
৪. আহমদ মায়মূন কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, (ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-১১০০), খণ্ড-১ম

সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে ও ব্যক্তি উন্নয়নে এবং আদর্শবান সুনাগরিক তৈরিতে উছুলে ছাবয়ার ভূমিকা

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম জুয়েল

বর্তমান ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বিশ্বব্যবস্থা নানা পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ শান্তির খোঁজে উন্মুখ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সর্বত্র নানাধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। মানবসভ্যতা বহুবিধ বিপর্যয়ের মুখোমুখি। বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় উতরিয়ে মুক্তির সত্য-সুন্দর পথের অন্বেষায় চলছে অব্যাহত প্রচেষ্টা। ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন, ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও আদর্শবান সুনাগরিক তৈরির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের অরাজক পরিস্থিতিসমূহকে প্রশমিত করে মানবসমাজে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর পরিবেশ আনয়ন অন্যতম প্রচেষ্টা। কারণ ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থার সামগ্রিক অনুষঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও আদর্শ নাগরিক তৈরির উপাদানসমূহ আত্মা, অন্তর, মন, মনন ও মানসিকতা এবং আচরণের বহিঃপ্রকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার পরিক্রমায় এসব অনুপম গুণাবলি স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। আলোচ্য নিবন্ধে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন, ব্যক্তি উন্নয়ন ও আদর্শবান সুনাগরিক তৈরিতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত সমাদৃত তাসাউফ পন্থা উছুলে ছাবয়া তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস রইলো।

শুরুতেই জেনে নেয়া যাক, চরিত্র কী বা উত্তম চরিত্র কোনোটিকে নির্দেশ করে। চরিত্রের পরিচয় দিয়ে Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে- Character is the particular combination of qualities in a person that makes him different from other. It is such a quality which leads a man to be determined and able to bear difficulties. হযরত হাসান বসরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, 'সচ্চরিত্র হলো হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, দানশীলতা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া' (আবূ বকর আল জাযাইরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃঃ ১১৫)। অতএব চরিত্র হলো মানুষের অন্তর্গত দিক এবং আচরণই তার প্রতিচ্ছবি। সচ্চরিত্রের চেয়ে মহামূল্যবান অন্যকিছুই হতে পারে না। চরিত্রবান হলেই পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত মানুষ হওয়া সম্ভব। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৫৪)। উত্তম চরিত্রের উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে- তাক্বওয়া, বিনয়-নম্রতা, সত্যবাদিতা, মিতভাষিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা-উদারতা, শোকর ও যিকির-আযকার, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, আল্লাহ্র উপর ভরসা করা, লজ্জাশীলতা, আমানতদারিতা, সুধারণা পোষণ, সকল জীবের প্রতি সহনশীল হওয়া, আদল-ইনসাফ প্রভৃতি।

ব্যক্তিত্ব হলো মানুষের কিছু আচরণের বহিঃপ্রকাশ। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ব্যক্তিত্ব তার স্বকীয় বংশগতি ও পরিবেশের যৌথ ফলাফল। "ব্যক্তিত্ব হলো যখন প্রত্যেকে দেখে আমি কী করি। চরিত্র হলো যখন কেউ দেখছে না আমি কী করছি।" ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা: "A brief definition would be that personality is made up of the characteristic patterns of thoughts, feelings and behaviors that make a person unique. In addition to this, personality arises from within the individual and remains fairly consistent throughout life". চরিত্র সুন্দর হলে ব্যক্তিত্ব উন্নত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সচ্চরিত্র ও সুশীল ব্যক্তিত্ব গঠনের পথ সরলরৈখিক। তাই হযরত আলী (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেছেন- "মানুষের চরিত্র সত্য ও সুন্দর হলে তার কথাবার্তাও নম্র-ভদ্র হয়।"

আদর্শবান সুনাগরিক কাকে বলা যায় বা কীভাবে তা হওয়া যায়? আমরা জানি, কোনো রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ভর করে তার নাগরিকের ওপর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইসের মতে, সুনাগরিকের গুণাবলী তিনটি, যথা: বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম ও বিবেক। একজন নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবেচনায় আদর্শবান হলেই সে আদর্শবান সুনাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। একজন সুনাগরিকের প্রধানতম দায়িত্ব হলো শিক্ষা ও শ্রমের মাধ্যমে নিজেকে এমন যোগ্য করে গড়ে তোলা। "একজন কর্মঠ মুমিন একজন অলস থেকে অনেক উত্তম।" (সহিহ মুসলিম) এরপর নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ ও রাসুল কর্তৃক প্রদত্ত আইনের পরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশের আইন পালনে যত্নবান হওয়া। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করো সেই সঙ্গে শাসকবর্গেরও আনুগত্য করো।' (সূরা নিসা-৫৯) সর্বোপরি সুনাগরিকের উচিত সর্বদা দেশ রক্ষায় নিজেকে নিবেদিত করা। হাদিস শরিফে এসেছে, 'একদিন দেশ রক্ষায় নিয়োজিত থাকা এক মাস (নফল) রোজা ও এক মাস (নফল) নামাজ থেকেও উত্তম।' (সহিহ মুসলিম)

যেহেতু উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি তাসাউফ সম্পর্কিত, তাই তাসাউফ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা পেশ করা যাক। 'তাসাউফ' আরবি শব্দ, যার অর্থ সুফিবাদ, আধ্যাত্মিকতা, অধ্যাত্মবাদ। মুসলিম দর্শনে 'তাসাউফ' সুফিবাদ নামে খ্যাত। তাসাউফের বর্ণনায় শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনসারি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, 'যে ইলমের দ্বারা অনন্ত সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের জাহির ও বাতিন গঠন করা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, তাকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়।' আল্লামা শামি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, 'ইলমে তাসাউফ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সৎগুণগুলোর প্রকারভেদ এবং তা অর্জনের পন্থা ও অসৎ স্বভাবগুলোর শ্রেণিবিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবগত হওয়া যায়।' ইলমি মারফত ও ইলমি শরিয়ত পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা)

ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করে, তাকে এমন জ্ঞান দান করেন, যা আগে তার অজানা ছিল।" রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর বাণীর সমর্থনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন।' (সূরা আনফাল-২৯)। আল-কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালকের প্রদত্ত আলোয় রয়েছে।' (সূরা জুমার-২২)।

আলোচনার এ পর্যায়ে সংক্ষেপে উছুলে ছাবয়া কী ও কেন, তা উপস্থাপন করছি। উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি হলো নফ্সে ইনসানি (কুপ্রবৃত্তি) বিনাশ করে রূহে ইনসানি (সুপ্রবৃত্তি) সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভের প্রজ্ঞাময় সহজ পন্থা, যা বিশ্বমানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তন করেছেন। এ সপ্তকর্ম পদ্ধতি কাদেরিয়া মালামিয়া মাইজভাণ্ডারী তরিকত পন্থার উছুল হিসেবে গণ্য। এ সুবিন্যস্ত পদ্ধতি আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহ্র পথে আহ্বানের গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে সুফিসমাজে বেশ আদৃত হয়েছে। এমন সুপরিকল্পিত কর্ম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কেননা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আপনার পালনকর্তার পথের দিকে প্রজ্ঞাময় কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন।" (সূরা নাহল-১২৫) সপ্তকর্ম পদ্ধতি ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ এবং মউতে আরবা' বা মৃত্যু চতুষ্টয় নামে দুভাগে বিভক্ত। বিস্তারিতভাবে অছিয়ে গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে 'উছুলে ছাবয়া' এর সহজপাঠ নিম্নরূপ:

১. ফানা আনিল খাল্ক: কারও নিকট কোনো ধরনের উপকার আশা ও কামনা না করার মাধ্যমে ফানা আনিল খাল্ক অর্জিত হয়। আর এর ফলে পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় এবং নিজ সামর্থ্য ও সক্ষমতার প্রতি আস্থা জন্ম লাভ করে।

২. ফানা আনিল হা'ওয়া: যা না হলেও চলে, সেইরূপ বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার পন্থাই ফানা আনিল হা'ওয়া। এর ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়।

৩. ফানা আনিল এরাদা: খোদায়ী ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করার নাম ফানা আনিল এরাদা। এর ফলে তসলিম (মানসিক প্রশান্তি) ও রজা (আল্লাহ্র সন্তুষ্টি) অর্জিত হয় এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে মূর্খতা দূরীভুত হয়।

৪. মউতে আবয়্যাজ: উপবাস ও সংযমের মাধ্যমে মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু অর্জিত হয়। যার ফলে মানব মনে উজ্জ্বলতা দেখা দেয়।

৫. মউতে আছওয়াদ: শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দার মাধ্যমে মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যুর স্তর অর্জিত হয়। কারণ এর ফলে ব্যক্তি নিজ দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়ে দোষত্রুটি পরিত্যাগপূর্বক আল্লাহ্‌র পথে চালিত হবার সক্ষমতা অর্জন করে। আর দোষত্রুটি নিজের মধ্যে খুঁজে না পেলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায়ের মাধ্যমে আপন মনে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়।

৬. মউতে আহ্‌মর: কামভাব ও লোভ-লালসা হতে মুক্তির মাধ্যমে মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যুর স্তর অর্জিত হয় এবং ফল স্বরূপ ব্যক্তি বেলায়ত প্রাপ্ত হয়।

৭. মউতে আখজার: বিলাসিতা পরিত্যাগ করে নির্মোহ জীবনযাপনে অভ্যস্ততার মাধ্যমে মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যুর স্তর অর্জিত হয়। এর ফলে মানব মনে স্রষ্টার প্রেম ছাড়া অন্য কোনো কামনা-বাসনা থাকে না।

উল্লিখিত সপ্তকর্ম পদ্ধতি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মানবতা অর্জনে সহায়তা করে এবং দেশ-কাল পেরিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আত্মশুদ্ধির এক অনুকরণীয় পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য। উক্ত উছুলে ছাবয়ার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে উপলব্ধি করা যায় যে, সবকটি পদ্ধতির কোনো না কোনোভাবে মানুষের মন ও মননের সাথে এবং আত্মা ও আত্মপরিচয়ের সাথে রয়েছে সুগভীর সংযোগ। মওলানা রূমী বলেন, "যা তোমায় পরিশুদ্ধ করে, তাই সঠিক পথ।"

সপ্তকর্ম পদ্ধতির মধ্যে ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, এর মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজ সামর্থ্যের প্রতি আস্থা অর্জিত হয়। বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থেকে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত করা যায়। অবশেষে খোদায়ী ইচ্ছার মাঝে নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করে মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা সহজ হয়। আর এসবই মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলি, যার মাধ্যমে ব্যক্তি চরিত্রের উৎকর্ষ ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন সাধিত হয়ে আদর্শবান সুনাগরিক হওয়ার পথে অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "যে কেউ অনর্থ পরিহার করে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সূরা আন-নাযিআ'ত- ৪০-৪১)

অপরদিকে সপ্তকর্ম পদ্ধতির মধ্যে মউতে আরবা' বা মৃত্যু চতুষ্টয়ের ফলাফলের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, এ স্তরে উপবাস ও সংযমের মাধ্যমে মানব মনে উজ্জ্বলতা আসে। মওলানা রূমী বলেছেন, "যদি আলো থাকে তোমার হৃদয়ে, তাহলে ঘরে ফেরার পথ তুমি অবশ্যই খুঁজে পাবে।" এ পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের এক পর্যায়ে শত্রুর শত্রুতার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজ দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সক্ষমতা অর্জন করে এবং কামভাব ও লালসা হতে মুক্ত হয়ে বেলায়ত প্রাপ্ত হয়। সর্বোপরি বিলাসিতা ছেড়ে নির্মোহ জীবনযাপনে অভ্যস্ততার মাধ্যমে মানব-মন স্রষ্টার প্রেমে একাকার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে তার নফ্‌সকে পবিত্র করেছে এবং ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে তার নফ্‌সকে অপবিত্র

করেছে।' (সূরা আল-শামস- ৯-১০)। 'মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে।' (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা-৩৪)

মানুষের জ্ঞান ও চিত্তের উৎকর্ষের জন্য, মানব সভ্যতা ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য, চরিত্র গঠন ও মানবীয় মূল্যবোধের জন্য, সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আদর্শবান সুনাগরিক তৈরির জন্য তাসাউফ শিক্ষা হচ্ছে অন্যতম প্রধান নিয়ামক। তাসাউফ এমন সব সুন্দর চরিত্রের সমাহার, যেগুলো ভালো মানুষদের মাঝেই প্রকাশ পায়। তাসাউফের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অবস্থা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকগুলো গঠনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করা যায় এবং যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ্‌র মারিফত তথা নৈকট্য অর্জন হয়। তাসাউফ চর্চার গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে উছুলে ছাবয়া এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে সুন্দর গুণাবলি সৃষ্টি ও সমাজ থেকে অসদাচরণগুলো দূর করার ক্ষেত্রে তাসাউফ যেরূপ কার্যকর, অন্য কিছু এরূপ ভূমিকা রাখে না। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যখন নিষ্কলুষ হবে, তখন পুরো সমাজ অপরিহার্যভাবে সুন্দর হবে। মানুষ তার বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। তাছাউফের মূল উদ্দেশ্যই হলো-আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ মেনে চলা, নৈতিক চরিত্র অর্জনের মাধ্যমে জীবন গঠন করা এবং মানুষের অন্তরাত্মাকে সজাগ ও সজীব করে তোলা। মওলানা রুমি বলেছেন, "তুমি কি তোমার আত্মার খোঁজ করছো? তবে তোমার মনের খাঁচা থেকে অবমুক্ত হও।"

অদৃশ্য স্পন্দনের দৃশ্যমান বিকাশই জীবন; এর উৎসের কাছাকাছি যেতে হলে অনুভূতির গভীরে গিয়ে আত্মাকে স্পর্শ করতে হবে। আত্মার কোনো সুনির্দিষ্ট মাত্রা নেই। আত্মা হচ্ছে বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত শক্তি। ব্যক্তির মনোগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আত্মা বিকশিত হয়। তাই বলা হয় "দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও, জীবন বদলে যাবে।" দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে না পারলে আত্মা আবদ্ধ থাকবে পুরোনো শৃঙ্খলেই। আর দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য যে অনুশীলন প্রয়োজন, তা উছুলে ছাবয়ার মাধ্যমে আয়ত্ত করা সহজ। যদিও এটি সুফিবাদ চর্চার পদ্ধতি হলেও ব্যাপকার্থে চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, চিন্তা-যুক্তি-কল্পনা শক্তির যথার্থ স্ফুরণ উছুলে ছাবয়ার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া মানুষের অন্তরের সুখ-শান্তি ও আনন্দ বিধানের ক্ষেত্রে আচার-আচরণের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করে না। যেসব জাতি ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারাও এটিকে সম্মান করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, জীবনের এ কঠিন পথে অগ্রগতি সাধন করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই কিছু নৈতিকতার বিধি মেনে চলা দরকার। সর্বজনবিদিত যে, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিকতাসম্পন্ন সচ্চরিত্রবান সুনাগরিক তৈরির কার্যকর পন্থা হিসেবে অনুসরণযোগ্য।

আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, তাসাউফ অর্জনের জন্য যথাযথ মাধ্যম গ্রহণ করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর প্রদর্শিত উছুলে ছাবয়া সর্বসাধারণের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি হতে পারে। আরব জাহেলী সমাজ যখন নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও চরিত্রহীনতার অতলে হারিয়ে যাচ্ছিল, এমনিতর সময়ে রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) আখলাকে হাসানার মূর্ত প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনি বর্তমান সময়েও উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে ভাল করে রপ্ত করতে না পারলে আমাদের মুক্তি ও শান্তির আশা একেবারেই ক্ষীণ। উন্নত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে আমাদেরকে আবারও সমবেত হতে হবে আখলাকে হাসানার নিবিড় ছায়াতলে। আর এ পথ-পরিক্রমায় উছুলে ছাবয়া গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হতে পারে বলে বিশ্বাস করি।

আল-কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা তাসাউফের সত্যতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য তাসাউফকে এড়িয়ে না গিয়ে ইলমে মারফত তথা কুসংস্কার ও বিদআ'তমুক্ত তাসাউফের আলোয় জীবনকে উদ্ভাসিত করার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়া। সর্বোপরি তাসাউফের সমাদৃত পন্থা হিসেবে উছুলে ছাবয়াকে আমাদের জীবন প্রণালীতে একীভূত করে নিতে পারলে সর্বক্ষেত্রে সফলতা আসবে নিশ্চয়ই। মওলানা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন, "শেষ জামানার বিপদ মুক্তির জন্য ঐ ব্যক্তির আঁচল ধরো বা অনুসারী হও, যে ব্যক্তির পার্থিব ভাব শিথিল এবং খোদায়ী ভাব সজাগ ও সচেতন।" সবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর উছুলে ছাবয়া খ্যাত আত্মশুদ্ধি প্রণালী চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও আদর্শবান সুনাগরিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক ও যুগোপযোগী। তাই আমাদের উচিত উক্ত সপ্তকর্ম পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রাচ্যের ভাবধারায় "উছুলে ছাবয়া"

কাজী মুহাম্মদ সাইফুল আচফিয়া

আত্মশুদ্ধি বা তাজকিয়াহ সুফি ভাবধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। ইসলামি পরিভাষায় 'তাজকিয়াহ-আন-নফ্স' হলো সুফি মতবাদের অনুসারীর প্রাথমিক ধাপ। এই আত্মশুদ্ধির মূল বিষয় হলো আত্মা বা অন্তরকে পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন করা। অন্তর হলো মানবের জন্য তার প্রভুর পরিচয় লাভের স্থান। যেহেতু অন্তরের মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর (আল্লাহ্র) নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে সেহেতু এই আত্মা বা অন্তরের পবিত্রতা সুফি ভাবধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানব আত্মার যে রূপান্তর ঘটে তা বান্দাকে আল্লাহ্র পথে নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সংযোগের সুযোগ করে দেয়। এই আত্মশুদ্ধি বা তাজকিয়াহ ইসলামি শরিয়া ও সুন্নাহ'র সাথে শতভাগ বিশ্বস্ত থেকেই পরিচালিত হয়। "The actual path of Sufism entails a process of inner transformation whereby the powers of the soul are turned toward God. Sufism adds to the strictly Shariite practices many devotional and spiritual exercises." (Chittick 20) সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় ইসলামের শরিয়া ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই সুফিরা তার প্রভুর নৈকট্য বা দিদার লাভের জন্য তৈরি হয়ে উঠেন।

আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন ধারা ও রীতিনীতি প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান। প্রাচ্যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ধর্মে আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন ধারা প্রচলিত ছিল। সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মে মানবের এই আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দু ধর্মে মানবদেহ ও আত্মার পবিত্রতার উপায় হিসাবে সাত চক্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই সাত চক্রের মধ্যে ষষ্ঠ চক্র, যাকে সনাতন ধর্মে দুনয়নের মধ্যবর্তী ত্রিনয়ন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, এই তৃতীয় নয়নের মাধ্যমে মানব তার স্রষ্টার সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

According to ancient Indian philosophy, the human body is divided into seven vortices of energy, called chakras, beginning at the base of the spine and ending at the top of the head. The sixth chakra, also known as the third eye, is centered in the forehead directly between the eyebrows and is believed to be the channel through which humankind opens spiritually to the Divine. (Huyler 40)

এই সপ্ত চক্রের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির ও পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বেশ জটিল এবং কষ্টসাধ্য। তাই অতি সাধারণ মানুষ এই সপ্ত চক্রের সাধনা ও আয়ত্বকরণে তেমন মনোনিবেশ করতে অপারগ।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও এই আত্মশুদ্ধির বিধান বা আত্মশুদ্ধির ধারা বিদ্যমান রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের জন্য অষ্ট বিধান এবং মৈত্রী (Loving-kindness), করুণা (Compassion), মুদিত (Sympathetic joy) ও উপেক্ষা (equanimity) সম্বলিত চার ধারার আত্মশুদ্ধির বিধান বা পদ্ধতি রয়েছে। এই আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তারা সর্বোত্তম মানব জন্মের পর নির্বাণ লাভ করতে পারে। "The divine abidings (brahmaviharas) are amongst the most popular of samatha practises. They are the meditations on loving-kindness (metta), compassion (karuna), sympathetic joy (mudita) and equanimity (upekkha)." (Shaw 163) বেশ জটিল ও আয়াসসাধ্য এই অষ্ট বিধান ও চার ধারার আত্মশুদ্ধির মাধ্যম অত্যন্ত কঠিন ও পালন করা বেশ দুরূহ।

প্রাচীন পার্সি ধর্মে আত্মশুদ্ধির এই বিষয় সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান আছে। আত্মাকে ত্রিধারায় বিভক্ত করে তা পরিশুদ্ধির একটা বিশেষ পদ্ধতি তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তায় রয়েছে। তাদের বিশ্বাস, ত্রিধারায় বিভক্ত আত্মাকে পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তারা তাদের স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।

In the old Avesta, two principal constituents of the body are "bones" and "life breath" or "vitality" (ushtana). Man also has three "souls": the frawashi or "pre-soul," which is made in the world of thought and preexists the person, the urwan or "(breath-)soul," which leaves the body at death and wanders into the beyond to be judged; the daena or "vision-soul," the mental constituent of man that allows him to "see" into the world of thought. (Skjaervo 21)

এ ধর্মের বিশ্বাসমতে মানব শরীর গঠনের উপাদান হিসেবে যে অস্থি ও আত্মার সমন্বয় ঘটে, তার উভয়েরই পরিশুদ্ধতা ছাড়া মানবমুক্তি অসম্ভব।

ইসলাম ধর্মও আত্মশুদ্ধির ওপর বেশ জোর আরোপ করেছে। ইসলাম যেহেতু শান্তি ও মানবতার ধর্ম, সেহেতু ইসলাম তার অনুসারিদের আত্মা ও মননের সর্বোচ্চ পরিশুদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বার বার 'তাজকিয়াহ' শব্দটি ব্যবহার করে বান্দাদের আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন।

The word Tazkiah has been used in many places of the Qur'an. It has been used 18 times in 15 verses of 11 Surahs; in Ayat 129, 151, 174 of Surah Al-Baqarah, in 77 and 164 verse of sura Al-Imran, the verse of Nisa 49, Surah Taubah's verse 103, Sura taha's 76 ayat, in 2nd verse of Sura Al-Jumm'ah, 3 and 7 ayat of Sura Abasa, in verse 21 of Surah

al-A'la, verse 9 of Surah Shams and in the verse 18 of Surah al-Layl. (Wikipedia)

ইসলামে যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষী কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতির ও ধারার প্রবর্তন ও প্রচলন করেছিলেন। বিভিন্ন সুফি তরিকার অনুসারিগণ তাদের স্বীয় তরিকার আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। সুফি তরিকার বাইরে সালাফি পন্থিরাও আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। খালিদ ইবনে আব্দুলাহ আল মুসলেহ তার বিখ্যাত ইসলাহে কুলুব গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৬-৯০) আত্মশুদ্ধির আটটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তার প্রদত্ত এই আট পদ্ধতিও বেশ বিশদ।

উপরোক্ত ধর্মমতগুলো ছাড়াও এই উপমহাদেশে বেশ কিছু ধারার বাউল, ফকির ও তান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান আছে। তাঁরাও তাঁদের মতো করে তাঁদের আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এই তরিকাকে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও আত্মশুদ্ধির সহজতম পন্থা হিসেবে সাধারণের পালনের জন্য উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ত্রিবিধ ফানা এবং চার প্রকার মৃত্যুর রূপক সম্বলিত এই উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির বিষয়টি হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বেলায়তে মোত্লাকাতে ৮ম পরিচ্ছেদে বিবৃত করেন।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি ঃ

ফানা এ ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর ঃ (ক) 'ফানা আনিল খাল্ক' অর্থাৎ কারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। যার ফলে মানবমন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি আস্থা জন্মে। (খ) 'ফানা আনিল হা'ওয়া' অর্থাৎ যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়। (গ) 'ফানা আনিল এরাদা' অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যার ফলে সুফি মতে 'তসলিম ও রজা' হাসিল হয়।

মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু ঃ

(ক) "মউতে আবয়্যাজ" অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ত হয়।

(খ) "মউতে আছওয়াদ" বা কালো মৃত্যু। শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাসিল হয়। কারণ অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লিখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজে পায় তখন নিজেকে উক্ত দোষ হতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায়।

(গ) "মউতে আহ্‌মর" বা লাল মৃত্যু। কামভাব ও লালসা হতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়ে অলিয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়।

(ঘ) "মউতে আখজার" বা সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেই তা হাছিল হয়। যার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকে না। এটা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

উপরোক্ত সমস্ত ধর্মমত ও ভাবধারাগুলোর আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিগুলো বিবেচনা করে বলা যায় হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক বর্ণিত উছুলে ছাবয়া হচ্ছে অত্যন্ত সহজ এবং মানুষের জন্য সহজেই পালনীয় একটা আত্মশুদ্ধি পদ্ধতি। এই উছুলে ছাবয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারেন। আর একটি পরিশুদ্ধ আত্মার মাধ্যমেই কেবল একজন বান্দা পারে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. আল-মুসলেহ, খালিদ ইবনে আব্দুলাহ। ইসলাহে কুলুব। অনুবাদ, আত্মশুদ্ধি, আব্দুন নুর ইবন আব্দুল জব্বার। https://d1.islamhouse.com/data/bn/ih books/single2/bn attoshuddhi.pdf on December 19, 2019

২. সৈয়দ দেলাওর হোসাইন, বেলায়তে মোত্‌লাকা, মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম–২০১৪

৩. Chittick, William C. Sufism: A Beginner's Guide. One World Book, Oxford. 2008

Huyler, Stephen P. "The Experience: Approaching God" The Life of Hinduism edited by John Stratton. Hawley and Vasudha Narayanan, University of California Press, California. 2006 Page 33-41.

৪. Shaw, Sarah. Buddhist Meditation: An anthology of texts from the Pali canon. Routledge, London. 2006.

৫. Skjaervo, Prods Oktor. Introduction to Zoroastrianism. Cambridge University Press, Cambridge. 2005.

৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Tazkiah on December 19, 2019

সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজী বিভাগ
চিটাগাং ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি।

উছুলে ছাবয়া'র আলোকে আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নয়ন ও তরিকত সাধনা

মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী

আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে মহান আল্লাহ্ তায়ালা ধরাধামে অসংখ্য সম্মানিত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা বিভ্রান্ত দিশেহারা পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। ইমামুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) কে প্রেরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নবি-রাসুল প্রেরণের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটালেন। মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর প্রিয় হাবিব (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) "খাতামুন নবিয়ীন" তথা সর্বশেষ নবি হিসেবে ঘোষিত হলো। নবিজি এরশাদ করেছেন আমি সর্বশেষ নবী, আমার পর আর কোনো নবির আগমন ঘটবে না। তবলিগে দ্বীন তথা দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রিয় নবির নৈকট্যধন্য সৌভাগ্যবান হেদায়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম। পর্যায়ক্রম ধারাবাহিকতায় এ দায়িত্ব অর্পিত হয় আল্লাহ্‌র পূণ্যাত্মা আউলিয়ায়ে কেরাম ও হক্কানী ওলামায়ে দ্বীনের উপর। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত প্রিয়নবীর প্রদর্শিত, সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথে ইসলামের মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতে বিভিন্ন কৌশল ও হিকমতপূর্ণ পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতঃ তাঁরা বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করেছেন, দ্বীনি আখলাক শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামি আক্বিদা-বিশ্বাস প্রচার করেছেন। ইসলামের সঠিক মর্ম ও কর্ম মানব সমাজে তুলে ধরেছেন। ইসলামের সুন্দর নির্মল, স্বচ্ছ, পবিত্র অবয়ব যুগের চাহিদা ও সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ব সমাজে তুলে ধরার যে প্রক্রিয়া হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অবলম্বন করেছেন, তা "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি নামে পরিচিত। মূলত বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য নৈতিকতা সম্পন্ন তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠনের জন্য হযরত ক্বেবলার প্রবর্তিত ও উপস্থাপিত এ সপ্তকর্ম পদ্ধতি কুরআন, সুন্নাহ, এজমা, কিয়াস তথা ইসলামের দলীল চতুষ্টয়ের আলোকে উৎসারিত। যে সপ্তকর্ম পদ্ধতির আলোকে একজন মানুষের জীবন সজ্জিত হলে জীবন হবে পবিত্র বিশুদ্ধ ও অন্তরাত্মা হবে আলোকিত। চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, চলন-বলন, কথন, জীবন যাত্রায় প্রতিটি কার্যক্রম হবে সুফিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে এজামের আদর্শ ও শিক্ষায় উজ্জীবিত। বিশ্ব মানব জাতির আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর প্রবর্তিত সপ্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা তরিকত পন্থীদের নিকট সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়ে আসছে।

আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নয়ন ও তরিকত সাধনা এবং হাকিকত ও মারেফাত লাভে 'সপ্ত পদ্ধতি' অনুশীলন ও চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মানবজাতির ব্যবহারিক জীবন, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনস্বীকার্য। উছুলে ছাবয়া'র সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপনার প্রয়াস পাচ্ছি। শরিয়ত তরিকত তথা জাগতিক জীবন ও দ্বীনের প্রতিটি কাজে পরিকল্পিত কৌশল ও হিকমত অবলম্বন আল্লাহ্‌রই নির্দেশ। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ .

অর্থ: (আপনি) আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন, পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ওই পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন সৎপথ প্রাপ্তদেরকে। (সূরা নাহ্‌ল: আয়াত: ১২৫; তরজমা: কানযুল ঈমান)

সরলপ্রাণ মানুষদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কৌশল হিসেবে গাউছুল আজমের প্রবর্তিত পদ্ধতি ছিল আল কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণের নামান্তর।

ত্রিবিধ রিপুর বিনাশ বা ফানায়ে ছালাছা ঃ

ক. **"ফানা আনিল খাল্ক"** অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি নির্ভরশীল না হওয়া। ভরসা করবেন আল্লাহ্‌র উপর, দাসত্ব করবেন আল্লাহ্‌র, আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টির কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা বান্দাকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে আত্মনির্ভরশীলতার বিকল্প নেই।

খ. **"ফানা আনিল হা'ওয়া"** বা অনর্থ পরিহার করা। হাদিস শরীফে এরশাদ হয়েছে–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ .

ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অনর্থক কথা-কাজ পরিহার করা। কুচিন্তা, হিংসা-বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা, সন্দেহ-সংশয়, কুধারণা, বৈষয়িক লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা পরিহার করা।

গ. **"ফানা আনিল এরাদা"** ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া ঃ হযরত যুন্‌নুন্ মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

الصوفى هم قوم اثروا الله عزّوجلّ على كل شيئٍ .

অর্থাৎ সুফি এমন এক শ্রেণির বিশেষ বান্দা, যারা জীবনের প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও ভালবাসাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেন। (সূত্র: আবুল উলা আফিফী ফী তাসাউফিল ইসলাম কায়রো, ১৯৬৯, পৃ.২৯)

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত ২৯৭) বলেন:

الصوفى ان يتفصّص الله بالصخاء لمن اصطفى من كُلّ ما سوى الله فهو الصّوفى .

অর্থাৎ পবিত্রতার সাথে নিজকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া সকল কিছুর প্রভাব থেকে নিজকে মুক্ত রেখে, আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মনোনীত হয়েছেন, তিনি সুফি। (সূত্র: আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম ই.ফা.বা, পৃ. ৮৭)

মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু ঃ

ক. **"মউতে আবয়্যাজ" অর্থাৎ সাদা মৃত্যু** ঃ ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অন্তরাত্মাকে রক্ষার

জন্য সংযম সাধনা করা, রমজানের রোজা, নফল রোজার মাধ্যমে এ গুণাবলী অর্জিত হলে অন্তরে উজ্জ্বলতা আসে, ঈমানি চেতনায় অন্তর উজ্জীবিত হয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে এ আমল ফলপ্রসূ ও তাকওয়া অর্জনে এক নিয়ামক শক্তি।

খ. **"মউতে আছওয়াদ" বা কালো মৃত্যুঃ** সমালোচনাকারীর সমালোচনায় প্রতিবাদী না হয়ে নিজের মধ্যে সমালোচনার কারণ বিদ্যমান থাকলে তা সংশোধনে সচেষ্ট হওয়া, আল্লাহ্‌র নিকট নিজের অন্যায় অপরাধ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, আল্লাহ্‌র দরবারে অনুশোচনা করা, সমালোচনাকারীর সমালোচনায় ধৈর্যধারণ করে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার নামই কালো মৃত্যু।

গ. **"মউতে আহ্‌মর" বা লাল মৃত্যু ঃ** কামভাব বা লোভ-লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলে এ গুণ অর্জিত হয়। এ গুণের অধিকারী ইনসান মুমিনে কামিল তথা অলিয়ে কামিলে পরিণত হন।

সুফি সাধক আউলিয়া কেরাম, জান্নাতের লোভে ইবাদত করেন না, তাঁরা আল্লাহ্‌র ও তদীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকল কাজ করে থাকেন।

ইবরাহীম ইবনে ঈসা বলেন, আমি আখিরাতের চিন্তায় হাসান বসরীর চেয়ে অধিক চিন্তিত ও ক্রন্দনকারী আর কাউকে দেখিনি। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলতেন, اِبن آدم بِعْ دنياك باخرتك تربحهما جميعًا . ولاتبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا .

অর্থাৎ হে মানব সন্তান! তুমি আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া বিক্রি করে দাও। এতে তোমরা দুটিই লাভ করতে পারবে। সাবধান দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করো না, এতে দুটিই হারাবে। (সূত্রঃ ইসলামিক স্টাডিজ, ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ২৮৪)

হযরত রাবেয়া বসরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহা) [ওফাত ১৫৮হি.] ছিলেন এক মহিয়সী রমণী। বর্ণিত আছে যে, এক সময় তিনি এক হাতে পানি এবং আরেক হাতে আগুন নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, কেন দৌড়াচ্ছেন? তিনি বললেন মানুষ দোযখের ভয়ে ইবাদত করে। আমি পানি দিয়ে দোযখকে নিভিয়ে দেবো। আর কিছু লোক জান্নাতের লোভে ইবাদত করে। এ জন্য আগুন দিয়ে জান্নাতকে জ্বালিয়ে দেবো। বান্দা তার সব আমল যেন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্যই করে, এটাই একমাত্র সুফি তত্ত্বের মূলকথা।

ঘ. **"মউতে আখজার' বা সবুজ মৃত্যু ঃ** নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে সবুজ মৃত্যু অর্জিত হয়। খোদা ও রাসুলের প্রেমে অবগাহন করে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কামনা-বাসনা মুক্ত পবিত্র জীবন যাপন করে কোটি কোটি

আল্লাহ্‌র বান্দার অন্তরে আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রেমের অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন। অতি লোভ-লালসা ও ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা মানুষকে কলঙ্কিত করে এবং তাকওয়া অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন, মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ জাগ্রত রাখে।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে উছুলে ছাবয়া এক নিয়ামক শক্তি, তাকওয়া মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো, ভয় করা, সতর্কতা অবলম্বন করা, বিরত থাকা, সাবধান হওয়া, রক্ষা করা ইত্যাদি। তাকওয়া প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে এরশাদ হয়েছে–

سال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ابيا عن التقوى فقال هل اخذت طريقا ذاشوك! قال نعم! قال فما عملت فيه : قال تشمّرت وحذرت قال فذاك التقوى .

"হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) একদা হযরত উবাই ইবনে কাব (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলেন, তাকওয়া কি? হযরত উবাই বিন কাব জবাব দিলেন, আপনি কি কখনো কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে চলেছেন! হযরত ওমর (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন হ্যাঁ।

হযরত উবাই (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, কিভাবে চলেছেন? হযরত ওমর (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, কাপড়-চোপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে চলেছি। হযরত উবাই (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, ওটাই তো তাকওয়া।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে ভয় করা উচিত।" (আল কুরআন, ৩:১০২)

কামিল অলির শরণাপন্ন হওয়া ব্যতিরেকে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় কামিল বান্দাদের সান্নিধ্য অর্জন ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ করেছেন। এরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করো। (আল-কুরআন: ৯:১১৯)

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের জীবনাদর্শ বিশ্ব মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এ শ্রেণির প্রিয় বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণের কথা পবিত্র কুরআনে বহুস্থানে বিঘোষিত হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে– وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ .

অর্থ: "যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয়েছে তার পথকে অনুসরণ করো।" (আল-কুরআন: ৩১:১৫)

তরিকতের কামিল মুর্শিদের অনুসৃত পথই মুক্তির পথ: তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে–

الوصول لا يحصل الا بالوسيلة وهى علماء الحقيقة ومشائخ الطريقة.

অর্থাৎ: ওসিলা ব্যতীত আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যায় না। ওসিলা হচ্ছেন হক্কানি ওলামায়ে কেরাম ও তরিক্বতপন্থী মাশায়েখ বা কামিল পীর মুর্শিদগণ।

সত্যিকার তরিকতপন্থী শরিয়তের অনুসারী মুত্তাকী পরহেজগার বান্দারা হচ্ছেন হিদায়াত প্রাপ্ত। তরিকতের আদর্শচ্যুত শরিয়তের অনুকরণ থেকে বিচ্যুত বান্দারা বিভ্রান্ত গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا .

অর্থ: আল্লাহ্ পাক যাকে হিদায়াত করেন, সে হেদায়াত পায় এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো অলী (কামিল) মুর্শিদ পাবে না।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আক্বিদার হিফাজতের জন্য উছুলে ছাবয়া তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতির আলোকে পথহারা মানব-গোষ্ঠীকে ঈমান ইসলামের সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন, মানব জাতিকে খোদাভীতি অর্জনের গুরুত্বারোপ করেছেন। কুফর, শিরক, বিদআত, ইসলাম বিরোধী, শরিয়ত বিরোধী ও তরিকতের আদর্শ ও চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন। মানবতার কল্যাণ ও সেবায় নিজকে উৎসর্গ করেছেন। সততা, নিষ্ঠা, মানবতা, উদারতা, মহানুভবতা, ইত্যাদি আদর্শিক গুণাবলি দিয়ে ইসলামের সুমহান পয়গাম ও শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। ন্যায়-নীতি, সাম্য, শান্তি, সম্প্রীতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবালির সঠিক চর্চা, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বজনীন, সার্বজনীন কালজয়ী ধর্ম ইসলামের বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আসুন! আমরা বেলায়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া'র চর্চায় আত্মনিয়োগ করি, আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে তাওফিক দান করুন। আমিন!

অধ্যক্ষ
মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা
চট্টগ্রাম।
খতিব, কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদ
চট্টগ্রাম।

ফানা আনিল খাল্ক

মুহাম্মদ জুলফিকার আলী

আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হলো তরিকতের লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এ লক্ষে পৌঁছার জন্যে মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার প্রবক্তা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) যে উছুলে ছাবয়া তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি মুসলিম মিল্লাতকে উপহার দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্যাস। এগুলোর মধ্যে প্রথম পদ্ধতির নাম হল 'ফানা আনিল খাল্ক'। এর শাব্দিক অর্থ হল- মাখ্লুক তথা সৃষ্টি থেকে বিলোপ বা বিনাশ। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– 'কাহারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।' (বেলায়তে মোত্লাকা, পৃ: ৭০)

পরচর্চা পরিহার করা ঃ একজন মানুষ 'ইনসানে কামিল তথা পরিপূর্ণ মানুষ হতে চাইলে তাকে প্রথমেই আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। আর তা অর্জনের প্রথম উপায় হল শুধুমাত্র দুনিয়ার সকলের সাথে বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির জন্য সম্পর্ক না করা। এর প্রাথমিক ধাপ হলো অপরের কোনো প্রকারের ক্ষতি হয় এমন কাজ পরিহার করা। এক্ষেত্রে অপরের 'দোষ চর্চা' করা হলো অন্যতম। কেননা এর মাধ্যমে অপরের সম্মানে আঘাত লাগে, যার ফলে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.

"এবং দোষ তালাশ করো না আর একে অপরের গীবত করো না। কেউ কি একথা পছন্দ করবে যে, সে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে?" (হুজুরাত, আয়াত: ২২)

হাদিস শরিফে আছে, গীবত হচ্ছে মুসলমান ভাইয়ের এমন কথা বলা, যা তাঁর নিকট অপছন্দনীয়। যদি ঐ কথা সত্যও হয়, তা হবে 'গীবত' নতুবা 'বোহ্তান' তথা অপবাদ। অপর হাদিসে এসেছে প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য হারাম– তার রক্ত, তার মান-সম্মান, আর ধন-সম্পদও। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের শরীর, আকৃতি ও কর্মের প্রতি দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দেখেন। (কানযুল ঈমান, পৃ: ৯২৪)

যে বান্দা খোদাকে পাওয়ার জন্য তথা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর দিকে পথচারী হবেন সে কখনো তাঁর বান্দার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখতে পারে না। যে তা করবে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ; তার কৃত পুণ্য কাজগুলো হিংসার অনলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। হুজুরে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এরশাদ করেন–

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ .

"তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা ভাল কাজগুলোকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে, যেমনি ভাবে আগুন শুকনো কাঠকে খেয়ে ফেলে।" (মেশকাত-৪২৮)

এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের সহজ উপায় হলো নিজ চক্ষু ও জিহ্বাকে সংযত করা। এ প্রসঙ্গে হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ- فَقَالَ أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ .

হযরত ওকবা ইবনে আমির (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ মুক্তি কোথায়? (মুক্তির উপায় কি?) তিনি এরশাদ করলেন- তোমার জিহ্বা সংযত রাখ, তোমার গৃহে অবস্থান করো এবং নিজ পাপের উপর ক্রন্দন করো। (আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত, পৃ: ৪১৩)

অপ্রয়োজনীয় জিনিস বর্জন করা ঃ একজন আদর্শ মানুষের উত্তম গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হল অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তাই প্রত্যেক কাজের জন্য খোদার নিকট জওয়াবদিহি তাকে করতে হবে; অপ্রয়োজনীয় কথা বললে তার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং নিরবতা পালন করলে এগুলো থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর হাদিস শরিফে এসেছে– من سكت نجا যে নিরব রইল সে মুক্তি পেল। ইসলামি বুনিয়াদী হাদিস সমূহের মধ্যে অন্যতম হল–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ .

অর্থাৎ ইসলামের সুন্দর চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অনর্থক ও বেহুদা কথা বর্জন করা। (মেশকাত, পৃ: ৪১৩) এর মাধ্যমে সময় নষ্ট হয় এবং অনেক অনৈতিক ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সাধারণত অনর্থক কথা ও কাজ, যার মধ্যে নিজের বা পরের কোনো কল্যাণ নেই, এর মাধ্যমেই মানুষ ক্রমান্বয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং এ উত্তম চরিত্রটির মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

আত্মোপলব্ধি অর্জন ঃ আত্মোপলব্ধি হল খোদা প্রাপ্তির মূল উপায়। মানুষ যখন পরনিন্দা ও পরচর্চা ত্যাগ করবে এবং অনর্থক কাজ ও কথা বর্জনের মাধ্যমে বাহুল্য ত্যাগ করবে তখন সে নিজেকে নিয়ে একান্তে আত্মসমালোচনার সুযোগ পাবে। এর ফলে নিজের দোষত্রুটি চিহ্নিত করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ .

বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনিই যিনি নিজেই নিজের হিসাব নিবে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করবে। অক্ষম ব্যক্তি সে, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট (কিছু পাওয়ার) আশা করবে। (মিশকাত, পৃ: ৪৫১)

পরনির্ভরতা ত্যাগ ঃ আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট- নিজ আত্মাকে এরূপ মানসিক পর্যায়ে উপনীত করতে পারা হলো আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিরাট উপায়। এ ধরনের পন্থা যে অবলম্বন করবে, তার মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতা কখনো থাকবে না। উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম পথ অনুসরণ করা অথবা অপরের নিকট কিছুর পাওয়ার আশার মানসিকতা সৃষ্টি হয় মূলত 'তাওয়াক্কুল' এর অভাবে। তাওয়াক্কুল হল আল্লাহ্‌র উপর এ মর্মে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা যে, আমার রিযিক এবং সব কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর হাতেই। তাই রাসুলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন–

إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كَفَتْهُمْ - وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

অর্থাৎ আমি এমন একটি আয়াত জানি, যাকে মানুষ ধরে থাকলে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আয়াতটি হল– وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ .... الخ

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন এবং তাকে সেখান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার কল্পনা থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালার ভয় থাকলে মানুষ পরমুখাপেক্ষী হয় না। আল্লাহ তা'য়ালাই খোদাভীরু মানুষের রিযিকের পথ উন্মুক্ত করে দেন।

স্ব-উপার্জিত অর্থই সর্বোত্তম ঃ অপরের নিকট উপকারের কোনো আশা যার থাকবে না, নিশ্চয় তিনি উপার্জনের কোনো উপায় বের করবেন। আর যিনি এভাবে নিজেই উপার্জনের পথ করবেন, সেটাই হবে তাঁর জন্য উত্তম। হাদিস শরিফে রয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ .

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলে করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন নিশ্চয়ই তোমাদের উত্তম খাবার হলো স্ব-উপার্জিত উপার্জন। এক্ষেত্রে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর এই বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- 'নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইও না'।

ইমাম গায্যালী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর মিনহাযুল আবেদীন নামক কিতাবটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া'র অন্যতম 'ফানা আনিল খাল্ক' হলো 'তাফাররুদ আনিল খাল্ক'

(تفرد عن الخلق)

এর নব সংস্করণ; যার অর্থ হলো সবকিছুর মোহ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট হওয়া। কারণ এর মাধ্যমেই 'ইখলাস' বা নিষ্ঠা অর্জন সম্ভব। এক্ষেত্রে তিনি হযরত সুফিয়ান সাউরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর একটি বাণী উদ্ধৃত করেন। তা হলো-

هٰذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت الى اٰن تموت .

এটা হলো ফিত্নার যমানা, তাই এটা নীরবতার সময়, ঘরে অবস্থান করার সময় এবং আমরণ প্রয়োজনীয় খাবারের উপর সন্তুষ্ট থাকার সময়।

তাই 'ফানা আনিল খাল্ক' তত্ত্বটি খোদা পথচারী তথা সালেকের জন্য অতীব যুগোপযোগী একটি পদ্ধতি এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস সম্মত। আল্লাহ সবাইকে তা অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমিন।

উপাধ্যক্ষ
সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা
চট্টগ্রাম।

উছুলে ছাবয়া'র আলোকে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তি উন্নয়ন

ড. মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম

মাইজভাণ্ডার দরবার উপমহাদেশের প্রাচীনতম সুফিতাত্ত্বিক দরবারসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ দরবারের প্রাণ পুরুষ হলেন গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। এ দরবারে অনেক বুযুর্গ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছে। এদের মধ্যে খাদেমুল ফোক্‌রা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অন্যতম। তিনি একজন তাত্ত্বিক গবেষক ও দূরদর্শী মনোভাবের ব্যক্তি ছিলেন। আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়া-এ-নফ্‌সের জন্য গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি নামে একটি দর্শন খোদা অন্বেষীদের জন্য প্রবর্তন করেছেন, যা অছীয়ে গাউছুল আজম কর্তৃক রচিত বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত। এ পদ্ধতির মাধ্যমে আজ দিশেহারা লোক পরকালীন মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেন। সাথে সাথে তারা আদর্শবান সুনাগরিক হিসেবে মানব সমাজে স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

উছুলে ছাবয়া' কী?

'উছুলে ছাবয়া' হলো সাতটি মহা মূল্যবান চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনের পদ্ধতি যা পালনে একজন মানুষ 'প্রকৃত মানুষ' রূপে গড়ে ওঠার সুযোগ লাভে ধন্য হয়। এ সাত পদ্ধতি অনুসরণ করে চললে একজন মানুষ সবার নিকট আদর্শবান ও চরিত্রবান লোক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন এবং সাথে সাথে পরকালেও জান্নাতের সওগাত লাভে ধন্য হবেন। আর তা হলো–

১. পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করে, 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীবন পরিচালনা করা।

২. অনর্থ ও অযথা কথা-বার্তা এড়িয়ে চলা, পরনিন্দা পরিহার করা এবং নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

৩. নিজ বাসনা-কামনাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করা এবং ধৈর্যের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

৪. রোযা পালন, সংযম ও ধৈর্য ধারণ এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

৫. নিন্দাকারীকে শত্রু না ভেবে; বরং বন্ধু মনে করা। কারণ, নিন্দা থাকলে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬. লোভ-লালসা ত্যাগ করা।

৭. নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

এ সপ্তকর্মের বিশ্লেষণ ঃ

এ উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্মকে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রাসুলের আলোকে বিশ্লেষণ করলে যা পরিলক্ষিত হয়, তা হলো– তাক্ওয়া, তাযকিয়া-এ-নাফ্স আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা, ধৈর্য ধারণ ও সংযম এবং পরনিন্দা, হিংসা, লোভ বর্জন ইত্যাদি পালন, যেসব বিষয়ের প্রতি পবিত্র কুরআন ও হাদিস-এ রাসুলে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এসব বিষয়গুলো ধারণ এবং পরনিন্দা (গীবত), হিংসা ও লোভ ইত্যাদি মন্দ স্বভাবগুলোকে বর্জনের প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে।

'তাকওয়া' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ .

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই বেশি সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী তথা খোদাভীরু।" (আল-কুরআন, সূরা হুজরাত: ১৩)

'তাযকিয়া-এ-নাফ্স' তথা আত্মার পরিশুদ্ধি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى .

অর্থাৎ যে তার প্রভুর সম্মুখে দাঁড়ানোকে ভয় পায় এবং নফ্সকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে, নিশ্চয় তার ঠিকানা হলো জান্নাত। (আল-কুরআন, সূরা নাযি'আত: ৪০-৪১)

আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা (توكل على الله) প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

আর যে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, তিনিই তার (উদ্দেশ্য সাধনে) জন্য যথেষ্ট। (সূরা আলে-ইমরান:১২০) এ ছাড়া তিনি আরো বলেন–

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

অর্থাৎ মু'মিনদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিৎ।

আর একটি আয়াতে আছে যে, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ . আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। (সূরা নামল: ৭৯)

আর সংযম ও ধৈর্যধারণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ .

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা: ১৫৩) আর সংযম, ধৈর্য ও তাযকিয়া-এ-নফ্সের উত্তম এক কাজ হলো 'রোযা' পালন। রোযার মাধ্যমেই মানুষ সংযম ও ধৈর্যধারণের শিক্ষা ও ট্রেনিং নিয়ে থাকে এবং এতে নফ্স তথা রিপু দমন হয়। মানুষ 'তাকওয়া' অর্জন করে থাকেন। এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থাৎ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা 'তাকওয়া' অর্জন করতে পার। (সূরা বাক্বারা: ১৮৩)

পরনিন্দা বা গীবত (غِيْبَتْ) এক জঘন্য অপরাধ, যাকে হাদিস শরিফে "ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য অপরাধ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনে গীবতকে তুলনা করা হয়েছে "মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের" সাথে।

হিংসা-বিদ্বেষ হলো মারাত্মক পাপ কার্য। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার মূল কারণ হলো এ 'হিংসা'। যা ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে এসেছে-

إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

"নিশ্চয় 'হিংসা' পুণ্যকে এমনভাবে ভক্ষণ করে থাকে, যেভাবে আগুন লাকড়িকে ভক্ষণ করে।" (অলিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন-ই-খাতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ)

সপ্তকর্মের আর এক বাণী হলো- "অযথা ও অনর্থক কথা" পরিহার করা। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে এসেছে যে,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক ও অযথা কথা ও কাজ বর্জন করা। (অলিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন-ই খাতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ (আরবি), কিতাবুল আদব, এ হাদিস তিরমিযী, ইবন-ই-মাজাহ ও মুসনাদ-ই আহমদ এ বরাতে আনা হয়েছে)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হলো, "মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তি উন্নয়ন এবং আদর্শবান সুনাগরিক তৈরিতে 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি কার্যকরী একটি ফর্মুলা বা পদ্ধতি।" কারণ এ সপ্তকর্মের প্রত্যেকটি পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রাসুলের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রদত্ত এ উছুলে ছাবয়া শরিয়ত সম্মত কতগুলো দিক-নির্দেশনা, যা পালন করলে একজন মু'মিন পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে সফল হতে পারবে, ইনশা আল্লাহ্।

সহকারী অধ্যাপক
ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা
চট্টগ্রাম।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল-কাদেরী

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে। অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে মানুষ। একান্তভাবে মানুষের এ অধিকারকেই বলে মানবাধিকার। মানবাধিকার এর রচয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা হলেন মানবতার মহান মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিশ্বনবী প্রণীত "মদিনার সনদ"-ই হলো বিশ্বের সর্বপ্রথম ও সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ। এ সনদের মাধ্যমে ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রে বসবাসরত খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলিমসহ সকল ধর্মাবলম্বীর নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৪ ও ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ভয়াবহ দু'টি বিশ্বযুদ্ধের কথা কারো অজানা নয়। এ দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময় মানবিকতা ও মানবতাবোধ চরমভাবে ভুলণ্ঠিত ও বিঘ্নিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতির যাতে পুনরাবৃত্তি না হওয়া এবং বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের স্থপতিরা বিশ্বসংস্থার সনদ প্রণয়ণে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরবর্তীতে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৩০টি ধারা সম্বলিত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। আধুনিক বিশ্বে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে ঐতিহাসিক এ দলিল গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হওয়ায় এ দেশের সংবিধানে মানবাধিকার ধারাগুলো জনগণের মৌলিক অধিকার রূপে স্থান পায়।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ :

মানুষ যুগে যুগে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম আইনের মধ্যে ব্যাবিলনের রাজা হাম্বুরাবী প্রণীত "ব্যাবিলনীয় কোড" বা হাম্বুরাবী কোড উল্লেখযোগ্য। এতে মানবাধিকার সংরক্ষণের তাগিদ রয়েছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোম-এ সরকার পরিচালনা, নির্বাচন কার্যক্রম এবং বিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণে অধিকার প্রয়োগের প্রচলন ছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মানুষের প্রকৃত অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে 'মদিনা সনদ' এবং রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত বিদায় হজ্বের ভাষণে মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের উদ্যোগে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে সার্বজনীন বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা গঠিত হলেও মানবজাতি এর পুরোপুরি সুফল লাভ করতে পারেনি, যেহেতু ছোট রাষ্ট্রগুলোর অধিকার সংরক্ষণের দাবি আসলে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানদের অনাস্থায় ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত হতে থাকে। তাই বিশ্ববাসীর প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের বিষয়টির যথাযথ বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। উপমহাদেশের মহান সাধক হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রবর্তক। যিনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্ব মানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষে তাসাউফের এ মূল নীতি উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। নিম্নে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির বর্ণনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হলো–

হুজুর গাউছুল আজম প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত।

(১) ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর তিন প্রকার বিনাশ স্তর।
(২) মউতে আরবা' বা চার প্রকার মৃত্যু।

১। ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর তিন প্রকার বিনাশ :

(ক) ফানা আনিল খাল্ক :

আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং কারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। মানবজাতির কঠোর ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম এবং সাধনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া উচিত। এতে ব্যক্তি, রাষ্ট্র পরিশেষে সামগ্রিক জীবনে সফলতা বয়ে আনে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার বিকল্প নেই। যে জাতি বা রাষ্ট্র নিজেকে যতো আত্মনির্ভরশীল হিসেবে প্রকাশ করতে পেরেছে, সে জাতি তত মানবাধিকার চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল মানবমন যেমনি নিজের অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে, তেমনি রাষ্ট্রের সকল বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মানুষের অধিকার প্রতিপন্ন করতে পারে।

(খ) ফানা আনিল হা'ওয়া :

অনর্থক কাজকর্ম বা কথাবার্তা হতে নিজেকে বিরত রাখা, যার দরুণ অযথা ঝামেলা ও পেরেশানিতে যুক্ত হতে হয় না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "যে কেউ অনর্থ পরিহার করে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সূরা: আন-নাযেয়াত, আয়াত-৪০-৪১)

পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে–

"আমার উম্মতের জন্য আমি সর্বাধিক ভয়ের কারণ মনে করি- কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ আর দীর্ঘ লালসা ও আকাঙ্ক্ষা। নিশ্চয়ই কু-প্রবৃত্তি সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে আর অনাবিল আকাঙ্ক্ষা পরকাল ভুলিয়ে দেয়।" (বায়হাকী ফি সুআবিল ঈমান, মেরকাত, কিতাবুল আদাব, হাদিস-৫২১৪)

মানুষের সাথে অযথা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ এর সৃষ্টি হয়। যা পরবর্তীতে অধিকার হরণ থেকে শুরু করে মানব হত্যা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। যার দৃষ্টান্ত বর্তমানে অহরহ। সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাহাজানি, হতাহতের ঘটনা বর্তমানে নিত্যদিনের সংবাদ। এতে যেমন ব্যক্তি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি সমাজ রাষ্ট্রের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। অথচ একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে এমন অন্যায়-অবিচার হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সুতরাং নিজেকে স্বীয় প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত না করে, অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়ে কুরআন-হাদিস মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাই ঈমানের দাবি।

(গ) ফানা আনিল এরাদা :

খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা, যার ফলে আত্মার প্রশান্তি হাছিল হয়। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জীবন বিধান হিসেবে কেবল ইসলামই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই জীবন বিধান অনুসরণ করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে, যা শুধু মুসলিম মনীষীগণই নয়; বড় বড় অমুসলিম পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন।

বিশাল সৃষ্টি জগতে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তাঁর আইন-কানুন কার্যকর করেছেন, কিন্তু মানুষের জীবনে তা নিজেই কার্যকর না করে এর দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষের উপর। তিনি চান মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁর দেয়া জীবন বিধান মেনে নিক এবং ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা বাস্তবায়ন করুক। মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর দেয়া জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চিরশান্তির পথে এগুতে পারে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে নিজের ইচ্ছাশক্তির উপর প্রাধান্য দেয়াই উভয় জাহানে মুক্তির প্রথম সোপান। হাদিসে এসেছে– "যে ব্যক্তি আমার বিধানের উপর সন্তুষ্ট নয় এবং আমার প্রদত্ত নেয়ামতের উপর তুষ্ট নয়, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য প্রতিপালকের সন্ধান করে।" (তাবরানী ফিল কাবির)

সুতরাং আল্লাহ্‌র বিধানের ওপর সন্তুষ্ট থেকে প্রতিটি বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

২। মউতে আরবা' বা রিপুর চার প্রকার মৃত্যু :

মউতে আরবা' বা চার প্রকার মৃত্যুর দ্বারা এখানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মানুষের কামনা-বাসনা এবং প্ররোচণাকারী নফ্ছের মৃত্যুর কথা বুঝিয়েছেন। হাদিস শরিফে এসেছে- "তোমরা মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু বরণ করো"। এ প্রকারের মৃত্যুর পর কলব জাগ্রত হয়। কলব জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র রেজামন্দী হাসিল হয়।

মউতে আরবা' বা রিপুর চার প্রকার মৃত্যু মানবাধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নিম্নে এরই প্রেক্ষাপটে চার প্রকার মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো–

(ক) মউতে আবয়্যাজ :

অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। যা উপবাস ও সংযমে হাসিল হয়। যার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোজা বা নফল রোযা যা বিধান সাপেক্ষে ফরয বা নফল হওয়ার পাশাপাশি নফ্সকে কুমন্ত্রণা ও কামনা বাসনার সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থেকে হেফাজত করে। আর এতেই পাপ কাজ হতে বিরত থাকা যায় এবং পরোপকারে আত্মনিয়োগ করা যায়।

রোজার হাকীকত বর্ণনায় তফসীরে ইবনে আরবিতে উল্লেখ রয়েছে- "রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নূরের প্রজ্জ্বলনে মানব সত্তার পাপ বিদগ্ধ করা হয়।"

সুতরাং আত্মসংযম ও আত্মসহিষ্ণুতা যে কোনো অন্যায়-অবিচার থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেয় এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

(খ) মউতে আছওয়াদ :

মউতে আছওয়াদ তথা কালো মৃত্যু, যা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লিখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজে পায় তখন নিজেকে উক্ত দোষ হতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে না পায়, তখন দৃঢ় মনোবলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। সর্বোপরি সমালোচনাকারীর প্রতিবাদ না করে দৃঢ়চিত্তে যে কোনো নিন্দার গঠনমূলক মোকাবিলা করার মধ্যেই পরস্পরের কল্যাণ নিহিত হয়।

(গ) মউতে আহ্মর বা লাল মৃত্যু :

যা কামভাব ও লালসা হতে মুক্তিতে হাসিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়ে অলিয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়।

(ঘ) মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু :

নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে এটি অর্জিত হয়। অতি ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপন বিসর্জন দিয়ে সাদা সিধে জীবন যাপনের মাধ্যমে অন্তরে খোদা-ভীতির সঞ্চার হয়। আর খোদাভীতি ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং অপরের হক আদায়ে উৎসাহিত করে।

এ সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত ও স্বাভাবিক পন্থা যা ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবতা অর্জনে সহায়তা করে। মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে এ সপ্ত পদ্ধতির ভূমিকা অগ্রগণ্য। সুতরাং এ সপ্ত পদ্ধতি মানবজীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামি আদর্শে পরিচালিত হয়ে ব্যক্তি, জাতি, রাষ্ট্র সবখানে মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতিক সহাবস্থানের মানসিকতা তৈরি বর্তমান সময়ের একান্ত দাবি।

তথ্যপঞ্জি :

১. আল-কুরআনুল করিম

২. ইমাম বোখারী : আস সহীহ

৩. ইমাম মুসলিম : আস সহীহ

৪. ইবন কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম

৫. বেলায়তে মোত্লাকা

৬. বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ

৭. সালাউদ্দিন: মৌলিক মানবাধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৪ খ্রি.

৮. The New Encyclopaedia Brritannica Founded 1768, 15th Edition, in USA, VOL-5

৯. Mohammad Zamir : Human Rights: Issues and International Law, UPI Dhaka 1990.

সহকারি অধ্যাপক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
খতিব, লালদিঘী সিটি কর্পোরেশন শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।
পি.এইচ.ডি গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফানা আনিল এরাদা এর স্বরূপ ও তাৎপর্য

মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভি

আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণপুরুষ গাউসিয়তের পথিকৃৎ তরিকতের মহান সাধক হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। মাইজভাণ্ডারী তরিকা সর্বসাধারণের নিমিত্তে এক কালজয়ী তরিকতের নাম; এটির অনুসরণে রয়েছে ইহ-পারলৈকিক পরম শান্তি, মুক্তি এবং মর্যাদার মহান পাথেয়।

তরিকত মানে চলার পথ ও রাস্তা। তরিকত দীক্ষিত ব্যক্তি তার দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খোদায়ী শক্তির এক মহান অনুভূতি সঞ্চার করত হৃদয় জগতকে আলোকিত করার মহাপ্রয়াসে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) উছুলে ছাবয়া তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। উক্ত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি যুগে যুগে সকল তরিকত পন্থীর নিকট সমাদৃত ও স্বীকৃতি হয়ে আসছে।

ফানা আনিল এরাদা এর অর্থ–

ফানা এটি আরবি শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থ বিলীন হওয়া, সমাপ্ত করা এবং নিঃশেষ হওয়া ইত্যাদি। তরিকতের ভাষায়- বান্দা নিজস্ব ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা পরিহার করত তার সকল শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টিকর্তার সমীপে বিলীন করে দেয়া। সুফিতত্ত্বে একে তসলিম ও রযা বলা হয়। (সূত্র : বেলায়তে মোত্লাকা)।

ফানা আনিল এরাদা এর তাৎপর্য–

নাফ্সে ইনসানি তথা কু-প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটিয়ে রূহে ইনসানি তথা সু-প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ করতে হলে ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। নচেৎ সৃষ্ট হিসাবে একজন মু'মিন তার সৃষ্টিকর্তার কুরবাত বা নৈকট্য লাভে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। রূহে ইনসানির এমন অবস্থাকে কুর'আনুল কারিমে নাফ্সে মুতমায়িন্নাহ্ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي .

'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সন্তোষভাজন হয়ে ফিরে যাও। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।' (আল-কুরআন, সূরাহ্ : আল্ফাজর, আয়াত : ২৭-৩০)।

মানুষ সর্বক্ষেত্রে তার কামনা-বাসনা উপেক্ষা করে সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধ'র প্রতি

মাথানত করলে তখন সে অবশ্যই সার্থক বান্দা হিসাবে গণ্য হবে। বান্দার প্রতিটি কর্ম, ইবাদত এবং চিন্তাধারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্যে নিবেদিত হওয়া রাসুল কারিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম শিক্ষা। যেমন, নবীজী ইরশাদ করেন–

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا .

'আমি আল্লাহ্ তায়ালার উপর প্রতিপালক হিসাবে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রাসুল হিসাবে এবং ইসলামের উপর দ্বীন হিসাবে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হলাম।' (সূত্র : মুসলিম শরিফ)।

এভাবে বান্দার সকল ইবাদত-বন্দিগি এবং কর্ম প্রচেষ্টা সকল রিয়া তথা লৌকিকতা মুক্ত থাকা আবশ্যক। এমন কর্ম প্রচেষ্টাকে তরিকতের ভাষায় ইখলাস তথা লিল্লাহিয়্যাত বলে। সাধারণ মানুষ এ ইখলাস অর্জন করতে পারলে সে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মুত্তাকি উপাধিতে ভূষিত হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ .

'তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটিই সঠিক ধর্ম। (সূত্র : আল্ কুরআন, সূরা বায়্যিনাহ্ আয়াত নং : ৫)।

ফানা আনিল এরাদা অর্জন করার পূর্ব শর্ত হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার তাকওয়া বা খোদা ভীতি অর্জন করা। খোদা ভীতি মু'মিনের এমন অনুপম বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে ব্যক্তির বাহ্যিক সুন্দরের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণও পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে যায়। অবশ্য মানুষ তার জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করতে না পারলে কখনো সে ফানা আনিল এরাদা পোশাকে আবৃত হতে পারবে না। সৃষ্টি কর্তার তাওয়াক্কুল তাকে ইহ-পারলৌকিক সকল বাধা পেরিয়ে মর্যাদার উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করাতে পারবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দিবেন। (আল্ কুরআন, সূরাহ্ তালাক, আয়াত : ২-৩)। আর এ তাকওয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মুমিনের ক্বলব বা হৃদয়। রাসুল কারিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন-

اَلتَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

'তাকওয়া এখানে, এ কথা বলে তিনি তিন তিনবার নিজ বক্ষ মোবারকের দিকে ইংগিত করেন। (মুসলিম শরিফ)।

কিডনি মানবদেহে যে ভূমিকা ধরে আছে অনুরূপ ক্বলবও আত্মশুদ্ধির সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাই একে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত রাখতে পারলেই মু'মিনের সব অঙ্গ সচল ও ক্রিয়াশীল হবে। নবীজীর ভাষায়-

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

'এবং শরীরে এমন একটি অঙ্গ আছে, যা ঠিক থাকলে সারা শরীর ঠিক থাকে। আর যদি এটি বিনষ্ট হয় তাহলে সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়; আর তাই হলো ক্বলব বা হৃদয়।' (সূত্র : মিশকাত)।

সুতরাং বলা যায়, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মনুষ্যত্ব অর্জনে কার্যকরী সহায়ক। বর্তমান অস্থির বিশ্বে শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এ মহান অলিয়ে কামিল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করলে ইহ-পরকালে মুক্তি ও সফলতা অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিভাগীয় প্রধান
আল্ কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
পিএইচডি গবেষক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস দমনে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির ভূমিকা

মুহাম্মদ হামেদ রেযা নঈমী

ভূমিকা ঃ সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ অধুনা বিশ্বের ভয়ানক এক মরণব্যাধি, যা বিশ্বশান্তিকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে আরো যে একটি বিষয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তা হলো সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ। পৃথিবীতে যেমন রয়েছে নানা রঙের, নানা বর্ণের, নানা বৈচিত্র্যের মানুষ, তদ্রুপ সন্ত্রাসেরও রয়েছে রকমারি কৌশল পদ্ধতি ও শ্রেণিভেদ।

কখনো চলছে ব্যক্তি সন্ত্রাস, কখনো সামাজিক সন্ত্রাস, কখনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, কখনো বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস। আবার কখনো চলছে তথ্য-সন্ত্রাস অথবা রাজনৈতিক সন্ত্রাস, সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস, পরিবেশগত সন্ত্রাস ইত্যাদি। হরেক রকমের সন্ত্রাসে ছেয়ে আছে আজকের পৃথিবী। তাই সন্ত্রাস'র সংজ্ঞা ও পরিধি ব্যাপক, যা নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডির ফ্রেমে আবদ্ধ করা দুষ্কর। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুগে যুগে আধ্যাত্মিক সাধকগণ মানব সমাজকে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে বিভিন্ন সাধনা ও আত্মশুদ্ধির পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক সাধক গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)।

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ ঃ

'সন্ত্রাস' এমন একটি শব্দ যার প্রতি ঘৃণা, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার ঝড় বইছে বিশ্বব্যাপী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে সর্বসম্মত ব্যাখ্যা আজও নির্ণীত হয়নি। যে কারণে দেখা যায় যে, যা একটি গোষ্ঠীর কাছে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, তা অন্যের ভাষায় চরম ধিকৃত বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস। কারো বক্তব্যে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, অন্যের ভাষায় ঠিক তা-ই হলো আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। তাই সবকিছুর আগে আভিধানিক অর্থে সন্ত্রাস কী? সেটাই ভেবে দেখা দরকার। 'সন্ত্রাস' শব্দ ত্রাস থেকে উদ্ভূত। ত্রাস হলো- ভয়, শঙ্কা ভীতিকর।[১] আর সন্ত্রাস হলো- আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[২] সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Terror-Extreme fear, যৎপরোনাস্তি আতঙ্ক, সন্ত্রাস; Dreadful object ভয়ংকর ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু; Terrorism সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি, সন্ত্রাসবাদ; Terrorist সন্ত্রাসী; Terrorize সন্ত্রাসিত করা, ভয় দেখিয়ে শাসন করা।[৩] সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'ইরহাব' অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা।[৪]

পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস হলো: যে কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসমূলক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা। সন্ত্রাসবাদী- যে সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল বা তদানুযায়ী কাজ করে।[৫] The illegal use of (threats of) violence to obtain political demands.[৬] আরবি ভাষায় ইরহাবিয়্যুন- এমন একটা গুণবাচক নাম তাদের, যারা রাজনৈতিক লক্ষসমূহ পূরণে শক্তি প্রয়োগ ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করে থাকে।[৭]

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ফোরামে সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন অর্থ আলোচিত হলেও সর্বসম্মত পারিভাষিক অর্থ এখনো নির্ধারণ সম্ভব হয়নি।

উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি ঃ

কথায় আছে 'সন্ত্রাসীকে নয় সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করুন।' গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত 'উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি আমাদেরকে এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কেননা কোনো মানুষই জন্ম থেকে সন্ত্রাসী হয় না। প্রতিকূল পরিবেশ তাকে সন্ত্রাসী হতে কিংবা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। তাই আমাদের দেখা দরকার- মানুষ কেন সন্ত্রাসের দিকে ধাবিত হয়? আমার একান্ত ভাবনায় সাতটি চরিত্রের কারণে মানুষ ভয়ানক সন্ত্রাসী হয়ে উঠতে পারে। আর সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকৃষ্টকারী ভয়ানক এই সাতটি চরিত্র থেকে উছুলে ছাবয়া মানব সমাজকে পরিত্রাণ দিতে পারে, যা নিম্নরূপ-

প্রথম কারণ ঃ ন্যায় বা অন্যায়ভাবে কারো নিকট উপকার দাবি করা, যা ক্ষেত্র বিশেষে ঘুষ কিংবা হুমকির মাধ্যমেও দাবি করা হয়। 'উছুলে ছাবয়া'র প্রথম কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ 'ফানা আনিল খাল্ক' মানুষকে এমন দোষ থেকে মুক্তি দিতে পারে। কেননা এ কর্মপদ্ধতি মানব মনকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে নিষ্প্রয়োজন কাজে অযথা সময় ব্যয় করা, যা ধীরে ধীরে মানব মনকে অন্যায় ও সন্ত্রাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। 'উছুলে ছাবয়ার দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতি তথা 'ফানা আনিল হা'ওয়া' এমন চরিত্র থেকে মুক্তি দিতে পারে।

তৃতীয় কারণ ঃ মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রতি নির্ভর না করে, মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদে জড়িয়ে পড়া কিংবা নিজগড়া দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সবকিছুকে মূল্যায়ন করা। 'উছুলে ছাবয়া'র তৃতীয় কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ 'ফানা আনিল এরাদা' এ চরিত্র দমনে অন্যতম সহায়ক। কেননা এর মাধ্যমে বান্দা নিজের ইচ্ছা, বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নিজেকে উৎসর্গ করে।

চতুর্থ কারণ ঃ ধৈর্য ও সংযমের চরম অভাব। যে জন্য সামান্য উৎকণ্ঠা, কিংবা বিপদে বিচলিত হয়ে মানুষ ভুল করে বসে। যা তাকে সন্ত্রাসবাদের যে কোনো ক্ষেত্রে জড়াতে বাধ্য করে। উছুলে ছাবয়ার চতুর্থ কর্মপদ্ধতি তথা 'মউতে আবয়্যাজ' (সাদা মৃত্যু) এমন চরিত্রের সমূলে বিনাশকারী।

পঞ্চম কারণ ঃ নিজের ব্যাপারে অন্যের সমালোচনা থেকে শিক্ষা না নেয়া ও শত্রুর শত্রুতাকে অনুরূপ জবাব দেয়া। প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তি খুবই ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, ফলে সে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। এমন চরিত্রের বিনাশে 'উছুলে ছাবয়া'র পঞ্চম কর্মপদ্ধতি তথা 'মউতে আছওয়াদ' (কাল মৃত্যু) হলো অন্যতম অব্যর্থ হাতিয়ার।

ষষ্ঠ কারণ ঃ কামভাব ও লোভ লালসার বশীভূত হওয়া। যা মানুষকে অসামাজিক কার্যকলাপ ও অন্যায়ের পথ দেখায়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ধর্ষণ, হত্যা, শিশু-কিশোর অপহরণ, জিম্মীরূপে রাখা, মুক্তিপণ আদায়ে নানা অপকৌশল রচনায় মানুষ আকৃষ্ট হয়। উছুলে ছাবয়া'র ষষ্ঠ কর্ম পদ্ধতি তথা 'মউতে আহ্‌মর' (লাল মৃত্যু) এমন চরিত্র দমন করতে সাহায্য করে।

সপ্তম কারণ ঃ বিলাসিতা, আরাম আয়েশের প্রতি মানবপ্রকৃতির চরম আকাঙ্ক্ষা, যা মানবাত্মাকে লোভী করে তোলে। ফলে অন্যায় ও পাপের সকল দরজা তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়। বান্দা যখন এমন চরিত্র থেকে নিজকে পবিত্র রাখে, তখন উছুলে ছাবয়া'র সপ্তকর্ম পদ্ধতি তথা 'মউতে আখজার' (সবুজ মৃত্যু) স্তরে উন্নীত হয়, যা তাকে স্রষ্টার প্রেমময় বান্দায় পরিণত করে।

মানব সমাজে উদ্ভুত এমন সাতটি ভয়ানক কারণ যা চরিত্র থেকে পরিত্রাণ দিয়ে সিদ্ধপুরুষে পরিণত করতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধকগণ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে নানা ওয়াযিফা ও সাধনার পথ উদ্ভাবন করেছেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য, সন্ত্রাসবাদের এ সকল পথ রুদ্ধ করতে উপমহাদেশের অন্যতম বেলায়াতের সম্রাট, কাদেরীয়া মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া (আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি) একটি চমৎকার, কালজয়ী, অনবদ্য আবিষ্কার। এর সমর্থন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যেমন রয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী সুফিয়ায়ে কেরামের মাঝেও ভিন্ন নামে বিচ্ছিন্নভাবে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষত সর্বজন শ্রদ্ধেয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর অনবদ্য রচনা 'আল কাউলুল জামীল' গ্রন্থে কাদেরীয়া তরিকার যে 'দশ লতীফার' কথা উল্লেখ করেছেন, তার সবই 'উছুলে ছাবয়া'য় বিদ্যমান। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত 'উছুলে ছাবয়া অনুধাবন করে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

তথ্যসূত্র ঃ

(১) সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ), ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৩১৭।

(২) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬১।

(৩) Samsad English-Bengali-Dictonary, (Calcutta: Sahittya samasd), Fifth Edition 1980, P. 1168.

(৪) মু'জামুল ওয়াসীত, নাজমাউল-লুগাতিল আরাবিয়্যাহ্, (দিল্লী: দারুল ইল্‌ম), তাবি, পৃ. ৩৭৬।

(৫) সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬১।

(৬) মাহমুদুল হাসান 'সন্ত্রাস নয় শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অন্বেষা' (ঢাকা: দৈনিক ইনকিলাব, ৮ আগস্ট, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১০।

(৭) মু'জামুল ওয়াসীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬।

বিভাগীয় প্রধান
আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
পিএইচডি গবেষক
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

‘ফানা আনিল এরাদা’ এর প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার টিটু

যুগশ্রেষ্ঠ যেসব সুফি সাধক মানবমুক্তির বাণী প্রচার করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অন্যতম। উপমহাদেশে তিনি মাইজভাণ্ডারী তরিকার মাধ্যমে মানুষের মাঝে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। উন্নত চরিত্র অর্জনে ও মহান আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্যে তাঁর উছুলে ছাব‘য়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি সুফিবাদের ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন। ‘ফানা আনিল এরাদা’ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করা, যার ফলে সুফিমতে ‘তসলিম’ ও ‘রজা’ হাছিল হয়। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, তাই আল্লাহ তা’য়ালা ইসলামে নির্ধারণ করেছেন। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করা। অতএব আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকট পরিপূর্ণ সমর্পণ করার মাঝেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। মনের পবিত্রতার মাধ্যমে ঐকান্তিক প্রেম না হলে ঈমান হয় না, মুমিন হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘যারা ঈমান এনেছে তাদের সর্বাধিক প্রেম হবে আল্লাহ্রই জন্য’ (সূরা বাকারা : ১৬৫)। আর আল্লাহ্র প্রতি সর্বাধিক প্রেম হলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা হবে। তাই মহানবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ছিলেন মানব-প্রেম ও সৃষ্টিপ্রেমের মহান প্রতীক আর এ প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি মানুষের মন জয় করেছেন। আকৃষ্ট করেছেন মানবজাতিকে সত্যের প্রতি, সুন্দরের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি তথা ইসলামের প্রতি।

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন; কার্য নির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট’ (সূরা আহযাব : ০৩) এবং ‘ যারা না দেখা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁরাই পরকালের ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত’ (সূরা আম্বিয়া : ৪৯)। হযরত উমর (রজিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) বলেন, ‘যদি তোমরা আল্লাহ্র ওপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল কর যাতে তাওয়াক্কুল করার হক আদায় হয়ে যায়, তাহলে তিনি তোমাদের ঠিক তেমনিভাবে রুজি দিবেন, যেমন পাখিদের রিযিক দেয়া হয়। অতি সকালে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সাঁঝের বেলা ফিরে আসে ভরা পেটে’ (সহীহ তিরমিযি)।

সুফি সাধকগণ আল-কুরআনের বাণী ও রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা)-এঁর সুন্নাহ মানব অন্তরে গেঁথে দেন। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর দর্শন চর্চার মাধ্যমে মানবমনে শান্তি অর্জন সম্ভব। আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে নিজেকে বিলীন করে আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমেই এই ধরাধামে শান্তি আসতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তাঁরা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। এটাই সঠিক ধর্ম’ (সূরা আল বাইয়্যিনাহ : ০৫)।

সুফিবাদ মানবমনে প্রেম, সৌন্দর্য, সুর, ধৈর্য ও ভক্তির অপরূপ সমাবেশ ঘটায়। আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাশক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যায় মানবের সকল কাজ। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোত্র ও বর্ণের জন্য আসেনি, ইসলাম এসেছে বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য। মহানবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল কুরআনে এসেছে, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি' (সূরা আল আম্বিয়া:১০৭)। ইসলাম বিভেদের জন্য আসেনি, ঐক্যের জন্য এসেছে। আর এই ঐক্যের পতাকাবাহী হলেন সুফি সাধকেরা।

সুফি সাধনার মাধ্যমে চেহারার মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। মানুষ তথা সৃষ্টি জগৎ তাঁর বা তাঁদের দ্বারা উপকৃত হয়। সুফি সাধনার মাধ্যমে মানুষের পার্থিব জীবন হয় সুখময়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি নতজানু হওয়ার মাধ্যমে সদানন্দ বিরাজ করে অন্তরে আর চিরন্তন জীবনে মহা শান্তির নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর উছুলে ছাবয়ার অন্যতম স্তম্ভ 'ফানা আনিল এরাদা' এর চর্চার মাধ্যমে মানবমনে যে আল্লাহ প্রেম জাগ্রত হবে, তার মাধ্যমে আমাদের জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তি সম্ভব হবে।

প্রভাষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গাউছুল আজমের প্রবর্তিত এবং অছিয়ে গাউছুল আজমের বর্ণিত 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নিজের হায়াতে জিন্দেগানীতে স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি বা লিখিত কোনো কিতাব রেখে যাননি। তাতেও ছিল এক মস্ত বড় হিকমত। কারণ অলি আল্লাহ্গণের কোনো কাজই হিকমত থেকে খালি ছিল না। কারণ তিনি রেখে যাবেন হযরতের 'অছি', অছিয়ে গাউছুল আজম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। যাকে তিনি আদর করে ডাকতেন 'দেলা ময়না'। ময়না সবসময় মুনীবের কথা বলে। ময়নার জীবন-কর্মে লেখনি ও চলন-বলনে যা কিছু পরিস্ফুটিত হয়েছে, সবই ছিল হযরত কেবলার জীবন আদর্শ তথা প্রকৃত মাইজভাণ্ডারী দর্শন। আর এই কালজয়ী দর্শন তথা তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'উছুলে ছাবয়া' তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতির আলোকে।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত কেবলার কোনো লিখন না থাকলেও ভক্তদের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জজবাতি কালাম উপস্থাপন করতেন তা গবেষণা করলে দেখা যায়, তা ছিল ভক্ত অনুরক্তদের প্রতি সপ্তকর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা। এ পর্যায়ে আমি হযরত কেবলার তিনটি জজবাতি কালাম নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

(i) "কবুতরের মত বাছিয়া খাও, হারাম খাইও না, নিজ সন্তান-সন্ততি লইয়া খোদার প্রশংসা কর।" (বেলায়তে মোত্লাকা– মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী ২০১৪, পৃষ্ঠা ১০২)

হযরতের এই কালামকে আমরা বুঝার সুবিধার্থে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন : (ক) কবুতরের মত বাছিয়া খাও। (খ) হারাম খাইওনা (গ) সন্তান সন্ততি লইয়া খোদার প্রশংসা কর। কালামের প্রথম অংশ "কবুতরের মত বাছিয়া খাও" চারটি শব্দের একটি বাক্য। এই ছোট্ট বাক্যে ইসলামি শরিয়ত ও তরিকতের এক বিশাল সমুদ্রকে নিয়ে এসেছেন একটি ছোট্ট কৌটায়। "বাছিয়া খাও" এই কালামের মধ্যে চলে এসেছে সকল প্রকার হারাম, নাপাক, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, মজুদদারী, ভেজাল মেশানো, তথা সকল প্রকার নিষিদ্ধ বস্তু পরিহার করার হুকুম। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাছিয়া চলিলে বা বাছিয়া খাইলে একজন মানুষের পক্ষে আর কখনো অন্যায়ের সাথে যুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না। মূলত এই ছোট্ট কালামের মাধ্যমে সপ্ত পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তর তথা 'ফানা আনিল হা'ওয়া' তথা অনর্থ কাজ বর্জন করার নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে। আর এই অনর্থ কাজ বর্জনের মাধ্যমেই মূলত জীবন হবে ঝামেলামুক্ত, সহজ-সরল ও শান্তিপূর্ণ।

কালামের দ্বিতীয় অংশ "হারাম খাইওনা"। ইসলামি শরিয়তে অনুমোদিত সকল বস্তু

হালাল আর অননুমোদিত সকল বস্তু হারাম। শরিয়ত অনুমোদন দেয়নি এমন সকল কাজ ও বস্তু বর্জন করার কথা হযরত কেবলা সুস্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে করিমার মাধ্যমে হালাল খাওয়ার এবং হারাম বর্জন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমনঃ তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে যা কিছু বিশুদ্ধ ও বৈধ খাদ্য দ্রব্য রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৬৮)

আলোচ্য কালামের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী তরিকা যে কুরআনী হেদায়তের অনুগামী হযরত কেবলা তাই যথার্থ প্রমাণ করেছেন। ইন্দ্রিয় লালসার কারণেই মানুষ মূলত সকল প্রকার অবৈধ কাজের প্রতি আগ্রহী হয়। ইন্দ্রিয় লালসার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাবার চর্চা রয়েছে মাইজভাণ্ডারী তরিকায়। সপ্তকর্ম পদ্ধতির 'মউতে আরবা' তথা চতুর্বিধ মৃত্যুর মধ্যে মউতে আহ্‌মর তথা লাল মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রকার হারাম বর্জনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ সুরক্ষিত রাখতে পারে।

কালামের তৃতীয় অংশে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী বলেছেন, "সন্তান সন্ততি লইয়া খোদার প্রশংসা কর।" মাইজভাণ্ডারী তরিকা সর্ববেষ্টনকারী তরিকা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলকে সন্নিবেশিত করে এই মহান তরিকা। আমরা অনেক সময় নিজকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নিই না। হযরত কেবলা তাই জাতি-গোষ্ঠী, সন্তান-সন্ততি সকলকে সঙ্গে নিয়ে 'উছুলে ছাবয়া' তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে খোদার প্রশংসায় মনোনিবেশ করে সকলকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবার তাগিদ দিয়েছেন। (ii) "নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা, আমি বারো মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও।" (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত- মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী-২০১২, পৃষ্ঠা-১৩৭)

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার কদুরখীল নিবাসী হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ বাবু ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে সস্ত্রীক একদিন হযরত কেবলার দরবারে হাজির হয়ে মনে মনে প্রার্থনা জানালেন, হুজুর আমি নিঃসন্তান। হুজুরের মেহেরবাণীতে যদি আমার ছেলে-মেয়ে হয় এবং আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে, তাহলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। হিন্দু বাবুর আর্জির প্রেক্ষিতে হযরত কেবলা তখনি কালাম করেছিলেন "তোমাকে বাস্তবে মুসলমান করেছি। নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা, আমি বারো মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও।"

একজন হিন্দু ভদ্রলোককে কেন্দ্র করে এই কালাম নিঃসৃত হলেও মূলত এই ফরমানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে মাইজভাণ্ডারীসহ সকল তরিকতপন্থীকে। ইসলাম মূলত

মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখায়। গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকার মূল দর্শন বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত পদ্ধতি পবিত্র কুরআনে পাকের নির্দেশিত সহজ ও সরল পথ সিরাতাল মুসতাকীম পাবার যুগোপযোগী বিজ্ঞান সম্মত পন্থা। আলোচিত উছুলে ছাবয়া'র প্রথম উছুল বা ধারা হলো– "ফানা আনিল খাল্ক"। অর্থাৎ- কারো নিকট কোনো প্রকার উপকারের আশা না করা। সর্বোপরি নিজকে আত্মনির্ভরশীল করা। নিজের হাতে পাকানো খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা। এই অমীয় বাণী মূলত উছুলে ছাবয়া'র অন্যতম ধারা "ফানা আনিল খাল্ক" চর্চার অনন্য পাঠশালা। এই ক্ষেত্রে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর কালামের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে "আমি বারো মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও।" সাউম শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা। হযরত কেবলা হিন্দু বাবুকে উপদেশের মাধ্যমে সকল ধর্মের ভক্ত- অনুরক্তকে সারা বছর সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সকল ধর্মের মূলবাণী হচ্ছে পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং পাপাচারকে ঘৃণা করা। রোজা পালনের মাধ্যমে চর্চা হয় উছুলে ছাবয়ার অনন্য ধারা "মউতে আবয়্যাজ" তথা সাদা মৃত্যু। সিয়াম সাধনা মানুষকে মরার আগে মরতে শেখায়। সাদা মৃত্যু মানুষের অন্তরে নূরের আলো জ্বালায়। (ররর) "এখানে আসিওনা, এখানে হা'ওয়া দাফন করা হইয়াছে, ইহা বাবা আদমের কবর।" (বেলায়তে মোত্লাকা- মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী-২০১৪, পৃষ্ঠা-১০৩)

এক সময় হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর হুজরা শরিফে এক আগন্তুক প্রবেশ করতে চাইলে তিনি তাকে লক্ষ করে হঠাৎ বলেছিলেন, 'এখানে আসিওনা'। এখানে 'হা'ওয়া' দাফন করা হইয়াছে। ইহা বাবা আদমের কবর। 'হা'ওয়া' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– অনর্থ কাজ, যা না হলে চলে। মূলত হযরত কেবলা ছোট্ট একটি জজবাতি কালামের মাধ্যমে ভক্ত, অনুরক্ত, মুহিব্বীন, মুরিদীন তথা সর্বস্তরের জনসাধারণকে সকল প্রকার অনর্থ কাজ পরিহার করে মাইজভাণ্ডার শরিফে প্রবেশ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি সমান্তরালে সকল প্রকার ধর্ম বিরোধী অনর্থ কাজ করে যাবে, আবার নিজকে মাইজভাণ্ডারী দাবী করবে, সে তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীর কোনো ঘ্রাণ পাবে না, সে কথাই আলোচিত হয়েছে।

হযরত কেবলার এই অমীয় বাণী তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীর সপ্তকর্ম পদ্ধতি বা উছুলে ছাবয়ার ত্রিবিধ বিনাশ যেমন– (ক) ফানা আনিল খাল্ক (খ) ফানা আনিল হা'ওয়া (গ) ফানা আনিল এরাদা। এই তিন প্রকারের বিনাশ পদ্ধতিকেই শামিল করেছেন। এছাড়াও হযরত কেবলার হায়াতে জিন্দেগানীতে স্বাভাবিক বা জজ্বাতি হালতে আগন্তুক ভক্ত মুরীদানকে লক্ষ করে যত কালাম করেছেন সবগুলো কালাম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো না কোনোভাবে তা উছুলে ছাবয়ার দিক নির্দেশনা।

আমি আমার প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছিলাম, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলায়ে আলম তাঁর জীবদ্দশায় নিজ হাতে কোনো কিতাব লিখে যাননি। পরবর্তীতে অছি-এ-গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সংকলিত, লিখিত ও প্রকাশিত হযরতের জীবনী গ্রন্থ এবং ইলমে তাসাওফের ওপর তথ্য নির্ভর একাধিক গ্রন্থ। তন্মধ্যে–

১. গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত

২. বেলায়তে মোত্লাকা

৩. মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার

৪. মানব সভ্যতা

৫. মুসলিম আচার ধর্ম

ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে "গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত এবং বেলায়তে মোত্লাকা ইতোমধ্যে বিশ্বময় তাসাউফপন্থীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। বিজ্ঞজন উল্লিখিত দু'টো গ্রন্থকে ইলহামী কিতাব বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দেশ-বিদেশের অনেক ইসলামি স্কলার বলেছেন, এই দুটো কিতাব হযরত কেবলা তার অছিকে দিয়ে লিখিয়েছেন। 'ময়না' সবসময় মুনীবের কথা বলে এবং অছিয়ে গাউছুল আজম এঁর 'মসি' সবসময় মুনীবের কথাই লিখে।

অছি-এ-গাউছুল আজম সংকলিত ও প্রকাশিত 'গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জীবনী গ্রন্থের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ এবং ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ জুড়ে হযরতের জীবন আদর্শের অসংখ্য কারামাত তথা মুসলিম-অমুসলিম তথা দরবার সংশ্লিষ্ট অসংখ্য মুয়ামালাতের কথা আলোচিত হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন হাজত মাকসুদ পূরণ করতে গিয়ে যতগুলো উপদেশ নির্দেশ হযরত কেবলা দিয়েছেন, তা সবই ছিল উছুলে ছাবয়া তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা। যেমন– জীবনী গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে– "হযরত নারীদের জেওর বা অলংকার এবং তাবিজ ইত্যাদি পরিধান পছন্দ করিতেন না। অনেক সময় দেখা যাইত তিনি আদেশ দিয়া ঐ সমস্ত খোলাইয়া ফেলিতেন। নাক-কান ছেদন করিতে দেখিলেও তিনি সমবেত লোকজন নানারূপ ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেন এবং এই সমস্তকে 'মনহুছির জহর' বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন।" (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী-২০১২, পৃষ্ঠা-১৩৬)

মূলত হযরত উল্লিখিত নির্দেশনার মাধ্যমে গণমানুষকে 'উছুলে ছাবয়ার' সর্বশেষ কর্ম পদ্ধতি "মউতে আখজার" বা সবুজ মৃত্যু ধারণ করবার নির্দেশনা প্রদান করতেন।

অছিয়ে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দ্বিতীয় আলোচিত গ্রন্থ হলো- "বেলায়তে মোত্লাকা"। আলোচ্য গ্রন্থ শুধু মাইজভাণ্ডারী ঘরানার আশেকদের নয় বাংলাদেশ সহ সারা দুনিয়ার তরিকতপন্থীদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এ গ্রন্থ একজন সাধক ও ভাবুকের অন্তর্জগৎ খুলে দেবে। বেলায়তে মোত্লাকার মাধ্যমে মূলত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীর আসল স্বরূপ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচন করে দিয়েছেন। বেলায়তে মোত্লাকার অষ্টম পরিচ্ছদ 'বেলায়ত রহস্য, অধ্যায়ে উছুলে ছাবয়া তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (বেলায়তে মোত্লাকা– মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী-২০১৪, পৃষ্ঠা-৭০, ৭১) অছি এ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর রচনার আলোকে একজন বিরাগী বা অনুরাগী সাধনার মাধ্যমে জীবন পরিক্রমায় উছুলে ছাবয়া বাস্তবায়ন করলে তিনি যে বেলায়তের উঁচু মকামে পৌঁছে যাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রভাষক (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ)
সহকারি আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ
বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

সপ্ত পদ্ধতির সাত কাহন

হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি ঈমান বা বিশ্বাস'র ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা প্রথমত অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ বিশ্বাসবোধ ও চেতনার মৌলিকত্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্রষ্টার অন্বেষায় সৃষ্টি ধাবিত হয়। সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকেই দিয়েছেন আশরাফুল মাখলুকাত'র অনন্য মর্যাদা। তাই দেখা যায় মহাপুরুষগণের প্রথম সারির নির্বাচিত সত্তা নবি-রাসুল সকলেই প্রেরিত হন মানব সুরতে। তাঁদের জীবন প্রক্রিয়া মানবজীবন বিশেষত মানুষের ইহজীবনেই প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সাধনায় জীবনপাত করেছেন। তাঁদের অনুসরণে সাহাবী, অলি-আওতাদ, গাউছ-কুতুব তথা আধ্যাত্মিক মান্যবরগণ সকলেই তাঁদেরই জীবন ধারাকে অনুসরণ করে স্রষ্টার পথে নিজেও চলেছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকেও সেই পথেই টেনে নিয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "তাঁরই অনুসরণ করো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। অতঃপর আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লুক্বমানঃ আয়াত-১৫) আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, আল্লাহ্‌র রাসুলের আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে যাঁরা মান্যবর তাঁদের।" (সূরা নিসাঃ আয়াত-৫৯)

একমাত্র উপাস্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন'র নৈকট্যপ্রাপ্ত মহামনীষীগণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ নীলিমায় অত্যুজ্জ্বল মহাজ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ প্রকাশ হযরত কেবলায়ে আলম (কুদ্দিসা সিররূহ্) অন্যতম। তাঁরই আচরিত আধ্যাত্ম সাধনার বিশেষ দর্শন এবং মারফতের পথপরিক্রমার লক্ষে মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের সহজতর ফর্মুলা, শরিয়ত-তরিকতের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সারনির্যাসরূপে নিজ অনুসারীদের জন্য উপস্থাপিত সপ্ত মৌলিক নির্দেশনার নামই হলো উছুলে ছাবয়া। আরবী-'আছ্‌লুন' শব্দের বহুবচন উছুল। যার অর্থ মূল, নিয়ম, ভিত্তি, দলিল ইত্যাদি। আর ছাবয়া'র অর্থ সাত।

ইসলামে সাত অংকটির ব্যাপক তাৎপর্য। ইসলামি আকায়েদের মৌলিক বিষয় সাতটি, যা সংক্ষেপে সপ্ত বিশ্বাস বলে খ্যাত। ১. এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন, ২. তাঁর ফেরেশতাগণ, ৩. আসমানী কিতাবসমূহ, ৪. আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসুলগণ, ৫. শেষ বিচারের দিন, ৬. তাকদীর বা অদৃষ্টের ভালো-মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান- বর্ণিত বিষয়গুলো অকাট্য সত্য বলে বিশ্বাস করা। আসমান'র স্তর সাতটি। (সূরা মুলক এর ৩নং ও সূরা নাবার ১২নং আয়াত)।

পবিত্র কুরআন'র মানযিল সংখ্যা সাত। সপ্তাহে দিন'র সংখ্যা সাত। তাওয়াফে কাবায় শওত বা চক্কর (প্রদক্ষিণ করা)'র সংখ্যাও সাত। উছুলে ছাবয়া বা আত্মপ্রসাদ'র নফ্স'র ঔদ্ধত্যকে পরাস্ত করে খোদার ইচ্ছায় বিলীন হওয়ার সাধনায় অনুসৃত সপ্ত পদ্ধতি হযরত কেবলায়ে আলম'র আচরিত রীতি সমষ্টির পারিভাষিক নাম। এখানেও পদ্ধতির সংখ্যা সাত, ইসলামের মৌলিক ঐতিহ্যের ধারার সাথে এর অভিনব মিতাল লক্ষ করা যায়।

অনুসারীদের কাছে সুবিদিত যে, এখানে তিনটি ফানা ও চারটি মউত'র কথা রয়েছে। আল্লাহ্র ভাবে বিলীন হয়ে বান্দার এ প্রচেষ্টার লক্ষ নশ্বর জীবনের সাধনার মাধ্যমে অবিনশ্বর খোদার সাথে লীন হয়ে স্থায়ী জীবন লাভ করা। তাই ফানা ও মউতই আপাত দৃষ্টিতে প্রথম লক্ষ করা যাক। ফানা'র অর্থ বিনাশ। আমাদের যাহের ও বাতেন দু'টি অস্তিত্বই স্বীকার্য। দৈহিক অস্তিত্ব যাহের, আর আত্মিক বা মানসিক অস্তিত্ব বাতেন। সোজা কথা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আল্লাহ্র রাসুল হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা আল্লাহ্র সর্বশেষ প্রেরিত জন। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁরই প্রচারিত ও প্রদর্শিত ধর্ম ইসলামই আল্লাহ্র কাছে অনুমোদিত ও মনোনীত একমাত্র দ্বীন। তাঁরই আনীত ধর্ম- ইসলাম'র অনুসারী আধ্যাত্মিকতার অতি উচ্চ আসনের একজন মহান সাধক আমাদের প্রাণের মান্যবর তাপসকুল শিরমনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। একথা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকল মুমিনগণের কাছে অনস্বীকার্য এক ধ্রুব সত্য যে, তিনি আমাদের পেয়ারা নবীরই আওলাদে পাক, তাঁর ধর্মের মহান অলিউল্লাহ, গাউছিয়তের তাজদার সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ। তিনি রাসুলে করীম'রই আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি এ ধর্ম-বিশ্বাসের ধারা ছেড়ে আলাদা ও স্বতন্ত্র কোনো ধর্ম প্রবর্তন করেননি, ভিন্ন ইজমেরও প্রচার করেননি। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাঁরও আপ্ত বাণী। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহকেই তিনি সাধনার নীতিরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি নামাজের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দ্বীন'র একজন প্রথম সারির সাধক।

হযরত রাসুলে মাকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা'র আগমনের উদ্দেশ্য উম্মতের যাহের-বাতেন তায্কিয়া বা পবিত্রতা ও শুচিতা সাধন। পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানেই এ লক্ষের কথা "ইউযাক্কীহিম" শব্দ যোগে ব্যক্ত হয়েছে। আত্মার মাঝে স্বীয় আত্মরূপ হয়ে বিরাজমান 'নফ্স' কে দমন না করে অধ্যাত্ম্য চর্চার কথা বেমানান। নফ্স'র ধর্মই হচ্ছে উদ্ধত হওয়া, দূর্বিনীত থাকা। এই নফ্স'র অপর নামই আমিত্ব। আর মহান স্রষ্টা একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্র বিপরীতে যুগে যুগে যত অলীক ও ভ্রান্ত উপাস্য অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষ তার ধ্যানে ও কল্পনায় সাজিয়েছে, তাদের সরিয়ে অন্তর জগতে এক আল্লাহ্র ধ্যান অধিষ্ঠিত করাই রাসুলুল্লাহ্র বিশাল মিশনের ছিল প্রধান লক্ষ। একত্বের বিশ্বাস বদ্ধমূল হলে তার ওপরেই নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ফরয হয়।

আল্লাহ্‌র আনুগত্য কোনো শর্ত ভিত্তিক নয়; তা হতে হবে নিঃশর্ত। এ সত্যকেই ধারণ করে মানুষ মুমিন হয়। সৃষ্টিকুলে প্রথম 'আমিত্ব' প্রকাশ করেছিল শয়তান। সেই প্রথম বলেছিল, "আনা খাইরুম মিন্‌হু।" অর্থাৎ আমি উত্তম। 'আনা' (আমিত্ব)'র বিনাশ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ 'ফানা'। পৃথিবীতে আরেকজন খোদাদ্রোহী, দূর্বিনীত, অত্যাচারী শাসক, যার আমিত্ব'র কথা আল্লাহ্‌র পাক কালামে উদ্ধৃত হয়েছে, তার নাম ফিরআউন। সেই বলেছিল, "আনা রাব্বুকুম আল্‌আ'লা।" প্রথম আনা'র দম্ভোক্তিকারী ইবলিস স্বর্গচ্যুত হয়েছিল, হয়েছিল বিতাড়িতও। পৃথিবীর মিশর-অধিপতির 'আনা' ঘোষণাকারীকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মিশরেরই নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছেন। যে মিশর একসময় ফিরআউনের করায়ত্ব ছিল। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে আল্লাহ ছাড়া বাকী সকল সৃষ্টি ফানা হয়েছে। সূরা আররাহমান'-এ বলা হয়েছে, "কুল্লু মান আলাইহা ফা-ন্‌, ওয়া ইয়াবক্বা ওয়াজহু রাব্বিক্‌।"

এ ফানা বিষয় ত্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, খাল্ক, হা'ওয়া ও এরাদা। পরনির্ভরতা হতে, বাহুল্য বা চাকচিক্য হতে এবং নিজ ইচ্ছা ও বাসনা হতে। নফ্‌স'র তিন স্তরের কথা পবিত্র কুরআনে বিবৃত। 'আম্মারা', 'লাওয়ামা' এবং 'মুত্বমাইন্নাহ্‌'। তৃতীয় স্তরে উপনীত হলে সন্তোষ অর্জিত হয়। বিনাশ'র স্তরত্রয় অর্জিত হলে বান্দার প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। (২৯ঃ ২৭–৩০ এর তাফসীর দ্র.) এর প্রারম্ভ আম্মারা, সাফল্য মুত্বমাইন্নায়। চার প্রকার যে মৃত্যুর বর্ণনা উছুলে ছাবয়া-তে প্রদত্ত হয়েছে, তা অপূর্ব। আধ্যাত্মিকতার প্রথম পাঠই হচ্ছে "মূ-তূ কাব্‌লা আন তামূ-তূ"–অর্থাৎ 'পদ্ধতিগত মৃত্যুদূত আগমনের পূর্বেই মৃতবৎ হয়ে যাও।" তবে আর ভয় কী যমের? সাধক বলেন, "মরার আগে মরিয়া গেলে তারে কি আর মরণ কয়?" মৃত ব্যক্তির না থাকে কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা, না কোনো নালিশ-অভিযোগ। আমাদের এটা মনে রাখা দরকার যে, এখন জীবিত হলেও অচিরেই আমি মৃতদের মধ্যে শামিল হবো। সমর্পিত দাসের অনুরূপ অবস্থাই তো কাঙ্ক্ষিত। মউতে আরবা'-তে চারটি রং বা বর্ণের নাম আছে। মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী প্রকৃত রোযাদারের চেহারায় প্রতিভাত বিশেষ অবস্থার কথা বলেছেন তাঁর তাফসীরে। ভয়ে মানুষের চেহারা ফ্যাকাশে হয়, উত্তেজিত মানুষের রং লালচে হয়। চতুর্বিধ 'মৃত্যু'তে বর্ণিত বিচিত্র বর্ণগুলো সাধনার বিশেষ বিশেষ স্তরে বিশেষ অবস্থার লক্ষণ প্রকাশক। শত্রুর নিন্দায় প্রথমে মানুষ চেহারা মলিন করে। লালসার মুখ উত্তেজনা বশত রঙিন। সবুজ প্রাচুর্য, বিলাস, সমৃদ্ধির লক্ষণ। মহাসাগরের মাঝে রত্ন কুড়ানো সবার কাজ নয়, বেলাভূমিতে কেউ ঝিনুকও কুড়ায়। এ লেখাটা সেই জাতীয় প্রয়াসমাত্র। মহানুভবতার কাছে দীন'র ত্রুটি মার্জনীয়।

আরবী প্রভাষক
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
খতিব
হযরত খাজা গরীব উল্লাহ শাহ্‌ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) জামে মসজিদ।

তাসাউফ: তাকওয়া তাযকিয়া ও ইহসান
আত্মশুদ্ধি ও সত্যদর্শনে
'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি

মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি কি ও কেন এবং কাদের জন্য? এর সুবিধাভোগী, উপকারভোগী, লাভবান বা Beneficiary কারা? 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি হলো: আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ন তথা মানব মুক্তির জন্য বিশেষ রিয়াজত বা সাধনা পদ্ধতি। যা সভ্যতার সুরক্ষায় অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকরী।

'উছুলে ছাবয়া' দ্বিবিধ-

(ক) "ফানায়ে ছালাছা" (فناء ثلاثه) বা 'ত্রি-লয়',

(খ) "মউতে আরবা" (موت اربعه) বা 'চার মৃত্যু'।

"ফানায়ে ছালাছা" (فناء ثلاثه) বা 'ত্রিবিধ ফানা'সমূহ হলো-

(১) 'ফানা আনিল খাল্ক' (فناء عن الخلق) সৃষ্টি থেকে কিছু আশা না করা (শুধু স্রষ্টা থেকে আশা করা),

(২) 'ফানা আনিল হা'ওয়া' (فناء عن الهوى) অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মুক্ত হওয়া,

(৩) 'ফানা আনিল এরাদা' (فناء عن الاراده) খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া (স্বীয় ইচ্ছার অনুগত না হওয়া)।

"মউতে আরবা" (موت اربعه) বা 'চতুর্বিধ মৃত্যু'সমূহ হলো-

(১) 'মউতে আবয়্যাজ' (موت ابيض) 'সাদা মৃত্যু' (রোজা ও সংযম),

(২) 'মউতে আছওয়াদ' (موت اسود) 'কালো মৃত্যু' (প্রশংসা ও নিন্দার ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া),

(৩) 'মউতে আহ্মর' (موت احمر) 'লাল মৃত্যু' (কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া),

(৪) 'মউতে আখজার' (موت اخضر) 'সবুজ মৃত্যু' (নির্বিলাস অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা)।

এই জীবনব্যাপী সপ্তকর্ম পদ্ধতি সকল শ্রেণি পেশার সব বয়সী মানুষের জন্য। যেমন: শিশু, নারী, দরিদ্র জনগণ, আদিবাসী, উপজাতি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, হিজড়া, অসুস্থ নারী পুরুষ, সুবিধা বঞ্চিত লোকজন, গৃহিণী ও

কল কারখানায় কর্মজীবী নারী, স্কুল কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণ, কর্মজীবী, শ্রমজীবী, চাকুরিজীবী ও নানান শ্রেণি পেশার আপামর সকল স্তরের জনসাধারণ।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামের বিধান কোনো আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব লোকাচার নয়। আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস, প্রিয় নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সর্বোত্তম আদর্শ অনুসরণ ও জীবনে সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্য পরকালে জবাবদিহিতা, পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয়, সর্বোপরি মানব কল্যাণ ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনই ইসলামের মূল শিক্ষা। একজন ভালো, সৎ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মানুষই প্রকৃত মুমিন বা মুসলমান হতে পারেন। ভালো মানুষ হওয়ার জন্য বাহ্যিক শুদ্ধতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। আত্মশুদ্ধির বিষয়গুলো কুরআন মজীদে তাকওয়া ও তাযকিয়া নামে রয়েছে এবং হাদিস শরীফে ইহছান নামে এসেছে। যাকে পরিভাষায় ইলমে তাসাউফ বলা হয়। শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারিফত এর পথ পরিক্রমা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ফাতিহায় মানুষকে হিদায়াতের প্রার্থনা শিখেয়েছেন-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

"আমাদের সঠিক সরল পথ দেখান।" (আল কুরআন, সূরা-১ ফাতিহা, আয়াত: ৪)।

এরই প্রেক্ষিত আল্লাহ তায়ালা ত্রিশ পারা কুরআন নাজিল করে বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"এই সেই কিতাব! যাতে সন্দেহের অবকাশমাত্রও নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকীগণের জন্য হিদায়াত- সঠিক সরল পথনির্দেশ।"(আল কুরআন, সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ২)

তাকওয়া অর্থ আল্লাহর ভয়। যার মাঝে আল্লাহর ভয় আছে তিনি মুত্তাকী বা পরহেজগার। তাকওয়া হিদায়াতের পূর্বশর্ত; তাকওয়ার জন্য রয়েছে অপরিহার্য পঞ্চশর্ত, তাকওয়াবানগণই সফলকাম। আল্লাহ তায়ালার বাণী-

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"যারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম বা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত বা পবিত্র দান প্রদান করে, এ গ্রন্থ কুরআন বিশ্বাস ও অনুসরণ করে এবং পূর্ববর্তী

গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন করে, আর আখিরাত বা পরকালের প্রতি দৃঢ় আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করে। এরাই আছে সঠিক পথে, এরাই হবে সফলকাম।" (আল কুরআন, সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ৩-৫)।

একজন প্রকৃত মুমিন তাকওয়া দ্বারাই পরিচালিত হন। তাকওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে। কুরআন কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা তাকওয়া অর্জন করো (আল্লাহকে ভয় করো) এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।" (আল কুরআন, সূরা-৯ তাওবাহ, আয়াত: ১১৯)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

"সাবধান! আল্লাহর অলিগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অর্জন করে।" (আল কুরআন, সূরা-১০ ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩)

তাকওয়া মানে সতর্কতা, সাবধানতা, আত্মরক্ষা। ষড়রিপু তথা: কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য হলো মানুষের মানবীয় গুণাবলির শত্রু। যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য মানুষের জ্ঞানকে বাধাগ্রস্ত করে তাদের বলা হয় রিপু বা শত্রু। এরা মূলত জ্ঞানের শত্রু। মানুষের মাঝে এরূপ ছয়টি রিপু বা শত্রু রয়েছে। এগুলো মানব প্রবৃত্তিরই অংশ। এসবের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষকে সুসভ্য ও উন্নততর করে। এগুলোর যথেচ্ছ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষকে পশুরও অধম করে দেয়। অধঃপতনের অতলে নিমজ্জিত করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

"আর অবশ্যই আমি বহু দানব ও মানব জাহান্নামের জন্য পয়দা করেছি, তাদের অন্তর রয়েছে তাদ্বারা তারা অনুধাবন করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে তাদ্বারা তারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে তাদ্বারা তারা শ্রবণ করে না। তারা পশুতুল্য বরং তারা তারও অধম। তারা হলো গাফিল, উদাসীন, অমনোযোগী।"(আল কুরআন, সূরা-৭ আরাফ, আয়াত: ১৭৯)

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্থ সূচিতা, পবিত্রতা, মানোন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি। তাযকিয়া হলো অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, আত্মিক উন্নতি, চারিত্রিক উৎকর্ষ। মূলত তাযকিয়া হলো,

মানব চরিত্রের নেতিবাচক গুণাবলি যথা- লালসা, অন্যায় বাসনা, পরনিন্দা, মিথ্যা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মপ্রচার, অহংকার, কার্পণ্য ইত্যাদি হতে মুক্ত হওয়া। তাযকিয়া মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। একজন মুমিনের প্রকৃত সাফল্য তাযকিয়ার উপরই নির্ভরশীল।

আল্লাহ তাআলা বলেন- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.
"প্রকৃত তারাই সফল হলো, যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করলো"। (আল কুরআন, সূরা-৯১ শামছ, আয়াত: ৯)

হজরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দোয়া করেছিলেন এ বলে-
رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.
"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন।" (আল কুরআন, সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ১২৯)।

ইহসান বা সত্যদর্শন সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণনা করেন, হজরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কে প্রশ্ন করেন- مَا الْاِحْسَانُ 'ইহসান' কী? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন- اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ. فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ. فَاِنَّهُ يَرَاكَ.
'তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো; যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।' (বুখারী শরীফ, খণ্ড: ১, হাদিস: ৪৮)। ইহসান বিষয়ক বিখ্যাত এ হাদিস 'হাদীসে জিবরাঈল' নামে প্রসিদ্ধ।

এ হাদিস শরীফে আত্মদর্শন ও সত্যদর্শনের সূত্র প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত রয়েছে। বাক্যের فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ এই অংশটুকু যদি এক ক্রিয়া হিসেবে ধরা হয় তবে উপর্যুক্ত অর্থ হয়, আর যদি দুটি ক্রিয়া আলাদাভাবে ধরা হয় তবে অর্থ হবে- فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ 'যদি তুমি নাই হও বা নিজেকে ফানা বা বিলীন করে দাও; تَرَاهُ তবেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। এজন্যই আল্লাহর আশেক অলি আউলিয়াগণ বলেছেন-

یا الهی مجھ سے مجھکو دور کر # تا کہ دیکھوں مجھ میں تجھکو ایك نظر
হে খোদা! তুমি আমায় আমা হতে কর দূর,

তবেই আমি দেখবো তোমায় আমাতে একনজর।

পঞ্চইন্দ্রীয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক সংযত ব্যবহার নিশ্চিত করাই হলো ইবাদাত। দেহ মনকে অন্যায় নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু হতে বিরত রাখাই ইবাদতের উদ্দেশ্য। আজীবন এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার দক্ষতা অর্জন করা হলো ঈমানের সফলতা।

হজরত নুমান ইবনে বাশীর (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-

اَلَا وَ اِنَّ فِی الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ. اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ. وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ. اَلَا وَ هِیَ الْقَلْبُ.

'মানবদেহে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যা পরিশুদ্ধ হলে তার পুরো শরীর সঠিকভাবে কাজ করে; আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তার সমস্ত দেহই বিনষ্ট হয়; জেনে রাখো তা হলো কলব।' (বুখারী শরীফ, খণ্ড: ১, হাদিস: ৫০)। এ হাদিস 'হাদিসে কলব' নামে প্রসিদ্ধ।

দেহ ও মনের পূর্ণ অংশগ্রহণে ইবাদত পালন করলেই তা পরিপূর্ণ ও ফলদায়ক হবে। মুখের বা জবানের ইবাদত হলো কু-বাক্য ও কু-কথা না বলা, পরচর্চা, গীবত, শেকায়াত ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা। চোখের ইবাদত হলো হারাম দৃশ্য দেখা হতে বিরত থাকা। কানের ইবাদত হলো হারাম শ্রবণ থেকে বেঁচে থাকা। হাতের ইবাদত হলো হারাম ধারণ ও হারাম স্পর্শ থেকে দূরে থাকা। পায়ের ইবাদত হলো অন্যায় পথে গমন বা পদার্পণ না করা। মন ও মস্তিস্কের ইবাদত হলো পাপ ও অন্যায় চিন্তা কল্পনা ও পরিকল্পনা হতে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

"নিশ্চয় শ্রবণ, দর্শন ও চিন্তন এসবের সবগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (আল কুরআন, সূরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ৩৬)।

এ দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোজ হাশরে কিয়ামতের দিনে শেষবিচারে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কুরআনের ভাষায়-

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

"আজ আমি তাদের মুখে সীল মোহর করে দিলাম, তাদের হস্তসমূহ আমার সাথে কথা বলবে, তাদের চরণগুলো সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।" (আল কুরআন, সূরা-৩৬ ইয়া সীন, আয়াত: ৬৫)।

বিদায় হজের ভাষণে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- 'আরাফাত দিবস যেমন ফজিলতপূর্ণ, আরাফাতের প্রান্তর যেমন সম্মানিত, মক্কা নগরী যেমন পবিত্র, কাবা ঘর যেমন মর্যাদাপূর্ণ; সকল মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান অনুরূপ পবিত্র ও সম্মানীয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর; বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা)।

ইসলামি শরিয়তের দণ্ডবিধির পঞ্চ উদ্দেশ্য বা মাকাসিদে শরিয়ার মানবকল্যাণ ও সুরক্ষা। যথা- জীবন রক্ষা, সম্পদ রক্ষা, জ্ঞান রক্ষা, বংশ রক্ষা, বিশ্বাস বা ধর্ম রক্ষা। শেষ বিচারের দিনে রোজ কিয়ামতে পাঁচটি প্রশ্ন, তাও জীবন ঘনিষ্ঠ। যথা- জীবন, যৌবন, আয়, ব্যয়, জ্ঞান। (জামে তিরমিযী: ২৩৫৩ ও ২৪১৬)।

চিত্তশুদ্ধির জন্য কু-প্রবৃত্তি বর্জন ও সুকুমারবৃত্তি অর্জন করতে হবে। পরিভাষায় যাকে রাজায়েল ও ফাজায়েল বলা হয়। রাজায়েল বা বর্জনীয় মন্দ স্বভাবসমূহ হলো- ১. হিরছ (حرص)- লোভ, ২. তমা (طمع)- লালসা, ৩. গীবত (غيبت)- পশ্চাতে পরনিন্দা করা, ৪. কিজ্ব (كذب)- মিথ্যা বলা ও মিথ্যা আচরণ, ৫. বুহতান (بهتان)- মিথ্যা রটনা ও অপবাদ, ৬. রিয়া (ريا)- লোক দেখানো ইবাদত, ৭. কিব্র (كبر)- অহংকার, ৮. উজ্ব (عجب)- খোদ পছন্দি, আত্ম-অহঙ্কার, ৯. হাছাদ (حسد) - হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা, ১০. কীনা (كينه) - ক্রোধ ও অন্তরে শত্রুতা পোষণ, ১১. হারাম (حرام) - অবৈধ কাজ ও অবৈধ খাদ্য, ১২. বুখল (بخل)- কৃপণতা।

ফাজায়েল বা অর্জনীয় উত্তম গুণাবলি হলো- ১. কানায়াত (قناعت)- অল্পে তুষ্টি, ২. ইনাবত (عنابت)- আল্লাহর দিকে মন সর্বদা রুজু করা, ৩. যুহুদ (زهد)- দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, ৪. অরা (ورع)- সন্দেহজনক জিনিস থেকে বেঁচে থাকা, ৫. তাওবাহ (توبه)- গুনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া, ৬. ছিদক (صدق)- সত্য ভাষণ, ৭. শোকর (شكر)- কৃতজ্ঞতা, ৮. তাওয়াক্কুল (توكل)- আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা, ৯. তাছলীম (تسليم)- আল্লাহ্র হুকুম সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া, ১০. ছবর ও হিলম (صبر و حلم)- সংযম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ১১. রেজা (رضاء)- আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর রাজি থাকা, ১২. হালাল (حلال)- বৈধ উপার্জন, ১৩. ছাখাওয়াত (سخاوت)- উদারতা ও দানশীলতা।

রিয়াযত ও মুজাহাদার ক্ষেত্রে রূহ, নফস ও কলব সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দত্রয়ের দ্বিবিধ ব্যবহার রয়েছে। প্রথমত কুরআন, হাদিস, আকায়িদ, ফিকাহ্ ও লুগাতে (অভিধানে); দ্বিতীয়ত তাসাউফের পরিভাষাতে। দ্বিতীয় প্রকারের قلب - نفس - روح হলো বুযুর্গানেদ্বীন কর্তৃক নির্ধারিত (কল্পিত) শরীরের অতিসংবেদনশীল দশটি সূক্ষ্ম অঙ্গের অন্তর্গত বিশেষ তিনটি স্থান। যেমন- قلب - روح - نفس - سر - خفى - اخفى و آب - آتش - خاك - باد (কলব, রূহ, নফস, ছির, খফী ও আখফা এবং আব (পানি), আতশ (অগ্নি), খাক (মৃত্তিকা) ও বাদ (বায়ু)। শেষোক্ত চারটিকে عناصر اربعة (আনাছেরে আরবা) বা চার মূল ধাতু বলা হয়। এগুলোকে لطائف عشرة (লাতায়েফে আশারা) বা দশ লতিফা বলা হয়। বিভিন্ন তরিকায় এগুলোর স্থানের বর্ণনায় বিভিন্নতা রয়েছে। আমরা এখানে প্রথমোক্ত অর্থে এগুলোর আলোচনা করবো। মূলত রূহ হলো আত্মা, প্রাণ, জীবন; কলব হলো মস্তিষ্ক, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি; নফস হলো রিপু বা ব্যক্তিসত্তা।

রূহ সমন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

و يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا.

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন রূহ আমার রবের নির্দেশ হতে; আর তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা-১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৮৫)। রূহ মূলত কম্পিউটারের সফটওয়ার (কমান্ডস- Commands বা নির্দেশ) এর মত, যা হার্ডওয়ার (শরীর) এর মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু এর নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান নেই, ইনস্টল করার পর তা পূর্ণ হার্ডওয়ার (শরীর) এ অবস্থান করে। তবে আলাদাভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো অংশে নয়। রূহ হলো প্রাণ বা জীবন।

নফস হলো ষড়রিপু- (১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মদ, (৫) মোহ, (৬) মাৎসর্য বা রিপুর সমন্বয়ে গঠিত ব্যক্তি বা স্বীয় গুণাবলিসহ সত্তা। নফসেরও কোনো নির্ধারিত আকার নেই এবং শরীরের মধ্যে তার কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান বা অবস্থানও নেই। নফসের তিনটি অবস্থা হতে পারে। (ক) আম্মারা, (খ) লাউওয়ামা, (গ) মুৎমাইন্না।

(ক) নফসে আম্মারা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর জবানীতে বলেন-

وما ابرئ نفسى ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربى ان ربى لغفور رحيم

"আর আমি আমার নফসকে নির্দোষ বলি না, নিশ্চয় নফস অবশ্যই মন্দ কাজের প্রতি নির্দেশ করে, আমার রব যাকে রহম করেন তাকে ছাড়া; নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (আল কুরআন, সূরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ৫৩)। নফসে আম্মারা হলো নফসের ঐ অবস্থা যে অবস্থায় নফস মানুষকে শুধু মন্দ কাজের প্রতি ধাবিত করে।

(খ) নফসে লাওয়ামাহ্ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রয়েছে-

لا اقسم بيوم القيامة. و لا اقسم بالنفس اللوامة.

"শপথ কিয়ামত দিবসের আর শপথ নফসে লাওয়ামার।" (আল কুরআন, সূরা-৭৫ কিয়ামা, আয়াত: ১-২)।

নফসে লাওয়ামা হলো নফসের ঐ অবস্থা যে অবস্থায় নফস মন্দ কাজ সংঘটিত হওয়ার পর অনুতপ্ত হয়।

(গ) নফসে মুত্মাইন্নাহ্ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রয়েছে-

يايتها النفس المطمئنه. ارجعى الى ربك راضية مرضية. فادخلى فى عبادى. و ادخل جنتى.

"হে প্রশান্ত আত্মা! সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার রবের নিকট আসো এবং আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (আল কুরআন, সূরা-৮৯ ফাজ্‌র, আয়াত: ২৮-৩০)। নফসে মুত্মাইন্নাহ্ হলো নফসের ঐ অবস্থা যে অবস্থায় নফস মানুষকে ভালো কাজের প্রতি ধাবিত করে অর্থাৎ ভালো কাজে প্রশান্তি লাভ করে।

নফস ও রূহ্ এর পার্থক্য:

(১) নফসের মৃত্যু হয় কিন্তু রূহের মৃত্যু হয় না।

(২) নফসের তিনটি অবস্থা আছে কিন্তু রূহ সবসময় একই অবস্থায় থাকে।

(৩) নফসের বিচার হবে, রূহের নয়।

উল্লেখ্য যে, কখনো কখনো রূহ নফসের অর্থে এবং নফস রূহের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

স্মর্তব্য যে, কুরআনুল করিম ও হাদিস শরীফে বর্ণিত রূহ ও নফস যেহেতু বস্তু নয় তাই এর নির্দিষ্ট কোন স্থানও নেই, সুফিগণ রিয়াযত ও মুজাহাদার (আমলের) সুবিধার্থে এর জন্য বিশেষ অবস্থান কল্পনা করে স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সুফিগণের বর্ণিত কলবের অবস্থানের ব্যাপারেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

কলব সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে, যেসব আয়াতে কলবের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: و قلبه مطمئن بالايمان. 'আর তার কলব ঈমানে প্রশান্ত।' (আল কুরআন, সূরা-১৬ নাহল, আয়াত: ১০৬)।

فى قلوبهم مرض 'তাদের অন্তরগুলোতে রোগ আছে।' (আল কুরআন, সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ১০)।

হাদিস শরীফে রাসুলূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন-

الا و ان فى الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هى القلب.

"জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা (মুদগাহ) আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, পুরো শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, পুরো শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরাটি হল কলব।" (বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০, হাদিস নাম্বার- ৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ)।

"আরো শুনে রাখো, মানুষের অজুদের ভিতরে (অর্থাৎ মানব দেহের মধ্যে) এমন একটি অংশ আছে যে, সেই অংশটি যখন যথার্থরূপে ঠিক হয়ে যায়, তখন মানুষের পূর্ণ অজুদই ঠিক হয়ে যায়। (অর্থাৎ, সম্পূর্ণ মানব দেহটিই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হতে থাকে)। পক্ষান্তরে সেই অংশটি যখন খারাপ হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত অজুদটিই খারাপ হয়ে যায় (অর্থাৎ, মানব দেহের কোনো অংশ বা কোনো অঙ্গই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না)। বিশেষভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সে অংশটি হচ্ছে আকল বা বিবেক। এখানে কলব শব্দটির উদ্দেশ্য হলো এর মধ্যে নিহিত আকল বা বিবেক। এমনকি কেউ কেউ বলেন যে, এ স্থলে কলব শব্দটি সরাসরি আকল বা বিবেক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।" (ফতহুল বারী)।

"হারাম ও সন্দেহজনক কার্যাবলি হতে বাঁচতে চাইলে সর্বপ্রথম স্বীয় আকল বা বিবেককে যথার্থরূপে সুষ্ঠু ও ঠিক করতে হবে। কারণ, মানুষের বিবেকই মানবদেহরূপী কারখানার জন্য চালকযন্ত্র স্বরূপ। মানবের কর্তব্য, তার বিবেক-বুদ্ধিকে সুষ্ঠু করে তারপর সে সুষ্ঠু জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আলোচ্য হাদিসটিকে হাদিসে এছলাহে কলব বা আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের হাদিস বলা হয়। নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর হাদিসসমূহের মধ্যে এ হাদিসটিকে সমস্ত শরিয়ত ও তরিকত-তাসাউফের মূল উৎস বলা যেতে

পারে। এ হাদিসটির "(মানব দেহের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ আছে যার উন্নতি-অবনতির উপর সম্পূর্ণ দেহের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে)।" এ তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মানুষের সৃষ্টি-তত্ত্ব ও দেহ-তত্ত্বের ইঙ্গিতদানে মানবের প্রকৃত উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যে, স্থূল দেহের উন্নতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মার (বিবেকের) উন্নতির উপরই মানুষের প্রকৃত ও মূল উন্নতি নির্ভর করে। আত্মার বা বিবেকের উন্নতি সাধিত না হলে মানব জীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়।

এ হাদিসে রাসুলূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা "মুদগা" বলে মানব দেহের যে বিশিষ্ট অংশটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, সে অংশটি হচ্ছে আকল বা বিবেক। এর উন্নতিতে পূর্ণ মানব দেহের উন্নতি এবং তার অবনতিতে সম্পূর্ণ মানব দেহের অবনতি ঘটে। অর্থাৎ, বিবেক রত্নটির উন্নতি সাধিত হলে সমগ্র মানব দেহের উন্নতি হবে এবং এর অবনতিতে সমগ্র মানব দেহেরই অবনতি ঘটবে।

এখন দেখতে হবে যে, ঐ অংশটির উন্নতির অর্থ কি? বস্তুত প্রতিটি জিনিসের উন্নতি বা অবনতি বিচার করা হয় এর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুষ্ঠুতার দ্বারা। তাই এখানে দেখতে হবে যে, বিবেকের উপর কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, বিবেক বলে যার নামকরণ করা হয়েছে, তার কর্তব্য হচ্ছে- সদাচার, সততা, সত্যতা ও আল্লাহর বশবর্তিতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নফসের মধ্যে যে অপশক্তি আছে, তাকে বশে এনে ফেরেশতার সদগুণাবলিতে পরিচালিত করা। অতএব, বিবেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও তাই হবে। এ মহান কর্তব্য পালনে বিবেক যতটুকু উন্নতি করতে পারবে, পূর্ণ মানবদেহটি ততটুকুই উন্নতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিবেক নিজের ঐ কর্তব্যে ত্রুটি করে নিজেই যদি প্রবৃত্তির বশ্যতা স্বীকার করে, তাহলে পূর্ণ মানবদেহই অবনতির তিমির গর্তে পতিত হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিশারদগণ বিবেকের উন্নতির পাঁচটি স্তর বর্ণনা করেছেন:

(১) আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যিকির করা।

(২) আল্লাহর মহৎ গুণাবলির ধ্যান করা এবং ঐ ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যে ঐ গুণের প্রতিবিম্ব হাসিল করা।

(৩) আল্লাহর গুণাবলির তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উম্মুক্ত করা।

(৪) আল্লাহর গুণে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে আল্লাহর আশেক ও প্রেমিকে পরিণত হওয়া এবং নিজের নফসের সব কু-প্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মানো এবং সেগুলো ফানা ও বিলুপ্ত করে দেয়া। অর্থাৎ সেগুলোকে পূর্ণরূপে দখল ও অধিকার করার সামর্থ অর্জন করা।
(৫) আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া, যাকে আল্লাহর খেলাফত লাভ বলে। এ অবস্থাতেই বিবেক ও আকলের পূর্ণশুদ্ধি হয়ে যায়। এ অবস্থার পরে আর বিবেককে কু-প্রবৃত্তির বশীভূত হতে হয় না।

রাসুলূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মানবের স্বীয় আকল ও বিবেককে সঠিক করার যে প্রেরণা দান করেছেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবাত্মার চরম ও পরম উন্নতির উচ্চ পর্যায়।

সহকারী অধ্যাপক: আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম ঢাকা
যুগ্ম-মহাসচিব: বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি

আত্মার উন্নয়ন ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রফেসর শাহজাদা সৈয়দ সফিউল গণি চৌধুরী

নবি-রাসুল ও অলীয়ে কামেলগণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বা হেকমতে সাধারণ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপযোগিতায় স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সময় এবং যুগের চাহিদার অনুকূলে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর জবানী বাণী এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবর্তিত ও উপস্থাপিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবনের জন্য এক নিখুঁত, সহজ ও সরল পন্থার প্রবর্তন করেছেন। বস্তুত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বাতন্ত্রের নিয়ামক তথা বেলায়ত রহস্য উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি তাঁর ত্রাণ কর্তৃত্বসম্পন্ন গাউছিয়তের উজ্জ্বল নিদর্শন। বর্তমান যুগের অতিকামনার হাঁড়ভাঙা খাটুনির যুগে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সহজসাধ্য অনুশীলনের কর্মপন্থা হিসাবে এই সপ্ত পদ্ধতি যুগপৎভাবে জাগতিক ও পরকালীন উভয় ক্ষেত্রে কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী নৈতিক ধর্মে জীবনদানকারী ধ্রুবতারারূপে পরিচিহ্নিত হতে পারে। মোট দুইটি স্তরে তথা বিনাশ-শক্তির নিয়ন্ত্রণে তিনটি পদ্ধতি এবং অর্জনের শক্তি সঞ্চারের চারটিসহ মোট সাতটি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মানবের রিপু সমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশোধনের মাধ্যমে নৈতিক শক্তিতে শক্তিশালী করার লক্ষে অনুশীলন পদ্ধতির দিগনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির অনুশীলন হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ এবং চতুর্বিধ মৃত্যুর সমষ্টিই হচ্ছে সপ্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। নফ্ছে ইনছানীর কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত করে রূহে ইনছানীর সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সর্বসাধারণের উপকারার্থে নির্বিঘ্ন বা সহজসাধ্য উপায় হিসেবে সপ্ত পদ্ধতিকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। এই সপ্ত পদ্ধতি সকল পন্থীর নিকট অনুশীলন যোগ্য বলে সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়ে আসছে। নিম্নে মানব জাতির আত্মশুদ্ধির লক্ষে হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত সপ্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিবরণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো-

ত্রিবিধ রিপুর বিনাশ বা ফানায়ে ছালাছা

১. ফানা আনিল খাল্ক বা আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া : ফানা আনিল খাল্ক বা আত্মনির্ভরশীল

হওয়ার অর্থ হল কারও কাছ থেকে কোনোরূপ উপকারের প্রত্যাশা না করা কিংবা এরূপ কোনো কামনা মনের মধ্যে পোষণ না করা। প্রকৃতপক্ষে কারো কাছে কিছু চাওয়া বা প্রত্যাশা করা ভিক্ষার মতো হীন কাজ। পরমুখাপেক্ষিতা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। মানুষের অন্তর্গত স্রষ্টা প্রদত্ত সহজাত শক্তি বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন মানুষকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতির জন্য আত্মনির্ভরশীলতার অন্য কোনো বিকল্প নেই।

২. ফানা আনিল হা'ওয়া বা অনর্থ পরিহার করা : ফানা আনিল হা'ওয়া বা অনর্থ পরিহার করার অর্থ হলো যা না হলেও চলে সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। অহেতুক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকলে জীবনযাত্রার পথ সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়। পবিত্র কুরআনের মতে, "যে কেউ অনর্থ পরিহার করে তার নিশ্চিত স্বর্গবাস হয়।" অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। এর অতিরিক্ত ভোগ-লালসা পৃথিবীর মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে। তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শনভিত্তিক গাউছিয়ত নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ হচ্ছে চাহিদার অতিরিক্ত সর্ব অনর্থ পরিহার করে শোষণহীন, সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ফানা আনিল এরাদা বা খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া : এর অর্থ হল খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া এবং নিজের ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যার ফলে সুফি মতে তসলিম বা রজা হাছেল হয়। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া কিংবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে কর্মবিমুখ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। হতাশা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়, চরম ঘৃণিত পাপকার্য আত্মহত্যার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। এতে সমস্যার কোন সমাধান হয় না, তাই সর্ব অবস্থায় খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে এবং খোদার ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে চরম ধৈর্য ধারণ করাই হচেছ প্রকৃত ঈমানদারের লক্ষণ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" একদা প্রচণ্ড তুফানে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র ঘরখানা পড়ে যাচ্ছিল। ঘরখানা যেদিকে হেলে পড়ছিল গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)ও ঘরটিকে সেদিকে ঠেস দিলেন। সবাই বলতে লাগলেন, ঘরখানা পড়ে যাচ্ছে, আর আপনি বাতাসের অনুকূলে ঘরখানাকে ঠেলে দিচ্ছেন, এটি আপনি কী করছেন? প্রত্যুত্তরে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী বলেন, "আল্লাহ যা চাচ্ছেন আমি তো তার বিপরীত কোনো কাজ করতে পারি না"। সুবাহানাল্লাহ! গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সর্বতোভাবেই।

মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু

১. মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু : নিজের মধ্যে সৃষ্ট কামনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য উপবাস ও সংযমের অভ্যাস করা। এর ফলে মনে আলো বা

উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, রমজানের রোজা বা নফল রোজা প্রভৃতি।

২. মউতে আছওয়াদ বা কাল মৃত্যু : সমালোচনাকারীর সমালোচনায়, শত্রুতায় এবং নিন্দুকের নিন্দায় রাগান্বিত না হয়ে ধীরস্থিরভাবে নিজের মধ্যে সমালোচনার, নিন্দা কিংবা শত্রুতার কারণ খুঁজে ওটা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানোর গুণ অর্জন করাই কাল মৃত্যু। নিজের মধ্যে সমালোচনার কারণ খুঁজে পেলে মানুষ দোষ-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পায় এবং খোদার কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। যদি আত্মবিশ্লেষণের পর নিজেকে নির্দোষ মনে হয় তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে একজন মানুষ বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়। অহেতুক সমালোচনায় ধৈর্যধারণ করলে সমালোচনাকারী দুর্বল হয়ে যায় এবং অনেক সময় শত্রুতা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং সমালোচনায় ধৈর্য্যধারণ করে আত্মবিশ্লেষণের নামই হচ্ছে কালোমৃত্যু। ধৈর্যশীলদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদের, যারা ঈমানদার এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া পুরষ্কার (সওয়াবই) উৎকৃষ্ট এবং এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী (ধৈয্যশীল)। [সূরা : কাছাছ্, আয়াত-৮০]

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবি-রাসূলের ওপর আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃতপ্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেজগার। [সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ১৭৭]

৩. মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু ঃ কামভাব ও লালসা থেকে মুক্তি প্রাপ্তিতে লালমৃত্যু অর্জিত হয়। কামভাব ও লালসা মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেয়। ধর্ষণ, গুম, হত্যা প্রভৃতি লালসার কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। কামভাব ও লালসাকে দমন কিংবা ধ্বংস করতে পারলে লাল মৃত্যুর গুণ অর্জিত হয় এবং দমনকারী ব্যক্তি অলিয়ে কামেলের পর্যায়ভুক্ত হন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সম্মুখিন হওয়ার ভয় রাখতো এবং নিজ প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখতো। জান্নাতই হবে তাঁর আশ্রয়স্থল। [সূরা ঃ নাযি'আত, আয়াত ঃ ৪০-৪১]

৪. মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু (নির্বিলাস জীবনযাপন) ঃ নির্বিলাস জীবনযাপনের ফলে মানব অন্তরে স্রষ্টার প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া অন্য কামনা থাকে না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু বর্জন করলে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। এটা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, তথা প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে নির্বিলাস সভ্যতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বিলাসবহুল জীবনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে অতিচিন্তা, অতিশ্রম, অতিব্যয়, জুলুম, অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলাদলি, ঝগড়া, কলহ প্রভৃতি অশুভ প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে যা মানুষকে বিপদগামী করে তোলে, পারিবারিক তথা সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করে এবং জাতিকে অনিশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দেয়। নির্বিলাস জীবনযাপনের ফলে ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, সুবিচার, অন্যায় বর্জন, খোদা-ভীতি, খোদার ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি গুণ অর্জিত হয়ে জীবন শান্তিময় হয়। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অনর্থক কাজকর্মে সময় নষ্ট করতেন না। তিনি অপচয় বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরুষের রেশমী কাপড় পরিধান, মেয়ে লোকদের অলঙ্কার পরিধান ও নাক-কান ছেদন করা মোটেও পছন্দ করতেন না। ব্যবহার ও ভোগ না করলে চলে এমন কোনো সামগ্রী ব্যবহারে তিনি দারুণ অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি দুনিয়াকে বলতেন, 'দারুন হোজন' বা চিন্তাপুর্ণ দুঃখের খনি। এরশাদ হচ্ছে-"অমা-হা-যিহিল হাইয়া-তুদ্দুনিয়া-ইল্লা লাহওয়া লায়িব; অ ইন্নাদ দা-রাল্ আ-খিরাতা লাহিয়াল হাইয়াওয়া-ন। লাও কা-নূ-ইয়্যা'লামূন"। [সূরা ঃ আ'নকাবুত, আয়াত ঃ ৬৪] অর্থ- এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতিত কিছুই নয়। পরকালের জীবনইতো প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। পবিত্র হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) বলেন "আদ্দুনিয়া সেজনুল মু'মিনিন"। অর্থাৎ দুনিয়া হলো মু'মিনের জন্য কারাগার স্বরূপ। এ জন্য মুমিনগণ দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হা-হুতাশ করে থাকেন। কারণ আল্লাহ হলেন মুমিনের পরম বন্ধু। পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পরম প্রশান্তি। তাই নির্বিলাস জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়।

পবিত্র কুরআন শরিফের বিভিন্ন আয়াতে সাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে - যা উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির 'সাত'এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে - "হু অল্লাজী খালাকা লাকুম মা-ফিল আরদ্বি জামী'আন ছুম্মাস্তাওয়া-ইলাছ্ ছামা-ই ফাছাওয়্যাহুন্না ছাব'আ ছামা-ওয়াত; অহুআ বিকুল্লি শাইয়িন আলীম। [সূরা : বাকারা, আয়াত-২৯]

অর্থ ঃ তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের দিকে। বস্তুতঃ তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত। এরশাদ হচ্ছে-

আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহা সর্বশক্তিমান। [সূরা ঃ তালাক, আয়াত-১২]

ব্যক্তি নিয়েই পরিবার, সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্র। তাই আমরা যদি উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে জীবন যাপন করি তাহলে আত্মার উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সুন্দর ও সুখময় একটি সমাজ বিনির্মাণ করতে পারবো। ইনশাল্লাহ্। হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র পবিত্র বাণী- "হাশরের দিন প্রথম বলিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আমরা যেন সেই দিন হাশরের ময়দানে লেওয়ায়ে আহমদীর পতাকা তলে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র আশেক ভক্তগণের সাথে শামিল হতে পারি সে প্রার্থনা করছি কায়মনো বাক্যে।

সুফি কবির ভাষায় -

যেদিন হাশর হবে, আমরা কি করিব তবে।
আর্শে বসি দেখি রবে, ত্রিজগতের করতার।
হালকা বন্দী করি সবে, নাচিতে নাটুয়া হবে।
চৌদিকে বেড়িয়ে রবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডার।
নূরের কান্দিল তাতে আমরা সব নিয়ে হাতে।
সম্মুখে গাহিব গান, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডার।।
তাহার দামানে হাত, দিয়ে আমরা একসাথ।।
নূরের বিজলী ছটে পুলছেরাত হব পার।।

পরিশেষে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র ১১৪ তম পবিত্র বার্ষিক ওরশ শরিফের ফয়ুজাত, রহমত, নেয়ামত ও বরকত কামনা করছি। আমিন।।

তথ্যসূত্র ঃ * কোরআন শরিফ * হাদিস শরিফ * বেলায়তে মোত্লাকা-অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) * কাওকাবুদ দুররী-প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী * এবং অন্যান্য।

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক
গবেষক, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থপ্রণেতা

সুশিক্ষা ও নৈতিকতা অর্জনে উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা

মেজবাউল আলম শৈবাল

সুশিক্ষা ও নৈতিকতা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। মানবিক নৈতিকতা অর্জন করাই সুশিক্ষার প্রধান লক্ষ। নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা মানুষকে অন্তরের চিন্তায় এবং বাহিরের কর্মে পরিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা দান করে। নৈতিকতার চর্চা একজন সাধারণ মানুষকে নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শবান, মানবতা অর্জনকারী পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। যে শিক্ষা মানুষকে ভালোবাসতে শেখায় না, যে শিক্ষা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখায় না, যে শিক্ষা আত্মনির্ভরশীল না হয়ে পরনির্ভরশীল হতে শেখায়, যে শিক্ষা অনর্থ অপচয়ে লিপ্ত থাকাকে উৎসাহিত করে, যে শিক্ষা স্রষ্টার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে শেখায় না, বরং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শেখায়; লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা, আর প্রতিযোগিতা আড়ম্বরতার চর্চা শেখায়- এর সবই কুশিক্ষা, যা মানুষকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে ফেলে।

মওলানা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, "তুমি ফেরেশতা এবং পশু এই উভয় স্বভাবে স্বভাবিত। পশুর স্বভাব হইতে মুক্ত হও; ফেরেস্তারও উর্ধ্বে যাইতে সক্ষম হইবে"। (বেলায়তে মোত্লাকা -পৃষ্ঠা:৭০)।

শিক্ষা এবং নৈতিকতা- উভয়ের জন্যই শিক্ষক এক অনিবার্য বিষয়। শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা ও নৈতিকতা- উভয়ই অচল। তাই শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রশ্নে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। শিক্ষক, শিক্ষা ও নৈতিকতা- এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কোনো জাতির সভ্যতার চূড়া। শিক্ষা সৃষ্টিশীল। শিক্ষার প্রয়োজন সার্বজনীন, বিশ্বময়। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে শিক্ষার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়েছেন-

* দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার"।
* কান্টের মতে, "আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জনই শিক্ষা"।
* জন ডিউইর মতে, "আত্মোউপোলব্ধিই হলো শিক্ষা"।
* জন লকের মতে, "সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের সৃষ্টি হলো শিক্ষা"।
* হাবার্ড রীডের মতে, "মানুষকে মানুষ করাই শিক্ষা। স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য সম্যক উপলব্ধি করতে যা সাহায্যে করে তাই শিক্ষা"।
* দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা দেহ ও মনের সুষম এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত মাধুর্য এবং পরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে"।

'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে EDUCATION যার প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার এক সামগ্রিক অর্থকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশ্লেষণটি নিম্নরূপ-

EDUCATION

E-Enlargement of mind (মনের প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতার অবসান) U-universal look (সার্বজনীনতা)	ফানা আনিল খাল্ক
C- Characterization (নৈতিক চরিত্র গঠন) D- Discipline (শৃঙ্খলা)	ফানা-আনিল হা'ওয়া
A- Activities (শিক্ষার প্রয়োগ বা কর্ম চাঞ্চল্য)	ফানা আনিল এরাদা
I-Idealism (আদর্শানুরাগ)	মউতে আবয়্যাজ-সাদা মৃত্যু
T-Truth worthiness (সত্যানুরাগ)	মউতে আছওয়াদ-কালো মৃত্যু
N- Nice tempered and calm soul (মেজাজের ভারসাম্য ও প্রশান্ত আত্মা)	মউতে আহমর-লাল মৃত্যু
O- Omniscist (প্রজ্ঞার প্রকাশ)	মউতে আখজার-সবুজ মৃত্যু

ফানা আনিল খাল্ক চর্চায় (Enlargement/Universal look অর্জন হয়)

মানবিক চিন্তার প্রশস্ততা বাড়ানোর মাধ্যমে সংকীর্ণতার অবসান ঘটাতে হবে। পরনির্ভরশীলতা পরিহারের মাধ্যমে একজন মানুষ আত্মোপলব্ধি অর্জন করতে পারে। একজন ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য (universal look) সার্বজনীনতা অর্জন করতে পারে এবং ঐ ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে "আদলে মোত্লাক" বা বিচার সাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

ফানা-আনিল হা'ওয়া (discipline-শৃঙ্খলা)

জীবনের সর্বস্তরে তথা পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তি হওয়া অত্যাবশ্যক। মানব জীবনে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে M.k.Gandhi বলেছেন-

"Discipline maintains system
system maintains development
development vibrates human life
so discipline must be followed."

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়ার ২য় নীতি 'ফানা আনিল হা'ওয়া' চর্চার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার মৌলিক কাজ Discipline এবং Characterization অর্জন করতে পারি, যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম, কথাবার্তা হতে বিরত থাকলে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়, যা ব্যক্তিকে চরিত্রবান পারিবারিক শান্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

ফানা আনিল এরাদা (Activities কর্ম চাঞ্চল্য/শিক্ষার প্রয়োগ)

আমাদের যাপিত জীবনের (Activities) কর্ম এবং চিন্তাধারাকেই পরিশুদ্ধ করতে হলে খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং নিজ ইচ্ছা কামনা-বাসনাকে খোদার ইচ্ছার কাছে বিলীন করতে হবে।

"মরীচিকাবৎ ক্ষণভঙ্গুর সৃষ্টি অনুরাগ, মানবকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করিয়া দুঃখ কষ্টে নিপতিত করে। স্রষ্টানুরাগ মানবকে বিভ্রান্তি ও দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি দেয় এবং তাহার আসল বস্তু স্রষ্টার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়"। (বেলায়তে মোত্লাকা পৃষ্ঠা: ৮০)।

সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হক (মদ্দাজিল্লুহুল আলি) এঁর বাণী

"পরম করুণাময় আল্লাহ সমস্ত কিছুর খালেক; আমরা সবাই তাঁর সৃষ্টি-মাখলুক, মাখলুকের জন্য যা মঙ্গল তাই তিনি করে থাকেন। স্রষ্টার ইচ্ছাতে রাজি থাকাই হলো তছলীম ও রজা"।

মউতে আবয়্যাজ : সাদা মৃত্যু/White death (Idealism-আদর্শানুরাগ)

অধিকারলব্ধ বৈধ কাজে সংযম অবলম্বন করা তাকওয়া। স্রষ্টা ভয় অন্তরে ধারণ করার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আর্দশ স্থাপন করতে পারি। উপবাস এবং সংযম অবলম্বন করলে মানব মন আলোকিত হয়। মহাত্মা গান্ধী কোনো জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য উপবাস ও সংযম পালন করতেন।

মউতে আছওয়াদ : কালো মৃত্যু/Black death
(Truth worthiness-সত্যানুরাগ)

যা সত্য তা মেনে নেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করা নিজের মধ্যে। কেউ দোষ দেখিয়ে দিলে তাকে বন্ধু মনে করার মাধ্যমে নিজে সত্যানুরাগী হয়ে আদর্শবান হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রাত্যহিক জীবনে কেউ আয়নাকে শত্রু মনে করে না। কারণ সে সত্যকে প্রকাশ করে। আমাদেরকে বাহ্যিকভাবে পরিপাটি হবার এবং নিজেকে নিজে চেনার সুযোগ করে দেয়। চোখ বন্ধ করে ভাবুনতো, পৃথিবীতে যদি কোনো আয়না না থাকতো, তাহলে আমরা কি নিজেদেরকে নিজে চিনতাম? আমরা কি বুঝতে পারতাম, আমি দেখতে কেমন? তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আয়না আমাদের বন্ধু। অনুরূপভাবে যদি আমার সমালোচনাকারীকে শত্রু নয়, বন্ধু মনে করি, তাহলে নিজেকে শুদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি।

মউতে আহ্‌মর : লাল মৃত্যু/Red death
(Nice tempered and calm soul-মেজাজের ভারসাম্য ও প্রশান্ত আত্মা)
লাল মৃত্যু অর্জনের মাধ্যমে কাম, লোভ, লালসা থেকে মানুষ মুক্ত হয় এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। নৈতিকতাপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় যা সমাজে, পরিবারে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে প্রভাব ফেলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, সেই দিন প্রশান্ত আত্মাকে ডেকে বলা হবে, 'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'।

মউতে আখজার : সবুজ মৃত্যু/Green death (omniscist-প্রজ্ঞার প্রকাশ)
নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেই এটি হাছিল হয়। যার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালোবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকেনা। নির্বিলাস জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তিরাই প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

EDUCATION শব্দটি বিশ্লেষণ এবং উছুলে ছাবয়ার এর সাথে সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যে, কীভাবে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কেবলার প্রবর্তিত সপ্তকর্ম পদ্ধতি শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

অছি-এ-গাউছুল আজম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর ভাষায় বলতে হয়, "এই সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করিয়া এবং পরের দুঃখ-কষ্টের কারণ না হইয়া বরং বন্ধু সুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়। বিশ্বসভ্যতা যেভাবে কামনা, বাসনা, অনর্থ অপচয়ের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তৎমুক্তির জন্য এই সুফি সভ্যতার নীতি মালা সপ্ত পদ্ধতি অনুসরণ অনিবার্য"। (বেলায়তে মোত্‌লাকা, পৃষ্ঠা: ৭১,১১১)।

প্রভাষক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
নানুপুর লায়লা কবির বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মউতে আহ্‌মর বা লালমৃত্যু উছুলে ছাবয়ার (সপ্তকর্ম পদ্ধতি) অন্যতম সাধন পদ্ধতি

মুহাম্মদ আলী আছগর

বিশ্ব আজিমের ত্রাণকর্তা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া মানব আত্মার উৎকর্ষ সাধনে অন্যতম সাধন পদ্ধতি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যে কেউ এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি চর্চা করলে, নিশ্চিতভাবে তার আত্মার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হবে। সব মানব আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং সবাই একই পিতা-মাতার সন্তান। হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) আমাদের আদি পিতা ও হযরত মা হা'ওয়া (আলাইহাস্ সালাম) আদি মাতা হিসেবে আমাদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্বীকৃত। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী আমরা সৃষ্ট এবং তাঁরই ইচ্ছায় আমাদেরকে এই পৃথিবীতে আসতে হয়েছে। আর তাঁরই ইচ্ছাতেই তাঁর দিকে আমরা প্রত্যাবর্তিত হবো। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদেরকে পুনরায় ফিরে যেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় আমরা সেই মঞ্জিলে মাকছুদে পৌঁছতে পারব না এবং এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন-যাপন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পবিত্র কুরআনে প্রাগুক্ত বিষয়টির কথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে- 'যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে'। (সূরা আশ-শো'আরা, আয়াত-৮৮-৮৯)। আত্মাকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা। আর প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার জন্য কামভাব ও লোভ লালসা পরিত্যাগ অপরিহার্য। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত উক্ত উছুলে ছাবয়াতে উক্ত বিষয়টিকে মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লালবর্ণ বা লালবস্তু সাধারণত বিপদ সংকেতকে নির্দেশ করে। যে কামভাব ও লোভ-লালসাকে বশীভূত করতে পারেনি, তার ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে কামভাব পরিহারকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আর ওই ব্যক্তি, যে আপন রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে এবং নফ্‌সকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে। তবে, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা। (সূরা আন নাজিয়াত, আয়াত-৪০-৪১)' পবিত্র হাদিস শরিফেও উক্ত বিষয়টি অনুরণিত হয়েছে। যেমন রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার উভয় চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান (রসনা) ও উভয় পায়ের মধ্যবর্তী স্থান (লজ্জাস্থান) সংরক্ষণের জিম্মাদারী নেবে, আমি তাঁর জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী নেব'। (বোখারী শরিফ)।

কামভাব ও লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হতে পারলে বেলায়ত অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়। আর লোভ-লালসা মানুষকে অতিরিক্ত চাহিদার প্রতি ধাবিত করে, অতিরিক্ত অর্থ লিপ্সার কারণে মানুষ অন্যায় পথে উপার্জনের পথ বেছে নেয়। এতে তার

নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। লোভ মানুষের পরম শত্রু। লোভ মানুষকে অন্ধ করে তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষ নিজের ভোগের জন্য যখন কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে তাকে লোভ বলে। তখন যা নিজের নয়, যা পাওয়ার অধিকার তার নেই, তা পাওয়ার জন্য মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। সে তার ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলতে চায়। লোভের মোহে সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ সব বিসর্জন দেয়। তার ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পায়। সে পাপের পথে ধাবিত হয়। নিজের স্বার্থের জন্য সে অন্যের সর্বনাশ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না। এভাবে লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে। ডেকে আনে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিণাম। তাইতো বলা হয়, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'। তাই কামভাব ও লালসা মুক্ত হতে পারলে মানব চরিত্র পরিশোধনের পথ অনেকটা সহজ হয়। কামভাবের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য রোজা রাখার নির্দেশ রয়েছে পবিত্র হাদিস শরিফে। কারণ রোজা রাখার ফলে নফ্স দুর্বল হয়ে যায়। যার ফলে কামভাব নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। রোজার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপকার্য থেকে বিরত থাকা। তাই যে কোনো পাপকার্য থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মুরীদদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর উক্তি থেকে প্রতীয়মান, যেমন তিনি বলেন, "আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে।" (সূত্রঃ বেলায়তে মোত্লাকা)। লোভ-লালসা পরিহারের জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, "এবং সেটার লালসা করো না, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"(সূরা নিসা, আয়াত-৩২)। লোভ লালসা ঈমান ও আমলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) লোভ-লালসাকে সর্বদা দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণার উপকরণ বলে উল্লেখ করে বলেছেন, 'ঈমান এবং লোভ এক অন্তরে একত্র হতে পারে না। কেননা, ঈমানের পরিণাম হচ্ছে ধৈর্য, সহনশীলতা ও অল্পে তুষ্ট থাকা। আর লোভ-লালসার পরিণাম হচ্ছে অশান্তি, ধৈর্যহীনতা ও অস্বস্তিবোধ।' (নাসাঈ ও তিরমিজি)

ইসলাম লোভ-লালসাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন, 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এ জিনিস তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং পরস্পর রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উস্কে দিয়েছে। আর এই লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে' (মুসলিম)। লোভের কারণে মানুষ অতিরিক্ত ভক্ষণ করে। যার ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মৃত্যুবরণ করে। ধৈর্য ও অল্প তুষ্টির গুণ থাকলে লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর লোভ পরিহারপূর্বক পরিমিত ভক্ষণ করলে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা চাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। কেননা বান্দার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে, তার অতিরিক্ত সে পাবে না'। (হাকিম)

কামভাব ও লোভ-লালসা পরিহার করতে পারলে ইনসানে কামেল হওয়ার পথ সুগম হয়। পবিত্র হাদিস শরীফে মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করার নির্দেশ এসেছে। অর্থাৎ কামভাব ও লোভ-লালসা পরিহারপূর্বক পাপকার্য বিরত থেকে জীবন যাপন করতে পারলে মৃত্যুর আগে মৃত্যুর স্বাদ অর্জিত হয়। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়ার অন্যতম হলো মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু। তিনি একে আহ্‌মর বা লাল শব্দ প্রয়োগ করে আখ্যায়িত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য লোভ-লালসা ও কামভাব অত্যন্ত ভয়ানক। একে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ঈমান ও আমল বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই স্তর অতিক্রম করতে পারলে বেলায়ত তথা খোদার নৈকট্য অর্জিত হয়। অতএব, আমরা যেন গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়ার ওপর আমল করতে পারি, মুনিবের দরবারে সেই প্রার্থনায় রইলাম।

প্রভাষক
দিলোয়ারা জাহান মেমোরিয়াল কলেজ
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
এমফিল গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

The Seven Ascetic Methods: an Umbrella over Western Literature and Society

Muhammed Wahid Manjur

Allah, The Almighty Lord, created us with an ultimate reasoning purpose of making ourselves into the category of an u'boodiyya. The world, specially the modern ,civilized and capitalized, is necessarily abundant with the materialistic and spurious desires, making us chase those and ceasing to think of spiritual, moral and factual reason behind the Almighty's will. In this fury and tempestuous world with the time spans, to serve the God's will, the founder of the Maizvandari Tariqa, the supreme ascetic , Shah Sufi Sayed Ahmadullah Maizvandari (R) prescribed the seven ascetic methods rudimentarily based on the Quranic and prophetic traditions to elevate human status through illuminating the straight path to the world, either the Western or Eastern. However, those seven ascetic methods have a universal appeal across the world literature and society: the Elizabethan, Victorian, Romantic and Modern writers indirectly and disparately remind people of those ways which bring solace of mind and provide safety from moral decadence. Moreover, these methods have been categorized into two: the first three have been classified as 'Fana" which means annihilation and the other four represent 'Maut' that means spiritual death of nafsaniyyat.

(1) Fana Anil Khalak- Annihilation from creations

With self spiritual meditation, self-reliance is achieved. In the order of priority of inner-self, the first principle of Maizvandari Philosophy is to be self-reliant. It demostrates universality as the American transcendentalist , philosopher and essayist, Ralph Waldo Emerson (1803-1882), called the people by

writing ‘’Self-Reliance", an essay of 1844. Emerson wrote on “individualism, personal responsibility and nonconformity, and breathing new life into the old forms of their religion. However, he focuses and consistently relates back to one major theme: "Trust thyself’’ which annihilates an individual into ‘self’ with an eradication of impersonal responsibilities and nonconformities. Similarly, Matthew Arnold (1822 - 1883) ,an English poet and critic, also highlights the recurring themes of man’s lonely state and of a search for an inner self and self dependent through his famous poems, ‘’Self dependence’’ and “ The Scholar Gipsy”.

‘’O air-born voice! long since, severely clear,

A cry like thine in mine own heart I hear:

"Resolve to be thyself; and know that he,

Who finds himself, loses his misery!"

(2) Fana Anil Hawa- Annihilation from meaninglessness:

To avoid doing useless and unimportant things like talks, acts, behaviors etc, relates to the annihilation of this stage. If a seeker follows this principle in letter and spirit, his life will become feasible and anxiety-free. The Western scholars always emphasize the method wittingly which leaves an existent application in their society. To make a seeker’s every moment purified, primally, he/she needs to give up doing any useless things or anything unimportant. According to Stephen R. Covey, an American educator and author, to live a more balanced existence, you have to recognize that not doing everything that comes along is okay. There's no need to overextend yourself. All it takes is realizing that it is all right to say’ no’ when necessary and then focus on your highest priorities (The 7 Habits of Highly Effective People).

"Putting first things first means organizing and executing around your most important priorities. It is living and being driven by the principles you value most, not by the agendas and forces surrounding you.’’

Maizvandari Tariqa prescribed this issues with a divine splendor that any meaningless or useless acts will waste your time to progress and will create a camouflage in this world of imbroglios. A seeker's every moment should be undeniably utilized to bring the gem like Godly mystery into light of knowledge.

(3) Fana Anil Erada- Annihilation from Own Will:

To surrender completely with the will of Allah, having no self desire is the third method in Maizvandari Sufism . Through this annihilation, a seeker annihilates in the essence of Allah which brings about attainment only through surrendering his will into God's will. This is abundantly explored in the literature and different religions in the Western society either. In all testaments, psalms and many poetic and prosaic traditions, this method is reflected through ages. Gerard Manley Hopkins (1844–1889), one of the greatest poets of the Victorian era, in his poetry like "God's Grandeur" and "The Handsome Heart", established a man's communion with Creator, God, through Nature, more rigorous than a catholic, surrendering everything to the will of God and thus human can get attached to God. Donne and Milton followed this way either.

Here sacrifice of own wills get annihilated to soar above the ocean of ultimately supreme will. This method will make an individual more indestructible with no procrastination in the life of dilemma.

(4) Mout-E- Abyeaz- White Death:

Practicing willingly self-restraint over legitimate and possessing things, and controlling oneself from sins and ominous things to protect self , which destines a seeker to the enlightened mystic world through the White Death. It is very surprising that , in English literature, white is metaphorically meant as death in some extent as well as it represents innocence and purity, as in almost all other applications of color. However, this method appears to be practiced in West

particularly who follows ascetic life whether Christians, Jews or gypsies with fasting. It is reflected in the Bible. When the disciples of Jesus, asked him how to cast the evil spirits away, he is reported to have said, "But this kind never comes out except by prayer and fasting." (Matthew 17:21)

(5) Mout-E-Aswad- Black Death:

Inculcating self-criticism, self-purification, restraining vindictiveness and retaliation, controlling rage, and accepting easily the criticism made by others demonstrates the Black Death in Maizvandari Sufism. Through this method, a seeker can reflect on his faults and sins and amend himself ; he can exchange his enemy into a friend. However, black resembles mysterious and protective and it relates to the hidden, the secretive and the unknown. As a result , it creates an air of mystery. The color black symbolizes suffering and death in the Bible. It is widely used to represent mourning (Job 30:28, 30, Jeremiah 14:2). Moreover, similarly, a seeker/Sufi accepts his criticism, ponders and mourns over (Tauba), thereby, receives his black death.

(6) Mout-E-Ahmar- Red Death:

Controlling greed, covetousness, sex-impulse and extincting sexual lust, and regulating oneself to internal and external discipline brings a seeker to the Red Death. In the west, red is frequently used as a symbol of guilt, sin and anger, often as connected with blood or sex. A biblical example is found in Isaiah: "Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow." Also, The Scarlet Letter, an 1850 American novel by Nathaniel Hawthorne, features a woman in a Puritan New England community who is punished for adultery with ostracism. In Roman Catholicism, red represents wrath, one of the Seven Deadly Sins. In Christianity, Satan is usually depicted as colored red. However, If anyone attains Red Death , he may belong to the class of saints.

(7) Mout-E-Akhjar- Green Death:

Observing absolute austerity, showing gratitude and thankfulness,

avoiding extravagance and leading a simple pellucid life free from foppishness happen a seeker to Green Death. This is the final method which elevates a seeker to a saleq (an ascetic status) that brings an eternal joy and ultimate destination and victory in Sufism. In English society and West, This green profoundly represents feelings of refreshment and fertility and life. William Blake's 'The Ecchoing Green', Andrew Marvell's, 'The Garden', William Wordsworth's, 'The Green Linnet' represent the color, Green as a symbol of joy, Even Emily Dikinson's 'The Color of the Grave is Green' develops into a meditation on death:

"The Color of the Grave is Green/
The Outer Grave – I mean/
You would not know it from the Field/
Except it own a Stone/"

To conclude, the institutional founder of Maizvandari Sufism and Tariqa, Waschiye Gauchul A'zam, Maulana Delwar Hossain Maizvandari (R) says, " If Maizvandari Sufism is preached in the world, the world humanity will turn her face to Maizvandar." It seems crystal clear that Maizvandari Tariqa and Sufism, if it spreads, will knit a universally brawny relation across the globe since it underlies a lofty, purified, and pluralistic ism which will umbrella the whole humanity.

MA in Hadith, BA (Hons), MA in English,
MS (TESOL), University of Western Sydney.
Trainer & Assessor (TAFE)
Lecturer: Global English College, Sydney, Australia

Belayet-E-Mutlaka and Usul-E-Saba: Some preliminary observations

Mehedi Hasan

Introduction

Bangladesh has an intrinsic relation with Islam and in this case, her historical experience is extra-ordinary. The experience is infinitely complex and creative in nature that unfolds an encounter between basic religious principles and the necessity of time and space, the ideal and the actual. In the encounter, the centre of gravity lies in the charisma and role of medieval sufis. For historians, Islam in Bangladesh is 'the gift of the sufis'. Significant researches have been done on the role of sufis and their tariqas in consolidating medieval Muslim society of Bengal (Dani: 1956, 1964, 1997; Karim: 1959; Rahim: 1963, 1967; Khan: 1960, 1992, 2008; Ali: 1985) and in exploring new agrarian frontiers (Eaton: 1993). But, no systematic attempt has yet been taken to assess a contemporary sufi tariqa in relation with the dynamics of modern Bangladeshi society.

Maizbhandari Tariqa

Maizbhandari Tariqa is one of the well-known and important sufi tariqas of modern Bangladesh. It has an unknown and myriad number of active devotees and supporters across the world (Alam: 2012). Like any other sufi tariqa of local nature, it was moulded in a particular milieu with deep Islamic underpinnings. Naturally, a systematic inquiry into such a tariqa's nature and crystallization in which it got to be expressed or came into being will form a subject of profound interest to the students of social history, sociology, anthropology and religious studies.

Phases of its history

Existing literatures on Maizbhandari reveal that the tariqa has experienced four potential phases with its four great saints. First one started by the formal preaching of Gasulazam Shah

Sufi Syed Ahmad Ullah (1826 C.E.-1906 C.E.) as an alim in 1858 C.E./1276 Hijri in the interior of Chittagong. In an unfavourable time for spiritual enlightenment, this phase was marked with his struggle and conflict with Deobandi Ulema Tradition. Another trajectory revolves round the personality of Gasulazam Shah Sufi Syed Golamur Rahman (1865/66 C.E.-1937 C.E.). During his time, the tariqa spread rapidly all over Bangladesh.The flowering of Maizbhandari songs was a significant achievement at that time. Moulana Shah Sufi Syed Delwar Hossain (1893C.E.-1982C.E.) and his lifelong services to the Darbar Sharif marks the third phase chronologically. He is also remembered for his scholarly bent and known especially for his written works developing Syed Ahmad Ullah's ideas and expounding the tariqa's 'theosophy', i.e. Belayet-E-Mutlaka or the 'Maizbhandari School of Thought', as it is regularly called. The overwhelming Shahanshah Shah Sufi Syed Ziaul Haq (1928 C.E.-1988 C.E.), the eldest son of Moulana Shah Sufi Syed Delwar Hossain, with ecstatic charisma and performance of miracles (keramat) and his services to humanity point to the culmination of a long process. Another son Syed Emdadul Hoque (1936 C.E-) was appointed as Nayeb-E-Montajem and Sajjadanshin in 1974 C.E. by Moulana Shah Sufi Syed Delwar Hossain. His tariqa activities represents an attempt which has been focusing in making the tariqa within the parlance of Islamic tradition of discursivity cum embodiment, of humanitarian and welfare oriented praxes.

A Discursive tradition: the relationship with the Quran and the Sunnah

In the historical phases discussed above, we observe that the practices and discourses of the tariqa are partly constituted by the continuous argument over what it means to be correct in contradistinction with incorrect ones. It is found to be in conflict with other argumentative retelling from both within and without. These are conceptually articulated with an exemplary past and dependent on an interpretative engagement with a set of foundational texts, i.e. the Quran

and the Sunnah. The articulations are visible through a milieu and they are in constant engagement with other practices, institutions and social conditions. Consequently, it appears that the future of the tariqa was being shaped how the point of practices and discourses can best be secured in the short and long-term or why the point should be modified or abandoned. Thus, the characterization of every phase marks foundational continuity and necessary rupture cum shifts.

Literature Review

There are studies on Maizbhandari Tariqa that relate the issues of the nature of Islam in Bangladesh -the question of the relationship between so-called 'esoteric' and 'exoteric' interpretations of Islam and the spiritual methods cum ritual practices of the tariqa.

According to Bertocci (2006), Bangladesh, no less than other Islamic societies, displays a range of Muslim voices (or 'multivocality' [Wilce 1998]) and offers a rich setting where the negotiation of multiple religious identities is observed. Among them a sufi-derived, magico-mystical movements like the Maijbhandari face the greatest challenge of legitimacy; because, to the Shari'a-focused Muslims they represent a confrontation with Islamist versions of orthodoxy.

He discussed the major figures of the tariqa, their shrines and contested silsilas. He has agreed on the general consensus about the catalytic role of four great saints in crystallizing the tariqa. But, according to him, among the Maizbhandaris, there are at least two major rival lines of spiritual authority, the Ahmadiya (Ahmad Ullah's direct descendents) and the Rahmaniya (the descendents of Golamur Rahman), and these silsilas run the main (and rival) administrative organizations (manjil) .He also points out that the founders of the Maizbhandari Tariqa developed a fairly elaborate 'Seven Step' (Usul-E-Saba or sapta paddhati) methodology for the attainment of their views of spiritual perfection. Every basic written description of it indicates that it is a unique contribution to the world's body of spiritual knowledge. But for

Bertocci, it would appear to correspond broadly with traditional, well-known sufi mystical and theosophical notions and in that regard it seems unexceptional.

Lauri Harvilahti (2010) points out that the most important feature of the doctrine (of Sufism!) is the esoteric knowledge of the Quran called marifat. The Indian conception of tawhid is different from the original Islam, but it is made compatible with local folk beliefs. In the Sufism of Indian sub-continent, the human soul may reach the divine soul in fana, absorption of the self into the divine. Their religious concept- based on inner, mystic experience, which strongly emphasizes the veneration of the deceased and living pirs (religious leaders) and divine mediators- is in contrast with the literal interpretation of the Quran.

To Harvilahti, Sufism is perfectly alive and well in Bangladesh and its influence (contrary to what is claimed by R. A. Banu) extends not only to the illiterate folk supporters in the countryside, but also to the highest levels of social hierarchy, and through them, to the forms of 'high culture' adopted in the national identity. The influence of Sufism is also reflected in an interesting way in Bangladesh's current socio-political situation. He has also discussed seven methods of Maizbhandari practices. According to him, a list with seven methods is brief if one compares it with, for example, Abu'l-Qasim al-Qushairi's catalogue of forty five maqams, and countless other similar sorts of detailed instructions and rules, but the central tenets are the same as those normally encountered in Sufism, as well as in the broader mystic tradition. He also proposes that it is not possible to identify a single developmental trajectory for the Maizbhandhari Tariqa because the Sufism of Maizbhandar Sharif has received influences from countless quarters.

The most significant achievement of the both researches is that they reverse the common view of judging the popular sufi brotherhoods and saintly figures. Until recently, the common view has been that the popular sufi brotherhoods and saintly figures are basically a part of folk religion of illiterate believers

in the Little Tradition of rural village societies. On the contrary, in their researches it is revealed that the Maizbhandharis not only belong to both rural and urban population but also they exercise a great influence on the country's current socio-political situation.

Observations on the literature

From the above brief review of literature, the deficiencies mentioned below would be observed.

(1) It is quite evident that the Maizbhandari Sufi Tariqa has not been studied so far in an integrated and coherent manner.

(2) Rather, in exploring typological relationship between 'esoteric' and 'exoteric' interpretations of Islam, much emphasis has been laid upon the oppositional relationship between the two while studying the Tariqa.

(3) The concept of sainthood as conceived by the Maizbhandari Sufi Tariqa known as Belayet-E-Mutlaka in relation with Belayet-E-Mukhaiyida has been dealt but not with due attention. To a cursory observation, it is quite clear and evident that the discourses on the tradition of Welayet/ Belayet (Sainthood) has been reconfigured in the Maizbhandari Sufi Tariqa by estimating the role of Gasulazam Shah Sufi Syed Ahmad Ullah (R.) with that of his spiritual brother Sheikh Muhiuddin Abdul Kader Jilani (R.). This particular concept of sainthood would also be studied in comparison with Al-Hakim Al-Thirmidhi's exposition on the concept of sainthood.

(4) From the researches reviewed above, both the authors' adoption of the theoretical lens and techniques were not sufficient enough to give a 'thick description' of the dynamics of the Tariqa. Especially, it has become evident regarding their treatment of the elaborate 'Seven Steps' (Usul-E-Saba or sapta paddhati) methodology for the attainment of Maizbhandari view of

spiritual perfection. They simply have considered Usul-E-Saba or sapta paddhati as corresponding "broadly with traditional, well-known sufi mystical and theosophical notions" or 'a list with seven methods' (To Harvilahti, it "is brief if one compares it with, for example, Abu'l-Qasim al-Qushairi's catalogue of forty five maqams, and countless other similar sorts of detailed instructions and rules"). It is our observation that Usul-E-Saba or sapta paddhati consists of practices related with 'external behavior' and 'internal dispositions' that help to cultivate 'virtues' in the widest sense of the term. A discursive aspect of it can also be deduced that would point to the changing nature of the Sufi Tariqas in a time of change. It also reveals the long time contested nature of Islamization in nineteenth century Bangladesh particularly which has been attached with the tradition of Maizbhandaris.

(5) Only the tradition of Maizbhandari songs draws the attention of Bertocci and Harvilahti, but the rich tradition of argumentation pioneered by the Khalifas of Darbar Sharif in Arabic, Persian, Urdu and Bangla languages is awaiting critical exploration.

(6) The impact of local setting on the Tariqa has been studied, but the relation of Maizbhandaris with trans-local sufi brotherhoods has not been adequately explored.

Conclusion

The academic field of contemporary Sufi tariqa in Bangladesh is relatively new, and is still developing, and there are several unexplored academic aspects. In this connection, we conclude that conducting detailed research on the crystallization of Maizbahandari Tariqa of contemporary Bangladesh, its concept of sainthood (Belayet-E-Mutlaka) , the methods related with spiritual purification (Usul-E-Saba or sapta paddhati) and its Pirs is critical for expanding this field of study. We also would like to

put emphasis on the vastness and complexity of the phenomenon of Maizbahdari Tariqa as a fascinating field awaiting scientific inquiry.

Select Bibliography

Alam Sarwar (2012). 'Encountering the Unholy: The Establishment of Political Parties by Sufi Masters in Modern Bangladesh' in Clinton Bennett and Charles Ramsey (ed.) South Asian Sufis: 163-180. Devotion, Deviation and Destiny, New York: Continuum.

--- --- (2012). ' Making the Case for Sainthood in Bangladesh: Narrative Strategies and the presentation of Holiness in the Life of Ziaul Haque Maizbhandari' in Clinton Bennett and Charles Ramsey (ed.) South Asian Sufis: Devotion, Deviation and Destiny, 123-140. New York: Continuum.

Banu, Dr. U. A. B. Razia Akter (1992). Islam in Bangladesh. Leiden: E. J. Brill.

Bertocci, Peter J. (2006). ' A Sufi Movement in Bangladesh : The Maijbhandari tariqa and its followers'. Contribution to Indian Sociology, Vol. 40, no. 11, 1-28. New Delhi: SAGE.

Eaton, Richard M. (2006). The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760. New Delhi: Oxford University Press.

Harder, Hans (2011). Sufism and Saint Veneration in Contemporary Bangladesh: The Maijbhandaris of Chittagong. New York: Routledge.

Harvilahti, Lauri (2010). 'The Folklore of Maijvandar's Mystics' in Firoj Mahmud and Sharani Zaman (ed.) Folklore in Context. Dhaka: The University Press Limited.

Haq, Muhammd Enamul (1975). A History of Sufi-ism in Bengal. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Karim, Dr. Abdul (1959). Social History of the Muslims in Bengal. Dhaka: Asiatic Society of Pakistan.

Karim, Dr. A. K. Nazmul (1996). Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh. Dhaka: Nawroze Kitabistan.

Maizbhandari, Moulana Shah Sufi Syed Delwar Hossain (2000). Belayet-E-Mutlaka, Translated into English by Dr. Md. Abdul Mannan Chowdhury. Chittagong: Anzuman-e-Muttabeyin-e-Gaus-e-Maizbhandhari.

Maizbhandhari,Khadem-ul-Fukra Syed Delwar Hossain (2005). Belayet-e-Mutlaka, in Bangla. Chattagram: Maizbhandari Prokashoni.

Trimingham, J. S.(1998). The Sufi Orders in Islam. New York: Oxford University Press.

Education professional and independent researcher

Usul E Saba: an enlightening guideline for students

- Abdul Alim

In the name of Almighty Allah, The Most Gracious, The Most Merciful.

Being a teacher, I have witnessed many ups and downs in my students' life. I have seen many with an average merit, succeeded in the later part of their lives, I have also seen many with a good result in O levels/SSC have slipped in the path of life, become drug addicted or could not reach the goal as expected from them.

It really hurts me when I see every year a number of students suicide after the SSC/HSC results if the result is not satisfactory. Good result is an important factor to be successful in life, but it is not the only factor as I have mentioned earlier. Here the implementation of Usul-e-Saba in a student's life may help in many aspects.

Some of the Teachings of Usul-e-Saba:

(3) Surrendering to God's will (Fana anil Irada): If a student accepts the result even if it is not satisfactory despite his tremendous hard work or does not get a subject in university level which he wanted the most, he can practise the third stepof Fana-e-Salasa.

(2) Giving up unnecessary gossip or attitude (Fana anil Hawa): During my fourteen years of teaching career, I have seen students waste their valuable time on mobiles, games, social media, all of which are virtual viruses. If a student practices the second step of Fana-e-Salasa to avoid this, there is no doubt that he can utilise his time for a better purpose.

(1) Self criticism: A student should practice this in his everyday life. If he/she spends 5/10 min of his time to make a list of his good and bad deeds everyday may be just before going to bed, the virtue of accountability to himself will develop which will prevent him/her from getting involved in any gang/drugs or other bad circles.

I think Usul-e-Saba can be practically practiced during moral class or assembly time in school irrespective of any race and religion.

I took oath to Sajjadanoshin-e-Gausul Azam during my student life. As the father of two daughters, I must say that because of my attachment with this spiritual place, I could resist myself from many bad influences in my student life. So I personally believe student life is the best time to get involved and start practicing Usul-e-Saba.

MCom (Accounting), MBA (Finance)
Senior O/A level Accounting Teacher, Dhaka

Impact of USUL E SABA in a student's life

Asadozzaman Nur

Bismillahir Rahmanir Rahim (In the name of Almighty Allah, the Most Gracious, the Most Merciful)

Self-confidence is a must needed quality of a student's life. If a child is not confident about his performance, no matter what materials/facilities he is supplied with, he can never achieve a desiredresult. In the Holy Scriptures it is also said that Allah helps those who helps themselves. Students usually face several examinations during their student life, in spite of having a good preparation many become nervous only for lack of self-confidence.

Self-confidence is prescribed nicely in the seven steps of Usul-e-Saba.One of the Fana-e-Salasa - "Fana anil Khalq" tells us not to expect help from others but to rely completely on ourselves. This is an absolute practice of self-confidence.

On the other hand, now a days we see a tendency of growing enmity amongst students for silly reasons. Sometimes it even leads to beating each other brutally or even worse. Students do not accept criticism from their peers. If a student considers a criticizer as a mirror of their mistakes, they can correct themselves, and enemy may become a friend. This will also reduce the social instability and unrest and create a peaceful environment.

This is also explained in the "BLACK DEATH" or "MOUT-E-ASWAD" which is another step of Usul-E-Saba.

Not only these two steps of Usul-e-Saba, the other steps like "Fana Anil Hawa" or giving up unnecessary activities, "Fana anil Irada" or relying on God's will also have an impact in a student's life. If students follow these in their student life they will be benefited and become a good human being.

O Level Chemistry Teacher of Chittagong Grammar School (CGS)

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আল-আযহারী

খালেকেকুল আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ .

তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? [২৩:১১৫]

রাব্বুল আলামীন আরো বলেন- أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى .

মানুষ কি মনে করে যে, তাদের নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? [৭৫;৩৬]

তাহলে কোনো অর্থে বা উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন? জবাব মহান আল্লাহ তা'য়ালাই দিচ্ছেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

আমি জ্বিন ও মানুষকে এ জন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। কিন্তু মানুষ কীভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে? তার দাসত্ব বা বন্দেগির পদ্ধতি আর নীতিমালাই বা কী? সন্দেহ নেই যে, এ সমস্যার সমাধানও কেবল তাঁর কাছে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, বান্দাকে তাই তাঁরই দরবারে প্রার্থনার ভাষা বাতলিয়ে দিচ্ছেন-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .

(হে আল্লাহ!) আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথের পথিক বানাও, তাদের পথের যারা তোমার করুণা লাভে ধন্য হয়েছে [১:৫-৬]

কিন্তু না; যাত্রা যেখান থেকে শুরু, সেখানেই থেমে আছি, সমস্যার জট খুলল কই? কারণ এ অনুগ্রহ জানব কী করে?

সাক্ষ্য প্রদানে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ [৬:১৯]

الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ .

যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবি, ছিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। যুগে যুগে নবি-রাসুলগণ প্রেরিত হয়ে স্ব-স্ব জাতি ও ক্বাওমের সামনে মানব জীবনের করণীয় ও পালনীয় দায়িত্বসমূহ মহান আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মে পেশ করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন শেষে নশ্বর জগত থেকে বিদায় নেন। কোনো কোনো সময়ে একাধিক নবিও পূর্ববর্তী কোনো নবি কিংবা রাসুল প্রবর্তিত দ্বীনের প্রচার-প্রসার

ও খেদমত আন্‌জাম দিয়ে গেছেন। সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত খোদায়ী বিধান নিয়ে তশরিফ আনলেন ইমামুল মুরসালীন খাতামুন্নাবীয়ীন' সৃষ্টির মূল নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘোষণা হলো-

وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.

তিনি তো আল্লাহ্‌র রাসুল ও শেষ নবি [৩৩:৪০]

প্রশ্ন জাগে, প্রলয় যাবত এ শ্রেষ্ঠ নবির শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রচার প্রসারের মহান খেদমত আল্লাহ তায়ালা কাদের থেকে নিচ্ছেন? নবিকুল সম্রাট ঘোষণা করলেন-

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

আমার উম্মতের অলি আল্লাহ আলেম সমাজই বণি ইসরাঈলের নবীদের মতো দ্বীন প্রচার ও প্রসারের খেদমত আন্‌জাম দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

তোমরা যদি না জানো তবে জিকিরওয়ালা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর [২১:৭]

তারই ধারাবাহিকতায় আলেমকুলের শিরোমনি হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) অশান্তি ও অরাজকতাময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে আত্মশুদ্ধির এক অনন্য মেডিসিন "উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি" প্রবর্তন করেন।

"সপ্তকর্ম পদ্ধতি" দুই ভাগে বিভক্ত :

(১) ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ: এই তিন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের অন্তর থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, নিন্দা ও রাগকে সংযত ও অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ে নিজেকে পরিষ্কার করতে পারে।

(২) মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু : এই চারটি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের জীবনে এবং সমাজে ফানয়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর এর বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। এক কথায় "উছুলে ছাবয়া" এমন এক পদ্ধতির নাম, যার মাধ্যমে একজন মানুষ তার মৃত্যুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারে।

বিশ্বায়নের এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমরা যদি "উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি" পৌঁছে দিতে পারি, তাহলেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি–

* আরবি, বাংলা, ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে "সপ্তকর্ম পদ্ধতি" মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি।

* সেমিনার, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন।

* ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেমন- ফেইসবুক, উইকিপিডিয়া, ইউটিউব, টুইটারসহ বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার মাধ্যমে পৌঁছানো যায়।

* বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টকশোর আয়োজন।

* লেখনীকেও আমরা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

* "উছুলে ছাবয়া" এই বিষয়ে এমফিল/পিএইচডি করার পদক্ষেপ নেওয়া।

এক কথায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নাগরিকদের বৈষয়িক, ইহজগতিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক প্রযোজ্য পদ্ধতির নাম "উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি"।

এমফিল গবেষক
ইউনিভার্সিটি অব মালাইয়া
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

মানব সমাজ ও জাতির উন্নয়নে উছুলে ছাবয়া'র ভূমিকা

এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ

ভূমিকা ঃ

ইসলাম ধর্মের সাধন-মার্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সুফিবাদ। এই সুফিবাদের একটি ধারার নাম মাইজভাণ্ডারী তরিকা। যার প্রবর্তক গাউছুল আজম শাহ্ সুফি মওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮২৬-১৯০৬]। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে তরিকতের ধারায় তিনি যিকির-ফিকিরের সাথে জাগতিক উন্নয়নের সহজসাধ্য উপায় হিসেবে উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি প্রদান করেছেন। যা গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ অথচ জাগতিকভাবে চলমান সমাজ ও জাতীয় জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সত্যিই এক বিরাট নিয়ামক এ সপ্তকর্ম পদ্ধতি। অনেকের ধারণা তরিকত মানে জাগতিক বিষয় বিবর্জিত শুধু পরকালীন চিন্তায় আধ্যাত্মিক বিষয়ে মগ্ন থাকার নাম। অথচ তা সম্পূর্ণভাবে ভুল। উছুলে ছাবয়া নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও আলাপ-আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সত্যটিকে উপলব্ধি করে উছুলে ছাবয়ার আলোকে এ বিষয়ে আলোচনার আন্তরিক প্রয়াস বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি।

উছুলে ছাবয়া এর পরিচিতি ঃ

আভিধানিক পরিচয় ঃ

উছুল শব্দটি বহুবচন, এর একবচন 'আছলুন'। যার অর্থঃ ভিত্তি, আভিজাত্য, বস্তুর উৎস, যার ওপর অন্যের ভিত্তি, শাখার বিপরীত তথা মূল, কারণ, নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি। 'আছল' এর ব্যবহারিক অর্থঃ নিয়ম-নীতি, প্রমাণ পত্র, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও মৌলিক অবস্থা।

ছাবয়া অর্থঃ সাত, সপ্ত, সাতজন, সাতটি। অতএব আভিধানিক ভাবে উছুলে ছাবয়া এর অর্থ দাঁড়ায়, সপ্তকর্ম পদ্ধতি।

পারিভাষিক পরিচয় ঃ

পারিভাষিক অর্থে মানবাত্মার কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করে সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্যে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সর্বসাধারণের উপকারার্থে নির্বিঘ্ন ও সহজসাধ্য উপায় হিসেবে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতিকে 'উছুলে ছাবয়া' বলা হয়। [(সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, প্রথম খণ্ড (চট্টগ্রামঃ মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭খ্রি.), পৃ. ৩২] কুপ্রবৃত্তি ধ্বংস করার জন্যে এবং সুপ্রবৃত্তি সৃষ্টির লক্ষে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র প্রবর্তিত সপ্তকর্ম পদ্ধতিকে 'উছুলে ছাবয়া' বলা হয়।

উছুলে ছাবয়া এর প্রকারভেদ ঃ উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি মাইজভাণ্ডারী তরিকার অন্যতম মৌলিক দর্শন হিসেবে খ্যাত। সংক্ষেপে বলা হয় 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি'। এ সপ্তকর্ম পদ্ধতির রূপরেখা নিম্নরূপ-

১. ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর।

২. মউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু।

ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর-

১.১. ফানা আনিল খাল্ক।

১.২. ফানা আনিল হা'ওয়া।

১.৩. ফানা আনিল এরাদা।

মউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু-

২.৪. মউতে আবয়্যাজ

২.৫. মউতে আছওয়াদ

২.৬. মউতে আহ্‌মর

২.৭. মউতে আখজার

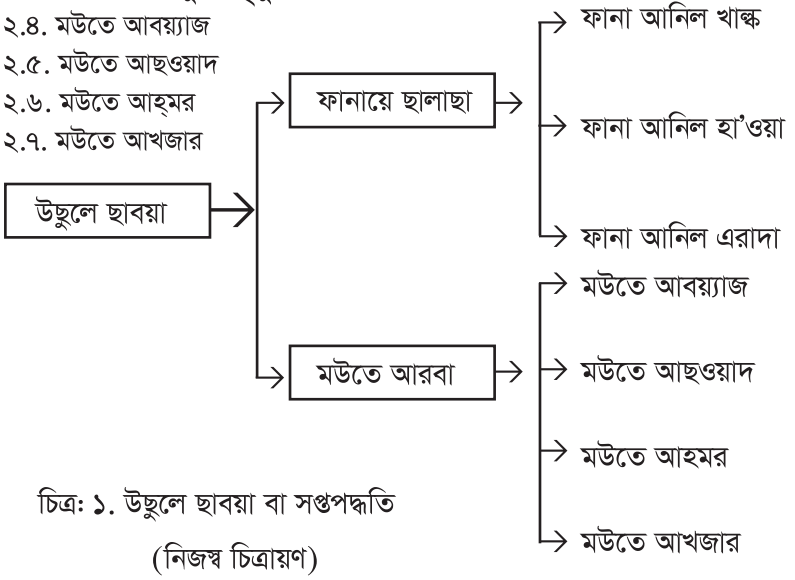

চিত্র: ১. উছুলে ছাবয়া বা সপ্তপদ্ধতি

(নিজস্ব চিত্রায়ণ)

১.১. ফানা আনিল খাল্ক ঃ (فَنَاء عن الخلق)

আভিধানিক পরিচয় ঃ ফানা (فَنَاء) আরবি শব্দ। অর্থ হলো- ধ্বংস, ক্ষয়, বিনাশ, বিলোপ, লয়, শেষ নিঃশেষ, মৃত্যু। (ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, মে-২০০৯ খ্রি., পৃ. ৭৬৭) 'আন (عن) অব্যয়টি থেকে, হইতে, সম্বন্ধে, ব্যাপারে, বিষয়ে, কারণে, পরে, দিকে ইত্যাদি অর্থে ব্যবহারিত হয়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৩) আর আল খাল্ক (الخلق।) অর্থ সৃষ্টি, উদ্ভব, তৈরিকরণ, উদ্বাবন, আবিষ্কার, গঠন, আকৃতি, সৃষ্টিজীব, মানুষ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১) ইত্যাদি অর্থে ব্যবহারিত হলেও সুফিগণের নিকট 'ফানা 'আনিল খাল্ক' একটি পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ হলো- আত্মনির্ভরতা, পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করা,

আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট কিছুই প্রত্যাশা না করা, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়া, স্বনির্ভর হওয়া ইত্যাদি।

পারিভাষিক পরিচয় ঃ

আর পরিভাষায় মনে প্রাণে সৃষ্টির কাছে কোনোকিছুর প্রত্যাশা ও কামনা-বাসনা না করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে স্রষ্টা প্রদত্ত শক্তি ও সমর্থকে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়াকে 'ফানা আনিল খাল্ক' বলা হয়।

মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বিভিন্ন দিক ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 'ফানা আনিল খাল্ক'র ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার ভাষায়-

"দেহ তত্ত্ব- পরদোষ পরিহার, নিজ দোষধ্যান পর মুখাপেক্ষিতা বর্জন। যাহার ফলে খোদা পথচারী ছালেক হিংসা ও ঈর্ষা মুক্তিতে আত্মশক্তি সমর্থের প্রতি আস্থাবান ও সৎ রুজিতে সক্ষম হয় সুফি পরিভাষায় বলেঃ "ফানা আনিল খাল্ক"। সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মানব সভ্যতা (মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশঃ ১৫ নভেম্বর ২০১৭ইং, পৃ. ২৩) তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, "ফানা আনিল খাল্ক" হলো- "কাহারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয়। এবং নিজ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি যথাযথ আস্থা জন্মে। ফলে "জলুমান" বা জুলুমকারী সাব্যস্ত হয় না।" 'সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, (মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী ৮ম প্রকাশঃ ১৫ মে ২০১৮ইং, পৃ. ৩২) কাহারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি আস্থা জন্মে। হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [বেলায়তে মোত্লাকা, ৮ম পরিচ্ছেদ, পুনঃ প্রকাশ : ২৫ মে ২০১৪ ইংরেজী।]

উন্নয়নে ফানা আনিল খাল্ক ঃ

মাইজভাণ্ডারী তরিকার অন্যতম এ মৌলিক দর্শনটি মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে এবং পরমুখাপেক্ষিতা ও পরনির্ভরশীলতা থেকে রক্ষা করে স্বনির্ভর হতে শেখায়। যেটি সমাজ ও জাতীর উন্নয়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত শক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করে স্বীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতানুযায়ী কাজ-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে কোনো কিছুর প্রত্যাশা করে না আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যথেষ্ট। (আল কুরআন সূরা আত্ তালাক, পারা ২৮, আয়াত-৩)

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতির জন্যে আত্মনির্ভরশীলতার কোনো বিকল্প নেই। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের তাগাদা রয়েছে।

একজন মানুষ যখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, তখন তিনি কারো নিকট কোনোরূপ উপকার পাওয়ার আশা বা কামনা করেন না। আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্যের প্রতি আস্থা রেখে স্বীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীলতার বিষয়টি অতীব প্রয়োজন। তাই আত্মনির্ভরশীলতার অপর নাম দু'জাহানের সফলতাও বলা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির সফলতার চাবিকাঠি হলো আত্মনির্ভরশীলতা। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতানুযায়ী কাজ-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে; কঠোর ত্যাগ, পরিশ্রম এবং সাধনা করে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তথা সামষ্টিক জীবনে উন্নতি করবে, জন্মগত যোগ্যতা, প্রতিভা ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগাবে এবং পরনির্ভরশীলতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয় ও অকেজোতা থেকে ব্যক্তি নিজেকে দূরে রাখবে এমনই কামনা করে ইসলাম। কুরআন মজিদের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ .

"মানুষ তাই পায় যা সে করে।" (আল কুরআন, সূরা আন্ নজম, পারা: ২৭, আয়াত: ৩৯)

মানবতার কল্যাণে, নৈতিক উন্নয়নে, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এতে অবহেলা করার অধিকার যেমন কারো নেই, তেমনি পরনির্ভরতার কোনো সুযোগ নেই। বৈধ পন্থায় যে কোনো কাজে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। এতে সমাজ ও জাতির উন্নয়ন ঘটে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ .

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল লাভ করতে পারে।" (আল কুরআন, সূরা ত্বহা, পারা: ১৬, আয়াত: ১৫)

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮২৬–১৯০৬] তাঁর মুরিদ, ভক্ত ও অনুসারীদের দু'জাহানের কল্যাণের লক্ষে নৈতিকতা, মানবিকতা, সমাজ সভ্যতা ও ধর্মীয় চেতনাকে সঠিকভাবে সুরক্ষায় বলেন, "নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইও না।" তাঁর এই নির্দেশনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে নিজ শ্রম, মেধা, ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতাসহ যে সকল অনুদান পেয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করে সামষ্টিক উন্নতি ঘটাতে হবে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মাইজভাণ্ডারী তরিকার পরিপন্থী। ইসলামে তা মহা পাপ। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة .

"ফরয ইবাদতের পর হালাল জীবিকা অন্বেষণ করাও ফরয।" (বায়হাকি শরিফ, সূত্রঃ মিশকাত শরিফ, পৃ. ২৪২, কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, হা. নং ৯২৩১)

নবি-রাসুলগণও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরাও কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রত্যেকে দ্বীনি দাওয়াত প্রদান, মানুষদেরকে সৎপথের সন্ধান দানের সাথে সাথে বিভিন্ন পেশায় ও কর্মসংস্থানে আত্মনিয়োগ করতেন এবং উম্মতদেরকে তা শিক্ষা দিতেন। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ .

"আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন কোনো নবিই পাঠান নি, যিনি মেষ চরাতেন না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও কি? উত্তরে তিনি বললেন, মক্কায় কিরাতের বিনিময়ে মেষ চড়িয়েছি।" (বুখারি শরিফ, মিশকাত শরিফ, পৃ. ২৫৮)

'ফানা আনিল খাল্ক' এর দর্শনকে সামনে রেখে প্রতিটি মানুষ কর্মে আত্মনিয়োগ করলে শুধু ব্যক্তি নয়; গোটা সমাজ ও জাতির শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি, উন্নতি ও উন্নয়ন হবে।

প্রতিটি মানুষ তার ক্ষমতা ও যোগ্যতানুযায়ী যে কোনো বৈধ কর্মে আত্মনিয়োজিত হতে হবে। বিশ্ব আদর্শের মূর্তপ্রতীক রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবন থেকেও বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। তাঁর পবিত্র জীবন আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্মে ব্যস্ততার আদর্শ দৃষ্টান্ত। তিনি কিশোর বয়সে মাঠে বকরি ও মেষ চড়িয়েছেন। যৌবনে ব্যবসা করেছেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় মাটি কেটেছেন। সফরকালে সময় সময় জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেছেন। কূপ থেকে নিজ হাতে পানি টেনে তুলেছেন। আবার মদিনা শরিফের সর্বোচ্চ মসনদে বসে রাষ্ট্র পরিচালনাও করেছেন। তাই মানব জীবনের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। (এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ, ইসলাম ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন, চট্টগ্রামঃ মোস্তফা-কালাম পাবলিকেশন, প্রকাশকালঃ শাবান, ১৪৩৮হি., বৈশাখ ১৪২৪, মে-২০১৭ খ্রি., পৃ. ১০৮)

রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ত ও আদর্শের উত্তরসূরী হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) গাউসিয়তের মসনদে বসে বেলায়তের ফয়েজ বিতরণের সাথে সাথে ইহকালীন উন্নতির বিষয়ে কুরআনি নির্দেশনার বাস্তবায়নে মানুষদেরকে কর্মমুখী শিক্ষাও প্রদান করেছেন 'ফানা আনিল খাল্ক' দর্শনের মাধ্যমে। তিনি ইবাদত-বন্দেগির পরে আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে কুরআন শরিফে–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ .

"নামায শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবিকা অন্বেষণ করো।" (আল কুরআন, সূরা আল জুমআ, পারা: ২৮, আয়াত: ১০)

মানুষ আত্মনির্ভরশীল হলে কর্মসংস্থানের সন্ধান করে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি ও অনাহারি-অর্ধাহারি মানুষের হ্রাস পায়, আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়। হযরত কেবলার দরবারে আগত আশেক-ভক্তগণকে তিনি কর্মঠ ও পরিশ্রমী হতে বলতেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে হযরত কেবলা (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র ফানা আনিল খাল্ক' দর্শনের মর্মানুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি হাতে নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র হাবিব সরকারে দু'আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিকল্পনা ও কর্মসূচির একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنْ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ .

"হযরত আনাস (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, এক আনসার সাহাবি নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সাহায্য প্রার্থী হলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তোমার গৃহে কি কিছু নেই? সাহাবি বললেন, একটি কম দামি মোটা কম্বল আছে, যার এক দিক আমার গায়ে দিই আর অপর দিক বিছিয়ে থাকি এবং একটি কাঁচের পাত্র আছে, যাতে করে আমরা পানি পান করি। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দু'টি জিনিস কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বললেন, আমি দু'টিই এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পারি। হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বা তিনবার বললেন, এক দিরহামের বেশি কে দিতে পারবে? এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি দু'দিরহামে নিতে পারব। তিনি উভয়টি তাঁকেই দিলেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিরহাম দু'টি আনসারি সাহাবিকে দিয়ে বললেন, যাও, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করো এবং তা নিজের পরিবারকে দাও। অপর দিরহাম দ্বারা একটি কুড়াল কিনে আমার নিকট নিয়ে এসো। কথামতো সাহাবি তা নিয়ে আসলেন। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাতে হাতল লাগিয়ে তাকে দিয়ে বললেন, এ কুড়াল দিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করতে থাকো। সাবধান, আমি যেন পনের দিন তোমাকে এখানে না দেখি। সে ব্যক্তি চলে গেলেন এবং সে মতে কাঠ কাটতে ও বিক্রি করতে লাগলেন। পনের দিন পর সে সাহাবি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন। তখন তিনি

দশ দিরহামের মালিক। অতঃপর তিনি এর কিছু দ্বারা বস্তু ক্রয় করলেন এবং কিছু দ্বারা খাদ্য। এ সময় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার জন্যে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম অথচ ভিক্ষাবৃত্তি কিয়ামতের দিন তোমার জন্যে মুখমণ্ডলে কলংকের চিহ্ন হবে। মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ব্যতিত কারো পক্ষে ভিক্ষা করা সংগীত নয়। সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি, অপমানকর দেনার দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং পীড়াদায়ক রক্তপণের জন্যে দায়ি ব্যক্তি।" (আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাযাহ শরিফ)

হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর দরবারে আনিত হাদিয়া-তোহফা অভাবীদেরকে বিলিয়ে দিয়ে তাদেরকে কর্মের ব্যবস্থা করে দিতেন। কর্মবিমুখ ও অকর্মণ্য লোক সমাজ ও জাতির বোঝা ও উন্নয়নের অন্তরায়। বেকার ও কর্মহীন হয়ে শুধু দরবারে বসে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। সমাজ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে সকলকেই আপন সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে পরনির্ভরশীল হয়ে বসে থাকা যাবে না। ইসলামি সমাজের প্রতিটি নাগরিককে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। রিযিকের সন্ধানে বিচরণ করতে হবে বিস্তৃত পৃথিবীতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ .

"আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার পিঠে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহরণ করো।" (আল কুরআন, সূরা আল মুলুক, পারা: ২৯, আয়াত: ১৫)

মাইজভাণ্ডারী দর্শনে পরনির্ভরশীল হয়ে কর্মহীন বা বেকার হয়ে বসে থাকা যাবে না। অনেককে দেখা যায়, লম্বা চুল রেখে এলোমেলো পোশাক পরে রাস্তায় ঘুরাফেরা করেন। তারা নিজেকে পরিচয় দেন মাইজভাণ্ডারী হিসেবে। মাইজভাণ্ডারী ফকির বলে অনেক সময় হাদিয়ার নামে, অনেক সময় ওরশের চাঁদা বলে, অনেক সময় দু'আ করার নাম করে পরের নিকট ভিক্ষা চায়। যা মাইজভাণ্ডারী তরিকার সম্পূর্ণ বিরোধী ও এক ঘৃণিত বিষয়।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় 'ফানা আনিল খাল্ক' দর্শনের আলোকে বেকার ও কর্মহীন ভবঘুরে জীবন যাপনের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং তরিকতের নামে কেউ যদি ঘর-সংসার ছেড়ে বেকার ও কর্মহীন ভবঘুরে জীবন যাপন করতে চায়, ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার ধারক ও বাহক মাইজভাণ্ডারী মূলনীতিতে তা হবে অন্যায়। কারণ তা ফানা আনিল খাল্ক তথা আত্মনির্ভরশীলতার বিপরীত ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নয়নের অন্তরায়। ইসলাম পরনির্ভশীল হয়ে ভবঘুরে জীবন যাপনকে শুধু নিরুৎসাহিত করেনি, বরং এর প্রতি চরম নিন্দাবাদও জানিয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে, মুর্শিদকে রাজি করার জন্যে পরজীবী। ও পরনির্ভরশীল হওয়ার কোনো দরকার নেই। পরমুখাপেক্ষী হওয়ার নিন্দা করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا.

"বৈরাগ্যবাদকে তারা সৃষ্টি করে নিয়েছে, যার নির্দেশ আমি তাদের দেইনি, অবশ্য তারা এই বৈরাগ্যবাদ সৃষ্টি করেছিল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার মর্যাদাও তারা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি।" (আল কুরআন, সূরা আল হাদিদ, পারা : ২৭, আয়াত: ২৭)

রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- لَا رهبانية فى الإسلام

অর্থাৎ- "ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই।"

বৈরাগ্যবাদ আর্থনিতিক কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে, বেকারত্ব সৃষ্টি করে। আত্মনির্ভরশীল না হয়ে পরনির্ভরশীল করে তুলে। এতে সমাজ, দেশ ও জাতি উন্নয়নের ধারা হতে ছিটকে পড়ে।

হযরত কেবলা (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র 'ফানা আনিল খাল্ক' দর্শন মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। আর ভবঘুরে, বৈরাগ্যবাদ, বেকার ও কর্মবিমুখ চিন্তা ও মানসিকতায় যথাযথ মূলোৎপাটনও করেছে। যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও উন্নয়নের নিয়ামক।

মানুষ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে যে কোনো কাজ করুক, তার প্রতিটি কাজ ও মুহূর্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত হিসেবে গণ্য। তবে বিশেষ সময়ে নির্জন সময়ে নিজের বিগত দিনের ভালো-মন্দ কাজ-কর্মের বিচার করা, নিজ কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নিজের বিবেকের আদালতে করা, চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে নিজের মন্দ কথা ও কাজের জন্যে অনুতপ্ত ও অনুশোচনার মাধ্যমে নিজকে শোধরানোর চেষ্টা করা, ভবিষ্যতে ভালো কথা-কাজে লিপ্ত থাকতে স্বীয় পীর-মুর্শিদের আনুগত্যের মাধ্যমে বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তার নিকট প্রার্থনা করা, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করা, বিনয়াবনত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং অন্য কারো নিকট কোনো কিছুই আশা না করাই 'ফানা আনিল খাল্ক'।

কিন্তু কিছুলোক পরমুখাপেক্ষিতাকে গ্রহণ করে ঘরে, দরবারে কিংবা মসজিদে বসে থাকে। ফলে তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শরিক হতে পারে না। এরকম লোক মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ও গাউসিয়ত নীতির বর্হিভূত বলে গণ্য। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি ঘরে বা মসজিদে নিষ্কর্ম বসে থাকেন আর বলেন যে, আমি কোনো কাজ করবো না,

এখানেই আল্লাহ আমাকে রিযিক দান করবেন- এ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? উত্তরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, এ লোক মূর্খ। সে কি নবিজির মহান বাণী শোনেনি? তিনি ইরশাদ করছেন-

جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ رُمْحِيْ .

অর্থাৎ- "আমার জীবিকা আমার বর্শার ছায়ায় রাখা হয়েছে।"

ইবনে ওমর সূত্রে ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) হাদিস শরিফটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

"ফানা আনিল খাল্ক" দর্শন যেহেতু কারো কাছ থেকে কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা থাকে না; তাই এই দর্শনের ফলে মানুষের মনে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয় এবং নিজ শক্তি সমর্থনের প্রতি যথাযথ আস্থা জন্মে। এতে মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে কাজ করে। কর্মবিমুখ হয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে ঘরে বসে থাকে না। ফলে মানুষ সাধ্যানুযায়ী অর্থ-সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করে। এতে সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির উন্নয়ন হয়। অনেক লোক আল্লাহ্‌র ভরসা বলে পরনির্ভরশীল হয়ে বসে থাকে। যা মোটেই উচিত নয়। এ ব্যাপারে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ করেন,

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا .

"তুমি যদি আল্লাহ্‌র ওপর সত্যিকারভাবে ভরসা করতে তাহলে পাখির মতোই রিযিক পেতে। পাখিরা খালিপেটে ভোরবেলায় বেরিয়ে যায় আর ভরা পেটে সন্ধ্যা বেলায় নীড়ে ফিরে আসে।" (বায়হাকি শরিফ, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৩য়, হা. নং-৫৬৯৪)

অর্থাৎ রিযিকের সন্ধানে পাখির ন্যায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে নীড় ত্যাগ করো, পরনির্ভরশীল হয়ে বেকার কিংবা কর্মহীন ঘরে বসে থেকো না।

মাইজভাণ্ডারী দর্শন প্রথমেই মানুষকে এই শিক্ষাই প্রদান করে যে, সমস্ত পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির ওপর ভরসা করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। যা জীবনের মানোন্নয়ন করতে পারে। সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির উন্নয়ন করতে পারে।

অনেকে 'আল্লাহ ভরসা'র নাম করে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকে। তারা মনে করে

এমনটিই সুফি সাধনা। তাদের এ চিন্তাধারা নবি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে কাজ করা উভয় সাংঘর্ষিক নয়। বর্ণিত আছে, এক গোঁয়ে লোক 'আল্লাহ ভরসা' বলে উটকে না বেঁধে ছেড়ে দিলে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّل

"(উটকে) বেঁধে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো।" (তিরমিযি ও ইবনু মাযা শরিফ)
সুফি সাধক হযরত শাকিক বলখি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ও হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)'র জীবনের একটি ঘটনা আমাদের জন্যে চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে–

হযরত শাকিক বলখি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) নামে এক দরবেশ লোক রিযিকের সন্ধানে বাণিজ্যিক সফরে বের হলেন। বেশ কিছুদিন বাইরে থাকবেন তাই তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু অল্প কিছু দিন না যেতেই হযরত শাকিক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ফিরে এলেন। হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তাঁকে মসজিদে দেখতে পেলেন আর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত শীঘ্রই ফিরে এলে কেন? হযরত শাকিক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) উত্তরে বললেন, এ সফরে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটতে দেখলাম। তাই ফিরে এসেছি। হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলে? হযরত শাকিক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) জানালেন যে, আমি এক জনশূন্য বিরাণ গৃহে আশ্রয় নিলাম। সেখানে দেখলাম, একটি অন্ধ, পঙ্গু পাখি। আমি কৌতুহল নিয়ে মনে মনে বললাম, পাখিটি এমন অনাবাদ গৃহে কি করে বেঁচে আছে, সেতো চোখে দেখে না, আবার নড়তেও পারে না। এমন ভাবতে না ভাবতে দেখলাম, অন্য একটি পাখি মুখে খাবার নিয়ে এলো। এভাবে দিনে কয়েকবার পাখিটি খাবার বহন করে নিয়ে এলো। আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, যিনি এ পাখির জন্যে এখানে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেন, তিনি আমার জন্যেও রিযিকের ব্যবস্থা করতে পারেন। আর তখনই আমি ফিরে এলাম। হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম বললেন, শাকিক! কি আশ্চার্য! তুমি স্বেচ্ছায় কেন পরনির্ভর একটি পঙ্গু, অন্ধ পাখির মতো হতে গেলে? অন্য পাখিটির মতো হতে চাওনি কেন? যে আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের জীবিকা নিজে সংগ্রহ করে আবার অন্য পঙ্গু ও অন্ধদের জন্যেও ব্যবস্থা করে? তুমি কি জান না? উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম? হযরত শাকিক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) হযরত ইব্রাহিম বিন আদহামের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর হাতে চুমো দিলেন, আর বললেন- ইসহাকের বাবা, তুমি সত্যিই আমাদের আদর্শ। তারপর আবার ব্যবসায় ফিরে গেলেন। হযরত শাকিক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)

ও হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) সুফিসাধকের উপর্যুক্ত ঘটনা হতে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে আত্মনির্ভরশীলতার উৎস খুঁজে পাই।

আল্লাহ তায়ালার অলঙ্ঘনীয় বিধান হলো, কারো কোনো কর্মপ্রয়াস ছাড়া তিনি কিছুর ব্যবস্থা করেন না। তাই তিনি পৃথিবীতে বিচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا .

"তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার পৃষ্ঠে বিচরণ করো।" (আল কুরআন, সূরা আল মুলক, আয়াত: ১৫)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে কাজ করবে, সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার যোগ্য। আর যে ব্যক্তি পরনির্ভরশীল হয়ে বসে থাকবে, সে বঞ্চিত হবে। বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) দেখলেন, একদল লোক জুম'আর সালাতের পর 'আল্লাহ ভরসা' বলে মসজিদে নিশ্চল বসে আছেন। তখন তিনি বেত্র উঁচিয়ে বললেন,

لا يقعدن احدُكم عن طلب الرزق ويقول: اللّٰهُمَّ ارزقنى، وقد علم ا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة .

"তোমরা কেউ রিযিকের অনুসন্ধান ত্যাগ করে বসে থেকো না। আর বলো না হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দাও। কারণ, আকাশ স্বর্ণ বা রৌপ্য বর্ষণ করে না।" আল্লাহ বলেই দিয়েছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ .

"যখন সালাত সমাপ্ত হয় জমিনে ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো।"

মাইজভাণ্ডারী দর্শন 'ফানা আনিল খাল্ক' কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত উন্নয়ন বিধানের বাস্তবায়নের নমুনা।

আধ্যাত্মিক সাধনার নামে, ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার নাম করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হতে বিরত থাকা যাবে না। আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগি যেমন করতে হবে, তেমনি পার্থিব কাজও করতে হবে। করা হয়, তা-ও ইবাদতে পরিগণিত হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের বিষয়কে পাশাপাশি কামনা করতে শিখিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো পরকালেও কল্যাণ দান করো। আমাদিগকে দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দাও।" (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, পারা:২, আয়াত: ২০২)

বিশিষ্ট সুফি সাধক হযরত শাইখ শা'রানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) শুধু ইবাদতকারীর ওপর আত্মনির্ভরশীল কর্মঠ ব্যক্তিদেরকে প্রাধান্য দিতেন। কারণ, ইবাদতের ফসল শুধু নিজে ভোগ করে। আর কর্মঠ ব্যক্তির পেশার উপকারিতা সকলের জন্যে। তিনি বলতেন, 'কী চমৎকার যে, দর্জি তাঁর সূঁচের একটি ফোঁড়, কাঠমিস্ত্রি তাঁর করাতের প্রতিটি সঞ্চালনকে তাসবিহতে রূপান্তর করতে পারে।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতিত কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া বা প্রত্যাশা করা ভিক্ষার মতো হীন কাজ। পরমুখাপেক্ষিতা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত শক্তি-সামর্থ বিকাশের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। পরনির্ভরতার বিরুদ্ধে তুমুল বিষোদগার করে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী বলেছেন, "নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা।" তাঁর নির্দেশনায় পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত সামর্থ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, চেতনা, কর্মদক্ষতা সকল কিছুকে যথাযথভাবে বিকশিত করে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, জাতি তথা গোটা সৃষ্টির কল্যাণ ও উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করার ওপরেই গুরুত্বারোপ করেছেন।

বুখারি শরিফে হযরত যুবাইর বিন আওয়াম হতে বর্ণিত আছে, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে মানুষ দান করুক বা না করুক রশি নিয়ে লাকড়ির আঁটি পিঠে করে তা বাজারে বিক্রয় করে রোজগার করা অধিক সম্মানজনক।" তিনি আরো ইরশাদ করেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"নিজের হাতে উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম কোনো খাবার তোমাদের কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহ্‌র নবি দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।" (বুখারী শরিফ)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভরশীল হলে ঐ ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতি সত্যিকার উন্নয়ন ও উন্নতির পথ দেখতে পায়না। পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনেই রয়েছে উত্তম ও উন্নত জীবন গঠন, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন। তাই মুসলিম রাষ্ট্রের মসনদ মিম্বরে বসে মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে নবি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"নিচের হাত অপেক্ষা ওপরের হাত উত্তম।" (বুখারি শরিফ, মুসলিম শরিফ)

তাই মুসলিম জাতিকে হতে হবে আত্মনির্ভরশীল। আজ সারা বিশ্বে নির্যাতিত মুসলিম জাতিকে উন্নতির পথে যেতে হলে পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে স্বনির্ভরশীল হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (আল কুরআন, সূরা আর রা'আদ, পারা: ১৩, আয়াত: ১১)

মাইজভাণ্ডারী দর্শন অনুশীলনে আল্লাহ তায়ালার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি সমস্ত পরনির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করেন। জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হলে জীবনে উন্নতির দুয়ার খোলে যাবে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতির জন্যে পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করে আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা কত যে বেশি তা আজ বিশ্ব বিবেগ বুঝতে শুরু করেছে।

১.২. ফানা আনিল হা'ওয়া (فناء عن الهوى)

আভিধানিক পরিচয় ঃ

হা'ওয়া (هوى) আরবি শব্দ। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য। বহুবচনে এর অর্থ হলো: কামনা, বাসনা, ভালোবাসা, বায়ু, বাতাস, সংবাদ, শূন্যবস্তু ইত্যাদি (মওলানা আবূ সুফ্য়ান (যাকী) ও মওলানা ফজলুদ্দীন শিবলী, ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ, ঢাকাঃ রশিদিয়া লাইব্রেরী, জানুয়ারি ১৯৯৮ইং, পৃ. ৮৪০)

পারিভাষিক পরিচয় ঃ মানুষের জীবন চলার পথে যা না হলেও চলে এমন অনর্থ কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাকে সুফির পরিভাষায় 'ফানা আনিল হা'ওয়া' বলে।

হযরত মওলানা দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বলেন, 'অনর্থ পরিহার- যাহা না হইলে চলে সেই কাজ কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা। ছুফী পরিভাষায় বলে "ফানা আনিল হা'ওয়া।" (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মানব সভ্যতা, প্রাগুক্ত) তিনি আরো বলেন, "ফানা আনিল হা'ওয়া" অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা। (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে মোত্লাকা, প্রাগুক্ত)

ফানা আনিল হা'ওয়া'র অপর একটি নাম রয়েছে, আর তা হলো- "তেলাওয়াতে অজুদ" যেমন সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বলেন, যাহা না হইলে চলে সেইরূপ অনর্থ কাজ কথা-বার্তা এড়াইয়া চলা। পরদোষ পরিহার এবং নিজদোষ স্মরণ করা, যাহাকে ছুফী পরিভাষায় "তেলাওয়াতে অজুদ" বলে। (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ)

সহজভাবে যদি বলি, ফানা আনিল হা'ওয়া বলতে অনর্থ পরিহারকে বুঝায়। অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ, আচার-আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখাই ফানা আনিল হা'ওয়া।

সমাজ ও জাতির উন্নয়নে ফানা আনিল হা'ওয়া ঃ

নৈতিক, মানবিক, সমাজ, সভ্যতা, দেশ, জাতির উন্নয়নে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী

(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র 'ফানা আনিল হা'ওয়া' এক বিশাল কার্যকর ক্ষমতা সংরক্ষণ করে আছে। এ দর্শন ধর্মীয় চেতনাকে যেমন সঠিকভাবে সুরক্ষা করে, তেমনি সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধি অর্জনে সহযোগিতা করে।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় অনুশীলনীয় উছুলে ছাবয়ার পদ্ধতির অন্তর্গত 'ফানা আনিল হা'ওয়া' পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে পারলে সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সুনিশ্চিত হতে পারে। অনর্থ পরিহার করেই ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয়। মুমিন এমন কাজ করে না, যাতে ইহকালীন ও পরকালীন কোনো কল্যাণ নেই। উপকারশূন্য কাজ হচ্ছে 'অনর্থক'। যা পরিহার করাই ঈমানের দাবি। ঈমানদারগণের সার্বিক সফলতা ও উন্নতির ব্যাপারে কুরআন মজিদের বিবৃত হলো–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ .

"নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ; যারা নিজেদের মধ্যে বিনয়-নম্র হয় এবং যারা অনর্থক কথাবার্তার দিকে দৃষ্টিপাত করে না।" (আল কুরআন, সূরা আল মুমিনুন, পারা: ১৮, আয়াত: ১-৩)

মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে 'অনর্থ' এমন এক উপাদান যা উন্নয়নের পথে অন্তরায়। তাই মুসলমানদেরকে অনর্থ পরিহারের আহ্বান করে নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "মুসলিম ব্যক্তি অনর্থ পরিহারে ইসলামের সৌন্দর্য বিরাজমান।" (তিরমিযী শরিফ, হা. নং-২৩১৮)

ইসলামের শিক্ষা হলো 'কথা কম, কাজ বেশি'। তাই যা না হলেও চলে সেরূপ কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাদেয় মাইজভাণ্ডারী দর্শন। অযথা ও অসংযত কথাবার্তা হতে বিরত থাকা, বিনা কারণে পরিচিত- অপরিচিত কোনো লোকের সাথে কথা না বলা, প্রশ্ন না করা, উত্তর না দেয়াই উত্তম। হযরত মুগিরা বিন শুবা (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ .

"রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি কথাবার্তা ও অনর্থক প্রশ্নকরা হতে নিষেধ করেছেন।" (বুখারি শরিফ, হা. নং ৬৪৭৩)

অনর্থক কথাবার্তা, প্রয়োজনের বেশি কথা মানুষকে কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। যা উন্নয়নের অন্তরায়। আল্লাহ্‌র নবির আদর্শ হলো আমল, কাজ ও কর্ম। দুনিয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবিব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ এনেছেন তা অনর্থক ও বেশি কথা বলার আদর্শ নয়, কাজের আদর্শ। যে কাজ সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আল্লাহ্‌র নবির হাদিস শরীফগুলো প্রধানত দু'প্রকার। কতগুলো হাদিস হলো কথাবার্তার বা মৌখিক হাদিস, পরিভাষায় সেগুলোকে বলা হয় 'হাদিসে কাউলি' (حديث قولى) কিছু হাদিস শরিফ হলো কাজ-কর্মের হাদিস। যেগুলোকে হাদিসে

ফেয়লি-আমলি (حديث فعلى-عملى) বলা হয়। কানযুল উম্মাল নামক গ্রন্থে বিশাল একটি হাদিস গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবীর মৌখিক তথা কথার হাদিসগুলোকে এবং আল্লাহ্‌র নবির কাজের হাদিসগুলোকে সংকলন করা হয়েছে। লক্ষ করা যায়, আল্লাহ্‌র নবির কথার হাদিসের তুলনায় কাজের হাদিস হচ্ছে দুইগুণ বেশি। অর্থাৎ কথা কম, কাজ বেশি। কাজের মাধ্যমে তাঁর জাতিকে উন্নতি করতে তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। কাজের মাধ্যমে মাটির মানুষ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হয়। যারা ধর্মীয় অনুশীলনের সাথে সাথে সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। অনর্থক কথাবার্তা তা থেকে দূরে রাখে। তাই তিনি অপ্রয়োজনীয় ও বেশি কথাবার্তা পরিহার করেছেন। তিনি কাজের মাধ্যমে আদর্শ মানব গঠন করেছেন। শুধু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের কথা বলেছেন তা নয়, বরং কাজের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রদর্শন করেছেন।

ইহকালীন উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে মানুষকে নিষ্প্রয়োজনীয় আজে-বাজে কথাবার্তা থেকে জবানকে বিরত রাখা আবশ্যক। জবানের অপব্যবহার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ধ্বংস ডেকে আনে। আমাদের পুরো সত্তাকে ইহকালীন ও পরকালীন বিপদে নিপতিত করে। আমাদের সত্তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নক্ষিপ্ত করে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন মানুষ সকাল বেলায় উপনীত হয়, তখন তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জবানকে লক্ষ করে বলে, হে জবান! তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, কেননা আমরা তোমারই অনুগামী। তুমি যদি সোজা থাক তাহলে আমরাও সোজা থাকব, আর তুমি যদি অবাধ্য হও তাহলে আমরাও অবাধ্য হয়ে যাব।" (তিরমিযী শরিফ, কিতাবুয যুহদ, বাবু মাযায়া হিফযুল লিসান, হা. নং ২৪১৫, খণ্ড-৪, পৃ. ১৮৩)

একজন মানুষ তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ ব্যবহার করার জন্যে জবানের হেফাজত করতে হবে। কারণ, জবান একটি হিংস্র জন্তুর ন্যায়। যদি তাকে আবদ্ধ রাখা না যায়, তাহলে তা শত্রুতে পরিণত হবে এবং ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন করবে। অনর্থক কথাবার্তা, লাগামহীনভাবে বক্‌বক্ করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের নির্গত প্রতিটি শব্দেরই নোট করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌র বাণী-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা কা'ফ, পারা: ২৬, আয়াত: ১৮)

অনর্থক কথাবার্তা মানুষের জীবনে বিভীষিকাময় করে তুলে। জীবনযাত্রা কঠিন ও ঝামিলা যুক্ত হয়ে পড়ে। উন্নতি ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। বাকবিতণ্ডা, পরদোষ চর্চা, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা, অপবাদ, চুগলি, অভিসম্পাত করা, গালি, অশ্লীলতা, সমালোচনা, অহেতুক বাদানুবাদ, জ্ঞান বিহীন ফতওয়া প্রদান, মাতম করা, কারো গোপন রহস্য ফাঁস করা, দ্বিমুখী কথা বলা, অবৈধ সুপারিশ করা, কর্কশ ভাষায় কথা বলা, মানুষকে মন্দ নামে ডাকা, অহেতুক মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও ধমক দেয়া, অবৈধ কথা বলা, কারো সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, কিংবা উপহাস করা, পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা, নিজের ইবাদত প্রকাশ করা, মিথ্যা অঙ্গিকার করা, খোঁটা দেয়া ইত্যাদি সবই অনর্থক কথাবার্তা। যেগুলো মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক অবনতি ঘটায়। এ সমস্ত কথাবার্তা পরিহারে সার্বিক উন্নতির পথকে উন্মুক্ত করে। হযরত সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমার জন্যে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করবে। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি বল, আমার প্রভু এক আল্লাহ অতঃপর তুমি এর ওপর অবিচল থাকো। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপনি আমার মধ্যে কোনো জিনিসটি (সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির পথে) সর্বাধিক ভয়ঙ্কর মনে করছেন। তখন তিনি স্বীয় জবানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটা অর্থাৎ অনর্থক কথাবার্তা। (তিরমিযী শরিফ, কিতাবুজ যুহদ, হা. নং-২৪১৮, খণ্ড-৪র্থ, পৃ. ১৮৪)

বেশি ও অনর্থক কথাবার্তার কারণে বান্দা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চিত বান্দা সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন হতে বঞ্চিত হতে বাধ্য। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র দর্শন হলো খোদার যিকির ধরো, বেশিকথা ছাড়ো।

রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তুমি আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতিত অন্যান্য কথাবার্তা বেশি বলো না। কেননা আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতিত অন্যান্য কথাবার্তা বেশি বলা কলবকে পাষাণ করে দেয়। আর পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ থেকে দূরে থাকে।" (তিরমিযী শরিফ, কিতাবুল ফিতন, হা. নং ২৪১৯, খণ্ড-৪র্থ, পৃ. ১৮৪)

বেশি কথাবার্তা ক্ষতি ডেকে আনে। আর কম ও প্রয়োজনীয় কথা মানুষের জীবনকে উন্নত করে। হযরত আমর ইবনুল আস (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, কথা বলা ওষুধের সমতুল্য। যদি তুমি তা স্বল্প ব্যবহার কর, তাহলে তা তোমার উপকারে আসবে। আর যদি তুমি তা অধিক ব্যবহার কর তাহলে তা তোমার ক্ষতিসাধন করবে। (আল মুস্তাতরাফ ফি কুল্লে ফান্ নিন মুস্তাজারফ, খণ্ড-১ম, পৃ. ১৪৭)

অনর্থক কথাবার্তা উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায়। তাই উন্নতি ও অগ্রগতির

সোপানে আরোহণের জন্যে অনর্থক কথাবার্তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। কেননা এরূপ কথাবার্তাতে যে সময় ব্যয় করা হয়, তা তাতে ব্যয় না করে কল্যাণমূলক কথাবার্তাতে ব্যয় করা গেলে ইহকালীন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, আমি তোমাদেরকে অনর্থক কথাবার্তা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি। মানুষের জন্যে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কথাবার্তা বলাই যথেষ্ট। (ইয়াহিয়াউল উলুম, কিতাব আফাতিল লিসান, খণ্ড-৩য়, পৃ. ১৪২)

মানুষের অনর্থক বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রধান হলো অনর্থক কথাবার্তা। যা পরিহারের মাধ্যমে নিজেকে সমাজ ও জাতিকে উন্নতির মর্যাদার সোপানে নিয়ে যেতে পারে।

হযরত ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, হযরত লোকমান হাকিম (আলাইহিস্ সালাম) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আমরা আপনার যে স্থান ও মান-মর্যাদা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আপনি কীভাবে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন? তিনি বললেন, সত্যকথা বলা, আমানত আদায় করা এবং অনর্থক কথাবার্তা পরিহারের মাধ্যমে। (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল কালাম, বাবু মাযায়া ফিস্ সিদ্ক ওয়াল কিয্ব, হা. নং-১৯১১, খণ্ড-২য়, পৃ. ৪৬৭)

অনুরূপ অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকলে উন্নত জীবন লাভ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

"প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তাদের কাজ অনুপাতে নিরূপিত হবে। তোমাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।" (আল কুরআন, সূরা আল আহকাফ, পারা: ২৬, আয়াত-১৯)

কাজের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি হয়। বাজে কাজ-কর্মের প্রতিফল হলো মন্দ। তাই উন্নয়নের জন্যে শুধু কাজ নয়, চাই ভালো ও যথাযথ কাজ। তাই জীবনে উন্নতি করতে এবং সমাজ দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজের কর্মকে শোধ রায়ে অনর্থ কাজ পরিহার করলে সমাজ, দেশ ও জাতি তার উন্নয়ন কর্মের পুরস্কার হিসেবে তাকে ভালোবাসার পাত্র হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়ালাও তাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ .

"মন্দের প্রতিফল সে রকমের মন্দ। পরে যে কেউ ক্ষমা করে দেবে ও সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র জিম্মায়। যারা জুলুম করে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে না।" (আল কুরআন, সূরা আশ্শুরা, পারা: ২৫, আয়াত-৪০)

প্রতিটি লোকের উচিত অনর্থ কাজ পরিহার করা। এ লোক যখন বাজে কাজে লিপ্ত হয়,

তখন সে যে কোনো উন্নয়ন কর্ম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। তার পরিবার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নেও সে অবদান রাখতে পারে না। তাই অনর্থ কাজ পরিহার করে নিজেকে সংশোধনের মাধ্যমে সঠিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ইসলামের মহৎ শিক্ষা। যেমন নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ইসলামের সৌন্দর্য সমূহের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অনর্থক কাজ পরিত্যাগ করা। তাঁর ইসলামই সুন্দর ও মজবুত যে উপকারী কাজে লিপ্ত থাকে, অনর্থ কাজ করা হতে বিরত থাকে।" (আল হাদিস)

অনর্থ কাজে লিপ্ত থাকা উন্নয়নের গতিকে থামিয়ে দেয়া। তাই অনর্থ কাজ অনর্থ কাজে লিপ্ত থাকা উন্নয়নের গতিকে থামিয়ে দেয়া। তাই অনর্থ কাজ পরিহার করলে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নতি সাধিত হবে। কুরআন-হাদিসে অনর্থ কাজ পরিহার করতে বলা হয়েছে। কাজ করা ও অনর্থকাজ পরিহারেই দু'জাহানের কল্যাণ ও উন্নতি নিহিত আছে। তাই আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ ও নিষেধ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। অন্যথায় উন্নয়নের পথ হারিয়ে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا .

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল-আহযাব, পারা: ২২, আয়াত: ৩৬)

যথাযথ উন্নয়ন সাধনের জন্যে সুন্দর ও উন্নত আচার-আচরণের প্রয়োজন। ফানা আনিল হা'ওয়া মানুষের আচার-আচরণেও উন্নতি সাধন করে। এই দর্শন মানুষের মন্দ আচরণের দিকটি বিনাশ করে ভালো ও উত্তম আচরণের উন্মেষ ঘটায়। অহংকার, রাগ, কু-চিন্তা, বিদ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, কু-ধারণা, প্রশংসা ও যশপ্রীতির চেতনা, কৃপণতা, লোভ-লালসা, আত্মগর্ব, গোঁড়ামী ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে। যার ফলে ব্যক্তি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা অর্জন করে। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا .

"তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।"

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক ব্যক্তির উন্নতি পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতি। কাঙ্ক্ষিত আদর্শের আলোকে যে কোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তির গঠন ও বিকাশ। এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের লক্ষ হলো ব্যক্তিত্বের যথাযথ

বিকাশ সাধন। আর ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশের জন্যে চরিত্র প্রধান শর্ত। একজন আদর্শবান, সৎ ও চরিত্রবান লোকেই নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে সক্ষম। সৎ চরিত্রের বিপরীত যা কিছু তা সবই অনর্থ। যা পরিহার করা আবশ্যক। তিন প্রকার বিনাশ স্তরের দ্বিতীয় স্তর ব্যক্তির দুনিয়াবি হরেক রকম আজে-বাজে জিনিস নিয়ে আড্ডা দেয়া, সিনেমা-নাটকে মগ্ন হওয়া, অশ্লীল গান-বাদ্য শ্রবণ করা, অশ্লীল উপন্যাস, কবিতা ও নবেল পাঠ করা, অপ্রয়োজনীয় খেলাধূলা করা ও দেখা, জুয়া খেলা, সিনেমা, বাইস্কোপ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন করা, মদ, গাজা, ইয়াবা, ভাং, আফিম, হেরোইন প্রভৃতির নেশা, বিড়ি, সিগারেট, তামাক সেবন সহ সকল প্রকার বদ অভ্যাসের বিনাশ করে ভালো দিকের উন্মেষ করে। নিজের ভিতর আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত করে। ফলে ব্যক্তির ভিতরে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও যোগ্যতার মূল্য ও মর্ম বুঝতে পারে। উপলব্ধি করতে পারে নিজের সফলতা বা ব্যর্থতার পার্থক্য। এতে নিজেকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা অর্জনের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে।

উন্নত নৈতিকতা নির্ভর সভ্যতায় আসল উন্নয়ন। মাইজভাণ্ডারী দর্শন ব্যক্তি সত্ত্বার উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায় বিশ্বাসী। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই উছুলে ছাবয়া উপস্থাপন করেছেন। পীর-মুর্শিদের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি সুকৌশলে ব্যক্তি, মানুষকেই আহ্বান জানিয়েছেন। তরিকতের সবক ও সিলসিলার বায়'আতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা ও রাসুলের সত্যিকার আশিক হওয়ার জন্যে এবং পরকালের মুক্তির জন্যে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের সহজ উপায়- উপকরণ দিয়েছেন। আদেশ-নিষেধের বিধান দিয়েছেন ব্যক্তিকে। ইহকালের কর্ম ও পরকালের মর্ম ব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্যে এমন উছুল বা পদ্ধতি দিয়েছেন যে, ব্যক্তিই দুনিয়াতে কর্ম সম্পাদনকারী এবং সর্বশেষে কর্মস্থল ভোগকারী। এ উছুল পালন করা মাইজভাণ্ডারী তরিকায় অপরিহার্য কর্তব্য। এ উছুল ইহকালীন উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির সন্ধান দেয়। 'মাইজভাণ্ডারী' উপাধি লাগিয়ে যারা এ উছুলের পরিপন্থি পথে চলেন; তারা পথভ্রষ্ট। যারা সত্যিকারের মাইজভাণ্ডারী তাদেরকে এ পথভ্রষ্টরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

عليكم أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ .

"নিজেদের হিফাজত করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তোমরা যখন সঠিক পথে থাকবে তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা, পারা: ৭, আয়াত: ১০৫)

আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নকল্পে অনেক কল্যাণপদ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। কিন্তু তার অধিকাংশই সফলতার মুখ দেখে না। সমাজ, দেশ ও জাতির বিরাজমান সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন সমস্যাদি চিহ্নিত করে সেগুলোর যথার্থ সমাধানের আইন প্রণীত হলেও তার প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না অনেকাংশেই। ফলে

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হয় না। কারণ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের অভাব। নৈতিক অবক্ষয়ই এর মূল কারণ। শুধু আর্থসামাজিক উন্নয়ন নয়, কোনো সদার্থক উন্নয়নই সম্ভব নয় নৈতিকতা বিবর্জিত জনবলের মাধ্যমে। এ অভাব দূরীকরণে ফানা আনিল হা'ওয়া (অনর্থ পরিহার) অসামান্য সফলতার পরিচয় দিতে সক্ষম। কেননা উছুলে ছাবয়া'র এ দর্শনের আলোকে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সে আদর্শের পতাকাবাহী, প্রচারক ও পথ-প্রদর্শক ও মহান গাউছুল আজম।

সমাজ, দেশ ও জাতির যথার্থ উন্নয়নের জন্যে সম্পদ (Resources) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পদের অপচয় যেমন একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করে; তেমনি উক্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার না করলেও সে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। সমাজ দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্যে অনর্থক সম্পদ নষ্ট করা, অপচয় রোধ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

"অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।" (আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাইল, পারা: ১৫, আয়াত: ২৬)

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا .

"খাও এবং পান করো কিন্তু অপচয় করো না।" (আল কুরআন, সূরা আল-আরাফ, পারা: ৮, আয়াত: ৩১)

উন্নয়নের ক্ষেত্রে সব ধরনের অপচয় রোধ করা গুরুত্বপূর্ণ। 'ফানা আনিল হা'ওয়া'র মাধ্যমে সব ধরনের অপচয় যেমন, সম্পদের অপচয়, মেধার অপচয়, সময়ের অপচয় করা নিষেধ করা হয়েছে। যা সার্বিক উন্নয়নের একটি কৌশল। এ ক্ষেত্রে ফানা আনিল হা'ওয়ার মর্মবাণী আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম কৌশল বলে বিবেচিত।

'ফানা আনিল হা'ওয়া' এ দর্শন মানুষের প্রয়োজনবোধ সম্পর্কে সচেতন করে। 'চাহিদা অসীম' অর্থনীতির পরিভাষাটি মানুষের প্রকৃতিগতভাবে যথার্থ হলেও ইসলামি দৃষ্টিকোণে যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ মানুষের ক্ষমতা সসীম। কাজ করার ক্ষমতা ও শক্তি, উপভোগ করার ক্ষমতাসহ মানুষের জীবনের সব তৎপরতাই একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলে আবদ্ধ। "সাধ ও সাধ্যের যথার্থ সমন্বয়ের মাঝেই জীবন" এটাই যথার্থ। মানুষকে জীবনবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দর্শন।। কারণ এ দর্শনে অপ্রয়োজনীয় চাওয়া-পাওয়ার আশা পরিহার করতে হয়। অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার যেমন, অলংকার, অঙ্গ বিকৃতকারী পোষাক-পরিচ্ছদ, নৈতিক ও দৈহিক অবনতি ঘটায় এমন সকল বস্তু থেকে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অভাব-অনটন, আর্থিক দুর্গতি আনয়ন করে এমন কাজ-কর্ম, ভূষণ, ফ্যাসন, লোভ-লালসা, মোহ

ইত্যাদি পরিহার করতে হয়। ফলে সমাজের মানুষ জীবনবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের প্রকৃত প্রয়োজন কতটুকু তা স্পষ্ট তারা বুঝতে পারে। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের প্রতি ইংগিত করে বলেন,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ .

"হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ বস্তুগুলোর মধ্যে প্রতিটি আদম সন্তানের অধিকার রয়েছে। বাসস্থানের জন্যে ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্যে বস্ত্র এবং স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয়।" (তিরমিযী শরিফ)

ইসলামি স্কলারগণ মানুষের মৌলিক চাহিদা বলেছেন- ১. খাদ্য, ২. বস্ত্র ৩. বাসস্থান ৪. চিকিৎসা ৫. শিক্ষা ও ৬. বিবাহ এ ছয়টি প্রয়োজনকে। মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত চাওয়া পাওয়ার লোভ-লালসাই মানুষকে অপকর্মে লিপ্ত করে। মানুষের মধ্যে অসম্মতি, সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। জীবনযাত্রা কঠিন ও ঝামেলাপূর্ণ হয়ে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মাইজভাণ্ডারী তরিকার এ দর্শন মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন কতটুকু তা স্পষ্ট করে দেয়। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে তারা অংশগ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়। অনর্থ পরিহারে মানুষ অল্পে তুষ্ট হয়। প্রশান্ত আত্মায় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। উছুলে ছাবয়া'র দ্বিতীয় স্তরে বান্দা ফানা হলে, এর ধারণা চিন্তা ও কর্মে বদ্ধমূল করা গেলে প্রকৃত প্রয়োজনবোধ সম্পর্কে মানুষকে যথাযথভাবে সচেতন করা যাবে। অন্যথায় শুধু পাওয়ার প্রতিযোগিতায় সব ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবে। আত্মকেন্দ্রিক, আত্মঘাতি মনোভাব প্রকাশ, বিদ্বেষ, হানাহানি, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাবে।

অনর্থ, অযথা ও অসংযত কথা, কাজ, আচার-ব্যবহার সকল পাপের মূল, কলহ, বিবাদ ও ঝামেলা সৃষ্টির উৎস। অনর্থ পরিহারে জীবন যাত্রার পথ সহজ, ঝামেলামুক্ত ও উন্নত হয়। সকল ধরনের লোভ-লালসা হতে রক্ষা পাওয়া যায়। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর তরিকায় নির্দেশিত উছুল দ্বারা মানুষ তার সকল ধরনের প্রয়োজনবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

ফানা আনিল হা'ওয়া একটি সার্বিক সফলতা ও উন্নয়নের জন্যে অন্যতম কৌশল। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের লক্ষ ও নির্দেশনা হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব অনর্থ পরিহার পূর্বক প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি লাভ পূর্বক আল্লাহ তায়ালার খাঁটি বান্দা হয়ে দু'জাহানের কামিয়াবি অর্জন করা।

১.৩. ফানা আনিল এরাদা (فناء عن الارادة)

আভিধানিক পরিচয় ঃ

এরাদা (إِرَادَةٌ) এক বচন। বহুবচনে এরাদাত (ارادات)। অর্থ হলো, ইচ্ছা, বাসনা, অভিপ্রায়, অভিলাষ (ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২)

পারিভাষিক পরিচয় ঃ পরিভাষায়, মানুষ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তারপর তার যাহেরি, বাতেনি, শারীরিক, মানসিক যা কিছু অনুকূলে বা প্রতিকূলে ঘটবে, নিজের সবকিছু আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করাকে ফানা আনিল এরাদা বলা যেতে পারে।

হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর মতে, 'খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া এবং নিজের ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলিন করাকে ফানা আনিল এরাদা বলা হয়। (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, প্রাগুক্ত)

ফানা আনিল এরাদা'র দর্শনে সমাজ ও জাতির উন্নয়ন ঃ

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিনাশ ঈমানদারের লক্ষণ। সাধ্য অনুযায়ী কাজ করলে, নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার পূর্ণতা আল্লাহ প্রদান করেন। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

السَّعْيِ منى والإتمام مِن الله .

"চেষ্টা আমার পক্ষ থেকে পূর্ণতা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে।"

এতে আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি বান্দার কাজের ফলাফল অনুকূলে হোক কিংবা প্রতিকূলে, তা সে সহজে মেনে নিতে পারে।

ফানা আনিল এরাদা মানুষের ঈমানের দৃঢ়তা আনে। আর ঈমানের সাথে আমল তথা কাজের সম্পর্ক রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে, তখন তার প্রতিটি কাজের ফলাফল আল্লাহ্‌র ওপর সোপর্দ করে। ঈমানে মুফাস্‌সালে সেই বিষয়ের সহজ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র ওপর, তাঁর ফেরেস্তাগণের ওপর, তাঁর কিতাব সমূহের ওপর, তাঁর রাসুলগণের ওপর, আখিরাতের ওপর, তাকদিরের ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়- এর ওপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার ওপর।"

এরূপ বিশ্বাস একজন মানুষের মধ্যে গতি এবং কাজের প্রাণশক্তি ফুঁকে দেয়। মানুষ

আল্লাহ্‌র রহমতের অনুসন্ধানে মাঠে, ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে, মাটির ওপরে ও নিচে, গভীর সমুদ্রে তাদের প্রচেষ্টা চালায়। এতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ব্যর্থতা আসলেও অবনলেও তার মনে কষ্ট আসে না। উন্নয়নের পথে সে কোনো অযাচিত বা অপছন্দনীয় বিষয় ঘটলে সেটাকে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ মনে করে। মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার ওপর অভিযোগ পরিত্যাগ করে। মানুষ যে কোনো উন্নয়ন ও কল্যাণময় কাজে চেষ্টা করবে, পরিশ্রম করবে। তারপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে ফয়সালা ঘটবে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং মুখে বা অন্তরে কোনো অভিযোগ আনে না। সদা আল্লাহতে রাজি থাকে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দেয়ার মাধ্যমে বান্দা তার পদযুগল কর্মপ্রচেষ্টায় দৃঢ়ভাবে জমিয়ে রাখে। ফলে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে মাথা পেতে বরণ করেন। নিজের কর্মের ওপর অবিচল থাকে। দুঃখ, কষ্ট, বিপদ-আপদে অস্থির বা হতাশাগ্রস্ত হওয়া বা নিরাশ হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দেয় না। এতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়।

বান্দা যখন তাঁর সব কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে সঁপে দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সফলতা দান করেন। কারণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিত কোনো কিছু হতে পারে না- এই বিশ্বাস আত্মাকে উন্নত করে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি লাভে তার অন্তর ব্যাকূল হয়ে ওঠে। ফলে চেষ্টা-তদবির করে সে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ লুফে নিতে সচেষ্ট হয় এবং এ ক্ষেত্রে কামিয়াবির জন্যে মনে মনে আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করেন। কুরআনে বর্ণিত হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের উক্তি হলো–

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

"আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্যে।" (আল কুরআন, সূরা আল আনআম, পারা-৮, আয়াত: ১৬২)

মউতে আরবা' (موت اربعة)

পরিচিতি ঃ

মউত (موت) অর্থ মৃত্যু। আরবা (اربعة) অর্থ হলো চার। তিন ও পাঁচের মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। সুতরাং 'মউতে আরবা' অর্থ হলো- চার প্রকার মৃত্যু।

মানুষ মরণশীল। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ জন্ম নেয়। একদিন আবার নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয় অবিনশ্বর জগতের উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ . "প্রত্যেক প্রাণিকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।" (আল-কুরআন, সুরা: আম্বিয়া)

সাড়ে তিন হাত মানুষের শরীর থেকে রূহ বা আত্মা বেরিয়ে গেলেই মানুষ মৃত বলে পরিগণিত হয়। এ মৃত্যু সম্পর্কে সকলেই অবগত। কিন্তু গাউছুল আজম শাহ্ সুফি মওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর 'উছুলে ছাবয়া'য় যে মৃত্যুর কথা বলেছেন তা এ ধরণের মৃত্যু নয়। বরং মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ব্যবহৃত 'মউতে আরবা' একটি পরিভাষা। যেটি আধ্যাত্মিক জগতে কেবলমাত্র মাইজভাণ্ডারী তরিকায় প্রথম উচ্চারিত ও একমাত্র পরিভাষা। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় স্বতন্ত্র ও অনন্যতার এক উজ্জ্বল পরিভাষাটি বিশ্ববাসীর জন্যে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র বিরল উপহার। এ উপহারে রয়েছে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– تحفة المؤمن الموت "মৃত্যু মুমিনের উপহার" এর প্রতিধ্বনি। চার প্রকারের মৃত্যু মূলত সাধারণ কোনো মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর প্রকারের বর্ণনায় নয়। মউতে আরবা'র পরিচয় বলা যায়, মউতে আরবা বা চার প্রকারের মৃত্যু হলো, মানুষ সংযমী হয়ে পাপ বিরত অভ্যাস অর্জন, পরের নিন্দাকে আত্মশুদ্ধির কাজে লাগিয়ে কামভাব এবং লালসামুক্ত নির্বিলাস জীবনের সন্ধান করা।

মউতে আরবা বা চার প্রকারের মৃত্যু দ্বারা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মানুষকে উন্নত ও অনন্তজীবনের সন্ধান দিয়েছেন। এই চতুর্বিধ মৃত্যুর ভিতরে মানুষ জীবনের সন্ধান করলে পার্থিব জীবনে উন্নতি আর পরকালের মুক্তি নিশ্চিত হওয়া যায়। চতুর্বিধ মৃত্যুকে বরণ করলে সুখময় ও উন্নত জীবন লাভ করা যায়। তাই চিরসুখ ও উন্নত জীবন লাভের জন্য চতুর্বিধ মৃত্যুকে বরণ করার কথা বলা হয়েছে মাইজভাণ্ডারী তরিকায়। পরকালের উন্নতি যেহেতু ইহকালের জিন্দেগিতে নিহিত আছে তাই মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যুতে আমরা সমাজ ও জাতির কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নতির সন্ধান করে যাবো।

২.৪. মউতে আবয়্যাজ (موت ابيض)

আভিধানিক পরিচয় ঃ

আবয়্যাজ (ابيض) অর্থ- সাদা, শ্বেত, শুভ্র, উজ্জ্বল, খাঁটি, নির্ভেজাল, নিষ্কলঙ্ক, দাগবিহীন ইত্যাদি। স্বাভাবিক মৃত্যুকেও 'মউতে আবয়্যাজ' বলা হয়। (ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫)

বিশেষ সময়ে বা দিনে উপবাস, আয়ত্ব বস্তু গ্রহণে সংযম বা ধৈর্যধারণ করা, পাপ বিরত হওয়া। (বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ, প্রাগুক্ত)

পারিভাষিক পরিচয় ঃ মাইজভাণ্ডারী তরিকায় অধিকার লব্ধ বৈধ কাজে সংযম অবলম্বন ও পাপ বিরত অভ্যাস মানসে বর্জন করাকে 'মউতে আবয়্যাজ' বলে। (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মানব সভ্যতা, প্রাগুক্ত)

সংযম শুদ্ধিঃ দোজাহানের উন্নতি ঃ

উপবাস এবং সংযমের মাধ্যমে 'মউতে আবয়্যাজ' অর্জন হয়। যার আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন ও অপরের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের কঠোর অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুণ্যময় পরিবেশ বিরাজ করে। উপবাস এবং সংযম হাসিলের উত্তম পন্থা হলো সিয়াম বা রোযা। সংযমের সাধনাই হলো রোযার শ্রেষ্ঠ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই সংযমের অভ্যাস গড়ে তোলার নিমিত্তে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) রোযার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বাণী– "আমার ছেলেরা সবসময় রোযা রাখে"। রোযার উপবাস ও সংযমের নির্দেশ আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির জন্যে যেমন অনুগ্রহ, তেমনি ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নে মহান নিয়ামক সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানব জীবনের নেতিবাচক দিকসমূহ যেমন লোভ-লালসা, পাশব প্রবৃত্তিসহ সকল অন্যায় ও পাপ কাজ সমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তি অর্জিত হয়। জাতির এ অর্জনের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভাবিত হয়। ফলে কল্যাণ, শান্তি, উন্নতি ও স্থিতিশীলতা স্থাপনে রোযা পালনের অবদান সুদুরপ্রসারী। রোযার দ্বারা সংযম অবলম্বন করা হয়। সংযম কুপ্রবৃত্তি দমন করে সমাজ ও রাষ্ট্রে সৎ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ দেয়। রোযার সংযম ও তাকওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণে মানব সত্তায় যে পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়, সে অনুযায়ী বারো মাস পুণ্যময় জীবন যাপন করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সচেষ্ট থাকবে- এটাই রোযার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বলেন, "আমি বার মাস রোজা রাখি তুমিও রোযা রাখিও"। (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্লাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭)

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও সফলতা অর্জন হয়। জাতি হয় সফল। তাই সকল যুগের মানুষের জন্যে আল্লাহ তায়ালা রোযা ফরজ করে দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

"হে বিশ্ববাসীগণ! তোমাদের জন্যে রোযার বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পার।" (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, পারা: ২, আয়াত: ১৮৩)

তাকওয়া সমৃদ্ধ মানুষ গড়ার এ বিধান মানেই শান্তির বিধান। আত্মন্নোয়নের বিধান। এ বিধান সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নের বিধান। জননিরাপত্তা, মানব-মর্যাদা সেখানে পূর্ণ স্বীকৃত। অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে সবার সততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এ বিধান। উপবাস এবং সংযম স্বদেশ ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও উন্নয়নে

জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি, মেধা ও শক্তি ব্যয় করতে শিখায়। বিশ্বাসঘাতকতা পরিহার করে হাতে, মুখে, কাজে ও আচরণে অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

রোযা সংযম শিক্ষা দেয়। ব্যক্তির আত্মাকে পরিশোধিত করে তার উৎকর্ষ সাধন করে। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মনিগ্রহ করে না বা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির মৃত্যু ঘটায় না। বরং মানবিক চাহিদা ও দাবি পূর্ণ করে আত্মার মধ্যে যে কলুষ কালিমা জমা হয়, সাদা মৃত্যু তা দূর করে। ফলে আত্মা যেমনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, তেমনি সমাজ উন্নয়ন ও আদর্শ সমাজ গঠনেও ভূমিকা রাখে।

মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু যেহেতু রোযার মাধ্যমে আয়ত্ব হয়, তাই আদর্শ সমাজ গঠন ও উন্নয়নেও এ দর্শন অব্যর্থ হাতিয়ার। কারণ সংযম অবলম্বনকারী রোযাদারকে রোযা মিথ্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া, অশ্লীলতা, পরনিন্দা প্রভৃতি পাপাচার থেকে দূরে রাখে। মানুষের মধ্যে তৈরি করে সহানুভূতি, ভালোবাসা, সহযোগিতা মনস্কতা। তাকওয়া ও সংযমে গড়ে ওঠে একদল আদর্শ লোক। যারা একটি কাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। এতে সমাজ হয় উন্নত, জাতি হয় সমৃদ্ধ।

রোযা সমাজের নিরন্ন ও ক্ষুধাপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। রোযার শিক্ষা হলো– নিঃস্ব, দুঃখি ও দারিদ্র্য মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। রোযার মাধ্যমে বিত্তশালী মানুষ না খেয়ে থাকার দুঃসহ কষ্ট সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। রোযা মানুষকে সময়ানুবর্তী ও নিয়ামানুবর্তী করে। শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে ওঠে। নানা কু-অভ্যাস ও সামাজিক অনাচার নির্মূলের শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ্‌র নবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) অনুন্নত আরব সমাজ ও জাতি যারা যুগ যুগ ধরে বিবাদ-কলহে লিপ্ত, গোত্রে গোত্রে বিভক্ত, পরস্পর যুদ্ধরত অজ্ঞ বেদুইনদের অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন সংযম ও সংহতির মাধ্যমে। তিনি এক দুর্ধর্ষ উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে সুসংহত, সুশৃঙ্খল, কর্মমুখী, সৎ, সুখী এক আদর্শ ও উন্নত জাতিতে পরিবর্তিত করেছিলেন। তাঁর স্বীয় জীবনের আদর্শ, নীতি, আচরণ, ভূমিকা, কর্ম ও ত্যাগের মহিমায় এবং সর্বোত্তম নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি এ কাজে সমর্থ হয়ে ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথই মানবতার ইহকালের উন্নতি ও পরকালের মুক্তির একমাত্র উপায়। এর বাস্তবায়নই সুশীল ও উন্নত সমাজ গঠনের সাফল্য নিহিত। কুরআন-সুন্নাহয় বিধৃত ও বিবৃত ও মানবজাতির জন্যে অবশ্য পালনীয় বিধান সমূহের অন্যতম হলো রোযা। যা পালন করার জন্যে আল্লাহ্‌র নবির বংশধর, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'মউতে আবয়্যাজ' বা সাদা মৃত্যুর দর্শন দিয়েছেন তরিকত পন্থিদের জন্যে। তাঁর এ দর্শনে বর্তমান সমাজের যাবতীয় গলদ দূর করে ভবিষ্যৎ সুশীল

ও উন্নত সমাজ ও জাতি গঠনের সকল উপাদান রয়েছে, যা গবেষণা করা দরকার। সংযমের সাধনায়ই মানুষ পশুত্বের ঊর্ধ্বে ওঠে পরম সত্তার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়। নিজের কলুষ দূরীভূত হলে, সমাজ সংসার থেকে কলুষ দূর করার সাধনায় নিয়োজিত হওয়া যায়। সংযম ও উপবাস আপনাকে প্রকৃত মনুষত্বে উন্নিত করে। উন্নিত মানুষরাই পারে সকল ধরণের উন্নয়ন করতে।

২.৫. মউতে আছওয়াদ (موت اسود) বা কালো মৃত্যু ঃ

আভিধানিক পরিচয় ঃ

আছওয়াদ (اسود) অর্থ- কাল, কালো, কৃষ্ণবর্ণ, নিগ্রো। (ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১) মউতে আছওয়াদ অর্থঃ কালো মৃত্যু।

পারিভাষিক পরিচয় ঃ

শত্রুর শত্রুতায় বা নিন্দায়, সমালোচনাকারীর সমালোচনায় রাগান্বিত না হয়ে ধৈর্য সহকারে নিজের মধ্যে সমালোচনার, শত্রুতার বা নিন্দার কারণ অনুসন্ধান করে উহা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানোর গুণ অর্জন করাই হলো মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু। সহজভাবে যাকে বলে পরের নিন্দাতে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মশুদ্ধি।

কালো মৃত্যুর বরণে আলোর সন্ধান ঃ

মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু দ্বারা মানুষের মধ্যে আত্মসমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি হয়। শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দুকের নিন্দায় মানুষ নিজ দোষ-ত্রুটি খুঁজে আত্মবিশ্লেষণ করেন। নিজের মধ্যে যদি সত্যিই কোনো দোষ-ত্রুটির সন্ধান পান, তখন নিজেকে সংশোধন করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির সুযোগ পেয়ে যান। দোষ-ত্রুটি পরিত্যাগ পূর্বক নিজেকে সফলতার পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই সত্যিকারের উন্নতি ও সফলতা অর্জিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى .

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়।" (আল কুরআন, সূরা আল-আ'লা, পারা: ৩০, আয়াত:১৪)

উন্নয়নের লক্ষপানে পৌঁছতে হলে নিজেকে সবধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। আল্লাহ্‌র ঘোষণা–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا .

"নিশ্চয় যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।" (আল কুরআন, সূরা আশ্-শাম্‌স, পারা: ৩০, আয়াত: ৯)

এ ক্ষেত্রে সমালোচনাকারীর কারণেই আত্মশুদ্ধির পথের যাত্রী নিজ দোষ-ত্রুটি বুঝতে সুযোগ পায়। নিজের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি পরিত্যাগের সুযোগ পায়। আত্মোন্নয়নপূর্বক

সার্বিক উন্নতির দিকে এগুতে সক্ষম হয়। তাই সমালোচনা-কারীকে শত্রু মনে না করে বন্ধুরূপে দেখে। হযরত হাসান বসরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) কতই না সুন্দরভাবে বলেছেন, "যদি কেউ তোমার সমালোচনা করে, তার জন্যে উপহার পাঠাও। আর যদি তোমার শত্রুতা করে, তবে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করো।" আর যদি শত্রুর শত্রুতায় বা নিন্দায়, সমালোচনাকারীর সমালোচনায় নিজের কোনো দোষ-ত্রুটির কারণ নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করে না পায়, তখন নিজে নির্দোষ হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে নিজের মনোবলকে আরো দৃঢ় করে শক্তির সমাবেশ ঘটান এবং নিজেকে উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হন। মউতে আছওয়াদ তথা আত্মসমালোচনার মনোভাব যার ভিতরে সৃষ্টি হয়, তিনি শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দায়, সমালোচনায় সমালোচকের সমালোচনাকে গুরুত্বহীন মনে করে না। আবার সমালোচকের প্রতি রুষ্টও হয় না।

হযরত ইমাম হায়সামি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, "গীবত তোমাকে নিষিদ্ধ এবং অনাহুত কর্ম বর্জনের দিকে পথ-নির্দেশ করে। তাই গীবতকারী ও হিংসাকারীকে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করো।" একজন কবির দুটু চরণ এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক-

নিন্দুককে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।

আত্মসমালোচনার মনোভাব (মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু) যার অন্তরে সৃষ্টি হয় সেই ব্যক্তিই সফল মানুষ হতে পারে। যার ফলে সমাজে পারস্পরিক শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা হ্রাস পায়। ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র ও নিখিল বিশ্বে শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। বিশ্ববাসীকে তারা উপহার দিতে পারে উন্নত সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা। তাদের জীবন-মানের উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠি স্বার্থের ব্যাপার পরিহার করে সমাজ, দেশ ও দশের স্বার্থে কাজ করতে পারে। দ্বন্দ্ব, কলহ, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষক্রিয়া সঞ্চারিত করে। সমাজ ও দেশ থেকে মূল্যবোধ ও মানবতাবোধ নির্বাসিত হয়। সমাজের এ দুরবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে, সমাজের নৈরাশ্যজনক ও নৈরাজ্যজনক অবস্থা দূর করে মানুষের জন্যে সুস্থ সমাজ, সুশীল ও উন্নত, সুন্দর সমাজ গঠন করার জন্যে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র পদর্শিত নিখুঁত নির্দেশিকা উছুলে ছাবয়া মানুষের জীবনোপযোগী করে বলে দেয়া হয়েছে।

২.৬. মউতে আহ্‌মর (موت احمر) বা লাল মৃত্যু

আভিধানিক পরিচয় ঃ

আহ্‌মর (احمر) অর্থ হলো- লাল, রক্তিম, রক্তবর্ণ। (ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭) কামভাব পরিত্যাগ করা, লালসা হতে মুক্তি লাভ করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক পরিচয় ঃ অবৈধ কামভাব ও লালসার ছোবল থেকে নিজেকে সুরক্ষায় সতর্ক থাকাই হলো মাইজভাণ্ডারী দর্শনে মউতে আহ্‌মর (موت احمر) বা লাল মৃত্যু।

লাল মৃত্যু সমাজ ও জাতির সতর্কবাণী ঃ

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। একজন মানুষ চরিত্র ঠিক রেখে জীবনতরী পরিচালনা করবে এবং চরিত্র বিধ্বংসী আচার-আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এটাই কামনা ইসলাম। মানুষের রক্ষাকবজ হলো মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু। যা কামস্পৃহা ও লালসা হতে মানুষকে রক্ষা করে। অবৈধ কামস্পৃহা ও লালসা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয় ঘটায়। যৌবনের উম্মাদনা মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে। নীতি-নৈতিকতা বোধ হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে আসে মানুষ। যাকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় যিনা। যিনা হলো মানব ধ্বংসাত্মক এক দানব। যিনা মানব সমাজের গুরুতর সামাজিক সমস্যায় রূপ নেয়। নগ্নতার সীমালঙ্গন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়ন, উন্নতি ও সুস্থতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। জীবনে নিয়ে আসে অশান্তি ও পারিবারিক কলহ। রচনা করে মানবজাতির সর্বনাশার অধ্যায়। অসভ্য এ কর্ম থেকে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا .

"তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ ও খুব বেশি খারাপ পথ।" (আল কুরআন, সূরা বণি ইসরাঈল, পারা: ১৭, আয়াত: ৩২)

অবৈধ কাম-লালসা মানুষের জীবনে ও সমাজে চরম নৈতিক বিপর্যয় ও চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে। পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। মানুষকে পশুদের মতো চরম পাশবিক যৌনতায় মাতিয়ে তুলে। অবৈধ কামভাব-লালসার ফলে কুমারিত্ব হারায় নারী। জারজ সন্তান বৃদ্ধি পায়। পবিত্র সন্তানের অভাব দেখা দেয়। জাতির সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানবতা ও মনুষ্যত্বের দেউলিয়া বেশ্যাবৃত্তি ও বারাঙ্গনা বৃদ্ধি পায়। পবিত্রতা ও সতীত্ব বিলুপ্ত হয়। সমাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনার ছড়াছড়ি, অসামাজিক কর্মকাণ্ড চলে। সমাজে ধর্ষণ, ব্যভিচারের সয়লাব বয়ে যায়। সমাজের অপরাধ উৎপাদনের ময়দানেও অবৈধ কামভাব ও লালসার ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। ইভটিজিং সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। অবৈধ প্রেমে রাজি না হওয়াতে এসিড ছুঁড়ে সুন্দরী নারীর মুখ ঝলসে দেয়ার ঘটনা আর এখন নতুন কিছু নয়। অবৈধ প্রেমের কারণে হত্যা-আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় নিত্যই ঘটছে। অবৈধ কামাচারে লিপ্ত হতে যুব সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। পারিবারিক শৃঙ্খলার বিলোপ সাধন হচ্ছে। সাংসারিক জীবনে অশান্তির অনল জ্বলছে। দাম্পত্য জীবনের অপমৃত্যু ঘটছে। নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতির কর্ণধার যুবক-যুবতীর ওপর যৌন প্রভাব পড়ছে। বিভিন্ন যৌন ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি যুব সমাজের শারীরিক শক্তি নাশ হচ্ছে। অবৈধ কামস্পৃহা ও লালসা আধ্যাত্মিক, নৈতিকতাকে যেমন ধ্বংস

করে দেয়, অন্যদিকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির উন্নয়নেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। যৌনতার উন্মাদনায় চরিত্রহীনতার দুর্গন্ধ হতে সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্যে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু মানবজাতিকে চরিত্র বিধ্বংসী ও সর্বনাশী অবৈধ যৌনতার ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের সন্ধান প্রদান করে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি উন্নত জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ও ব্যাপক ধারণা লাভের জন্যে এবং পশ্চাদমুখিতা, অবনতির করালগ্রাস থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যে এ দর্শন অবদান রাখে বলিষ্টভাবে।

২.৭. মউতে আখজার (موت اخضر) বা সবুজ মৃত্যু ঃ

আভিধানিক পরিচয় ঃ

আখজার (اخضر) অর্থ সবুজ, সজীব, সতেজ, তাজা (ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪) মউতে আখজার অর্থ হলো- সবুজ মৃত্যু।

পারিভাষিক পরিচয় ঃ

সকল প্রকার বিলাসীতা পরিহার পূর্বক মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত সবকিছুর কামনা-বাসনা বর্জন করে হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রেম-ভালোবাসা জাগ্রত রেখে জীবন যাপনের নামই নির্বিলাস জীবন। যাকে মাইজভাণ্ডারী দর্শনে বলা হয় মউতে আখজার (موت اخضر) বা সবুজ মৃত্যু।

রহমতের নিবাস: নির্বিলাস জীবন ঃ

নির্বিলাস জীবন-যাপন মানে বৈধ ধন-সম্পদ বর্জন করা নয়, বরং ধন-সম্পদের মোহ বর্জন করার নাম। যাকে যুহদ (زهد) বলা হয়। ধন-সম্পদ তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নিয়ামত। তাই হক পথে ধন-সম্পদ উপার্জন করার নির্দেশ এসেছে কুরআন-হাদিসে। ইরশাদ হচ্ছে-

اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا .

"আল্লাহ তিনিই, যনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্যে কিছু ফলমূল উৎপাদন করেছেন। আর নৌকাকে তোমাদের নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এবং নদীগুলোকে তোমাদের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন।

এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যেগুলো একই নিয়মে চলছে এবং রাত-দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না।" (আল কুরআন, সূরা ইব্রাহীম, পারা: ১৩, আয়াত: ৩২-৩৪) একজন মানুষ সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করবে সম্পদের প্রতি মোহের কারণে নয় বা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রয়োজন পূরণ করার এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে। তার দৃষ্টি থাকবে আল্লাহও আল্লাহ্‌র নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তার প্রতি। প্রার্থিব সম্পদের প্রতি নয়। ধন-সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। ধন-সম্পদ অর্জনের জন্যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা দু'টি হাত, দু'টি পা, দু'টি চোখ দিয়েছেন। শরীরে দিয়েছেন শক্তি-বল। এগুলোকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্যে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক। শিক্ষা দিয়েছেন কর্মকৌশল। আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো-

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ.

"অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট জীবিকা অন্বেষণ করো এবং তারই ইবাদত ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‌কাবুত, পারা-২০, আয়াত: ১৭)

ধন-সম্পদ অর্জনে কায়িক ও মানসিক কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে সকলকেই। এ ক্ষেত্রে কল-কারখানা, ফ্যাক্টরি, ব্যাংক, ফার্ম, অফিস, আদালত, জল-স্থল, পাহাড়-পর্বত, গহিন জঙ্গল, মাঠ-ঘাট সহ সকল বৈধ পন্থায় কাজ করার নির্দেশ রয়েছে। এতে সম্পদ পেলে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আনন্দিত হবে। কারণ সে সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ও মানুষের সেবায় উৎসর্গীত করা যাবে। আবার না পেলেও বা পেয়ে হাতছাড়া হলেও দুঃখিত নয়, কারণ এতে সবরের সাওয়াব পাওয়া যাবে। ধনী হয়েও হযরত ওসমান (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নির্বিলাস জীবনযাপন করেছেন। তিনি সাধু হয়ে বসে থাকেননি।

ধনী হয়েও নির্বিলাস জীবন-যাপনের শিক্ষা রয়েছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনে। এ দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে ধনীরা জীবন-যাপন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে আত্মিক প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পাবে। তাদের নির্বিলাস জীবন, সমাজ, দেশ ও জাতির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে সম্পদের সদ্ব্যবহার করে জীবন মানের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত করা যাবে। নির্বিলাস জীবন-যাপনে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে জাতিকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে পারে। সুদ, ঘুষ, কালোবাজার, চোরাকারবার, মজুদদারি, ব্যাংক ডাকাতি, ঋণ খেলাফি, ভেজাল প্রদান, ছিনতাই, হাইজাকার, রাহজানি, ডাকাতি ইত্যাদি সমাজ থেকে নির্মুলে নির্বিলাস জীবন-যাপন (মউতে আখজার) বড় কার্যকরী টনিক।

এ দর্শনের নিখুঁত নির্দেশিকা ব্যক্তি, পরিবার, সামাজ ও রাষ্ট্রে পাপ-পূণ্য, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, নৈতিক-অনৈতিক, মায়া-মমতা, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, শান্তি-শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, মানবতা ও মূল্যবোধ ইত্যাদির সঠিক অনুশীলন ও প্রায়োগিক কৌশল। যা আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জাগতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার ঃ

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ইহকালীন উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির উপদেশ ও কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত নির্দেশনায় জীবন গড়ার হেকমত ও কৌশল এবং শরিয়ত-তরিকত পালনের সহজসাধ্য বিধি ব্যবস্থা। যা মেনে চললে দুনিয়া ও আখেরাত রহমতের নিবাসে পদার্পণ করার সৌভাগ্য নসিব হবে। আসুন, সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দানের জন্যে আমরা পরিহার করি আমাদের জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নফ্স ও শয়তানের অনুকরণ ও অনুসরণ। নিজেদের মধ্যে উদ্দিপ্ত করি কুরআন-সুন্নাহর নির্যাস উছুলে ছাবয়ার আলোকবর্তিকা। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র তরিকার দর্শন হোক আমাদের জীবন চলার পথের দিশারী ও রাহবর। আমরা উৎসর্গ করি আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আল্লাহ ও তদয়ী রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মহান মুর্শিদের আনুগত্য ও প্রেম ভালোবাসায়। সঞ্চয় করি ইহকালীন ও পরকালীন উন্নতি ও শান্তি লাভের আশায় পূণ্য ও সাওয়াবের ধন-ভাণ্ডার।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. কুরআনুল করিম।
২. সহিহ বুখারী শরিফ।
৩. সহিহ মুসলিম শরিফ।
৪. সুনানু আবি দাউদ শরিফ।
৫. জামে আত্তিরমিযী শরিফ।
৬. সুনানু নাসাঈ শরিফ।
৭. সুনানু ইবন মাযাহ শরিফ।
৮. কানযুল উম্মাল শরিফ।
৯. মিশকাতুল মাসাবিহ্ শরিফ।
১০. আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান: ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান।
১১. ফারহাঙ্গে জাদীদ : মওলানা আবূ সুফ্য়ান (যাকী) ও মওলানা ফজলুদ্দীন শিবলী।
১২. সিয়াম ও রমযান : মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী সম্পাদিত।

১৩. ইসলাম পরিচিতি : ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল।
১৪. বেলায়তে মোত্লাকা: মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।
১৫. মানব সভ্যতা: মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।
১৬. মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার : মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।
১৭. মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের সহজ উপায়: সৈয়দ লুৎফুল হক।
১৮. মাইজভাণ্ডারী তরিকার হাকিকত: সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন (রায়হান)।
১৯. বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ: মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।
২০. জান্নাতের দুটি কুঞ্জি :
২১. ইসলামে শ্রমনীতি: অধ্যাপক মওলানা হারুনুর রশীদ।
২২. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম: ড. মীর মন্জুর মাহমুদ।
২৩. অমৃতধারা: খাদেমুল হাসনাইন।
২৪. প্রেমকাহন : এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ।
২৫. ইসলাম ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন: এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ।

প্রভাষক: শিকলবাহা অহিদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা,
কালারপোল, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।
এম. ফিল গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সার্বজনীন আত্মশুদ্ধির মুক্তির পথ-উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

সকল প্রশংসার অধিকারী মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার পূণ্য ভূমিতে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে খোদা প্রদত্ত ঐশী প্রেমের ভাণ্ডার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। সৃষ্টি জগতে পরম করুণাময় খোদা তা'য়ালার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন মহান "ফজিলতে রব্বানী" গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত সাহেব কেবলা কাবা এঁর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে নবজীবন দান করিয়া মানব জাতিকে সুপথগামী করিয়াছেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত সাহেব কেবলা কাবা নিজ লিখিত কোনো বই পুস্তক কিংবা কিতাবাদি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার প্রভাবশালী পবিত্র কথাবার্তা ও দৈনন্দিনের অলৌকিক কর্ম পদ্ধতিই তাঁহার বেলায়তের পরিচয় বহন করে। তিনি এমন এক খোদা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি জনগণের না হওয়ার মতো কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দেন। কামালিয়ত বা বুজুর্গীর কোনো প্রশংসা তাঁহার বুজুর্গীতে বাদ পড়ে না। তাঁহার সাথে হযরত খাজা খিজির (আলাইহিস্ সালাম) এঁর সাথেও খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। সমসাময়িক সুধীবৃন্দ ও বুজুর্গানে দ্বীনে মতিনদের মধ্যে অনেকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত সাহেব কেবলা কাবা এঁর সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন। এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেল্‌রা তাঁর প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়। তাঁহার পরিচয় দিতে বহু খোদা তত্ত্বজ্ঞানী ভাষাবিদ ভক্ত সহচরগণ আরবি, উর্দু, ফার্সী, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় নানাভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয় গ্রন্থসমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। মুক্তির দিশারী হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত সাহেব কেবলা কাবা এঁর নিকট হইতে ফয়জ বরকত প্রাপ্ত খলিফা ছাহেবানদের পূর্ণ তালিকা তৈরি করা কোনো অবস্থাতে সম্ভব নহে। এক কথায় বলিতে হয়, খোদার নিদর্শন আসমানে চন্দ্র-নক্ষত্র রাজি যেমন- তেমনি তিনি ও তাঁহার খলিফা ভক্ত অনুরক্তগণও তেমন। তাঁহার পবিত্র শরাফতের বরাবরে হুজুরা শরিফের দোয়ার মেহরাবে সোলতানাতের অবস্থানে তিনি নিজেই মনোনীত করিয়া তাঁহার "অছী" ও

একমাত্র সাজ্জাদানশীন হিসাবে সোলতানুল আউলিয়া সৈয়দুল আছফিয়া হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)কে জাহের-বাতেন শরাফতের মালিক করিয়াছিলেন। সেই সুবাদে তাঁহার বাণী: "এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের "অছী"। তিনি ওফাত হইবার কয়েকদিন পূর্বে আমাকে তাঁহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।" যেমন হযরত আলী (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এঁর বাণী, এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যাহা নবী অথবা নবীর অছী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারে না।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর প্রবর্তিত তরিকা এবং সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক এই তরিকার বর্ণিত অনুশীলন পদ্ধতি নিম্নে উপস্থাপন করিলাম–

মাইজভাণ্ডারী তরিকা সমস্ত তরিকার সমাবেশ ও সর্ববেষ্টনকারী। কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নক্শেবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, ছরওয়ারদীয়া, তৈয়পুরীয়া, জুনায়দীয়া ইত্যাদি তরিকা উহার অন্তর্ভূক্ত। তাই সমস্ত তরিকতপন্থীরা মাইজভাণ্ডারী তরিকামতো জিকির আযকার বা স্ব স্ব পীর বুজুর্গ ধ্যানে স্ব স্ব তরিকা অনুযায়ী জিকির করিয়া হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) হইতে ফয়েজ রহমত অর্জন করিবার অধিকার আছে। যেহেতু তিনি ছায়েরে মায়াল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ মকামের অধিকারী মজ্জুবে ছালেক দরজার অধিকারী অলিউল্লাহ, জজ্বাত ছুলুকীয়তপূর্ণ অবস্থায় ফয়েজ বরকতের নজরে করমে আশেক মুরীদান তালেবানের ক্বলবের সহিত খোদায়ী পথের হেদায়তের আকর্ষণক্রমে অভিনব পদ্ধতিতে যুগের হাদীরূপে নিয়োজিত।

তাঁহার তরিকার উছুলে ছাবয়া যেমন ঃ

১ম ঃ তিলাওয়াতে অজুদ

(ক) "ফানা আনিল খাল্ক"– নির্জন সময়ে নিজের গত দিনের ভাল মন্দ কাজ কর্মের বিচার, চিন্তা, ধ্যান। মন্দের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা, ভালোর জন্য নিজ পীরের আনুগত্য এবং খোদার সাহায্য কামনা, মোনাজাত, বিনয়ে প্রার্থনা অনিবার্য। ফলে খোদা পথচারী নাছুত্ ভাব কামনার উর্ধ্বে "লওয়ামা" মলকুত শক্তি জগতে উত্তোলিত হইতে সক্ষম হয়। যাহাকে সুফি পরিভাষায় "ফানা আনিল খাল্ক" বলে। (খ) "ফানা আনিল হা'ওয়া"- অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেই রূপ কাজ কর্ম্ম ও কথা বার্তা হইতে বিরত থাকা, যাহার ফলে জীবন যাত্রা সহজ ও ঝামিলা মুক্ত হয়। (গ) " ফানা আনিল এরাদা" অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার

নিকট বিলীন করা যাহার ফলে সুফি মতে "তসলিম ও রজা" হাসিল হয়। এই ত্রিবিধ নীতিমালাই "ফানায়ে ছালাছা" বা বিনাশ পদ্ধতি।

২য় মউতে আরবা'

(ক) মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস ও সংযমে হাসিল হয়। যাহার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়।

(খ) মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দায় হাসিল হয়। কারণ অপরের সমালোচনা বা নিন্দার পর ছালেক বা এই আত্মশুদ্ধি পথের যাত্রী নিজ দোষত্রুটি বুঝিতে সুযোগ পায় এবং দোষ পরিত্যাগ পূর্বক খোদার দিকে আগাইতে সক্ষম হয়। দোষ খুঁজিয়া না পাইলে খোদার শোকর গোজারী আদায় করার ফলে, নিজ মনে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। তখন সমলোচনাকারীকে বন্ধুরূপে দেখে এবং নিজে বিশ্ব বন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত হন।

(গ) মউতে আহ্মর বা লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাসিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) মউতে আখ্জার বা সবুজ মৃত্যু। ইহা নির্ব্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলে হাসিল হয়। যাহার ফলে মানব অন্তঃকরণে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনো কামনা-বাসনা থাকেনা। ইহা বেলায়তে খিজ্রীর অন্তর্গত। এই ব্যক্তি সাহেবে তাছার্রোফও হইয়া যায়।

হযরত আক্দাছের এই সার্বজনীন শুদ্ধি প্রণালীর প্রতি নজর দিলে বোঝা যায়, তিনি বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজম নিছবতাইনে আ'দমীর বা আগত বিগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী। যাহা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতির অর্ন্তগত। প্রথম অংশ "এবাদতে মোত্নাফিয়া" হিসেবে "ছালেক" খোদা পথচারীর জন্য অপরিহার্য। উপরোক্ত গাউছিয়ত নীতি হীন, বিমুখ ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারী তরিকার দাবি করা চলে না।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর তরিকা গ্রহণকারীরা সহজ উপায়ে জিকিরের মাধ্যমে নফ্ছে আম্মারা হইতে কামেলা ও "উছুলে ছাবয়া" সপ্ত পদ্ধতির মধ্যস্থতায়, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য স্মরণ ও আমল এই দুইটিকে খুব সহজ ও সুন্দরভাবে সমন্বয় করিয়া কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্ব মানবতার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। যাহার ফলে তাঁহার অলৌকিকতা ত্রাণ কর্তৃত্ব আজমিয়তের আকর্ষণে খোদা অন্বেষী রূহানী ও মানবতার উন্নয়নকামী দীক্ষা প্রার্থী জনতার ভীড় বাড়িতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার সাহচর্যে ও "খেদমত- ছোহবতের" বরকতে বহু লায়েক, আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগন কামেল বা পূর্ণ মানবতাপ্রাপ্ত হাল

জজ্‌বায় খোদা প্রেমমত্ত অলি উল্লাহগণ বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেন।

আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে- হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর তরিকার মূলনীতি যিকির আজকার গাউছিয়ত নীতি তথা উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির অনুসরণ অনুকরণ করিয়া তজকীয়ায়ে নফ্‌স হাছিলের মধ্যস্থতায়, উরুজে রূহানীয়াতের সহায়তায় কামালিয়তের উচ্চ শিখরে পৌঁছার তাওফিক আতা করুন। আমিন ॥

তথ্য সূত্র :

১। মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার
২। বেলায়তে মোত্‌লাকা
৩। মানব সভ্যতা
৪। মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া

দারুত-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ
ও
সাধারণ সম্পাদক
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্ব-মানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির সোপান প্রজ্ঞাময় উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

মুহাম্মদ আবুল মনছুর

নফ্সে ইনসানী বা কু-প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটিয়ে রূহে ইনসানী তথা সু-প্রবৃত্তির সৃষ্টির মাধ্যমে সহজ পন্থায় মহান আল্লাহ্র কুরবত বা নৈকট্য লাভের প্রয়াসে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বিশ্ব মানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষে প্রজ্ঞাময় উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

আল কুরআনের মর্মবাণী-

ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

"আপনার পালনকর্তার পথের দিকে প্রজ্ঞাময় কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহবান করুন।" (সূরা নহল, আয়াত-১২৫)। এই অমীয় বাণীর আলোকে বিবেচনা করলে সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি মুক্তির দিশারী মনন প্রকৃতির সপ্তস্তর উন্নত মার্গে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের সহায়ক পদ্ধতি। এটা মাইজভাণ্ডারী তরিকার মূল দর্শন হিসেবে খ্যাত। এই উছুলে ছাবয়া দুই ভাগে বিভক্ত-

(১) ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর তিন প্রকার বিনাশ স্তর

(২) মউতে আরবা' বা চারি প্রকার মৃত্যু

(১) ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর তিন প্রকার বিনাশ স্তর :

জীবন নামে খ্যাত বিশুদ্ধ পানি পান করে মানবকূল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে, তদ্রুপ হযরতের বেলায়তসুধা পানকারীও সুফি মতানুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করে ও চার প্রকার মৃত্যুবরণ করত খোদা পরিচিতি জগতে উন্নীত হয়ে স্রষ্টা সম্পর্কে এক "কাশ্ফী" নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে।

(ক) ফানা আনিল খাল্ক : অর্থাৎ কারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা, যার ফলে মানবমন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি আস্থা জন্মে।

আত্মনির্ভরশীলতা সফলতার মূল চাবিকাঠি। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির কখনো মৃত্যু হয় না। মানবজাতি কঠোর ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম এবং সাধনার মাধ্যমে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় তথা সামষ্টিক জীবনে উন্নতির জন্য আত্মনির্ভরশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সুরা আররা'আদ, আয়াত- ১১)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى .

"নিশ্চয় মানুষের জন্য তার প্রচেষ্টার বাইরে কিছু নেই।" (সূরা- আন্‌নজম, আয়াত-৩৯)।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى .

"অতএব যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।" (সূরা আল লাইল আয়াত ৫-৭)

পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে :

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ .

"জেনে রেখো, যে ব্যক্তি পবিত্র হতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভশীল করে তুলেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য শীলতা দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোনো জিনিস কাউকে দেয়া হয়নি।" (মসনদে আহমদ, হাদিস- ১১৪৫৬)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ .

হযরত আবু হুরায়রা (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শক্তিধর মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক শ্রেয় ও প্রিয়।" (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, মুসনাদ ই আহমাদ)

(খ) ফানা আনিল হা'ওয়া: অর্থাৎ যা, না হলে চলে সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা, যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى .

"যে কেউ অনর্থ পরিহার করে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সূরা আন-নাযেয়াত, আয়াত- ৪০-৪১)।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ .

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে বিনয়-নম্র এবং যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত।"(সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১-৩)।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ .

"আল্লাহ্‌র হেদায়তের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (সূরা আল কাসাস, আয়াত: ৫০)

وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ .

"অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন।" (সূরা আল আনআম, আয়াত: ১১৯)

পবিত্র হাদিস শরীফে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ .

"রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলিম ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরিহার করার মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য বিরাজমান।" (তিরমিজি, হাদিস-২৩১৮)।

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اثْنَيْنِ طُولُ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى، فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ .

"আমার উম্মতের জন্য আমি সর্বাধিক যে জিনিস অধিক ভয়ের কারণ মনে করি, তা হলো কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ আর দীর্ঘ লালসা ও আকাঙ্ক্ষা। নিশ্চয় কু-প্রবৃত্তি সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে আর অনাবিল আকাঙ্ক্ষা পরকাল ভুলিয়ে দেয়।" (বায়হাকী ফি সুআবিল ঈমান, মেরকাত, কিতাবুল আদব, হাদিস-৫২১৪)

(গ) ফানা আনিল এরাদা : খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা, যার ফলে সুফি মতে "তসলিম" ও "রজা" হাসিল হয়।

আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা ও বিধানের উপর প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট থাকা আত্মার একটি অতি উন্নত অবস্থা। তার বিধানের ও ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকা তার প্রতি মহব্বতেরই ফল। আল্লাহ তায়ালার বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহ্‌র অভিমুখে শ্রেষ্ঠ দ্বার।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

"হে নবি, আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য।" (সূরা আনআম, আয়াত- ১৬২)।

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ .

"আল্লাহ তায়ালা কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?।" (সূরা- আল যুমার, আয়াত-৩৬)।

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।"(সূরা বাকারা, আয়াত- ১৮৫)।

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى .

"বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সূরা আল আ'লা, আয়াত-১৬,১৭)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করে না।" (সূরা আল কাসাস, আয়াত: ৭৭)

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ .

"পক্ষান্তরে তারা যদি আপনার সাথে প্রতারণা করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।" (সূরা আল আনফাল, আয়াত: ৬২)

পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে-

عَنْ زِيَادِ بن أَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى:مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ.

"যে ব্যক্তি আমার বিধানের উপর সন্তুষ্ট নয় এবং আমার প্রদত্ত নেয়ামতের উপর তুষ্ট নয়, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য প্রতিপালকের সন্ধান করে।" (তাবরানী ফিল কাবির)

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا .
معنى رَضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم اطلبه معه غيره .

"সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করল, যে আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবি ও রাসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।" (মুসলিম শরিফ-৩৪, তিরমিযী ২৬২৩)

২। মউতে আরবা' বা রিপুর চার প্রকার মৃত্যু :

মউতে আরবা' বা চার প্রকার মৃত্যুর দ্বারা এখানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মানুষের কামনা বাসনা এবং প্ররোচনাকারী নফ্ছের মৃত্যুর কথা বুঝিয়েছেন। হাদিস শরিফে এসেছে, "তোমরা মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু বরণ করো।" এ প্রকারের মৃত্যুর পর কল্ব জাগ্রত হয়। কল্ব, জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কোরবত হাসিল হয় এবং চিরস্থায়ী সুখময় জীবন (হায়াতে আবদী-ছারমাদী) লাভ হয়।

(ক) মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু : এটা উপবাস এবং সংযমে হাসিল হয়। যার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন : রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযমের অতীব মোক্ষম পদ্ধতি।

الموت الابيض: الجوع لانه ينور الباطن ويبيض وجه القلب . فمن مات بطنته حيت فطنَته .

কামনা- বাসনার সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রোজা ও সংযমের অভ্যাস গড়ে তোলার উপর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রোজার উপবাস ও সংযমের নির্দেশ আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির জন্য মহান অনুগ্রহ। কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদাভীতি, অন্তর পবিত্র করা এবং তুষ্টির নাম রোজা। তাই হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বলেছেন- "আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে। অর্থাৎ- আত্কা (খোদা ভয়), তক্দীছ (অন্তর পবিত্রতা) এবং হামদ্ বা সন্তোষ যা রোজার প্রতিপাদ্য সারবস্তু- তা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর মুরিদদের মধ্যে সবসময় বহাল থাকে, সুতরাং তারা সবসময় রোজাদার।"

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পারো।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৩)।

পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে-

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. (رواه مسلم)

"বনী আদমের প্রত্যেক নেক আমলের দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিন্তু রোজা ব্যতীত, যেহেতু রোজা আমার জন্য, আমিই

উহার পুরস্কার দেবো বা আমিই রোজার প্রতিদান। কারণ একমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্য বান্দা তার কামনা- বাসনা ও পানাহার পরিহার করেছে।" (বোখারী ও মুসলিম শরিফ, কিতাবুস সওম)।

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . (متفق عليه)

"যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোজা (নফল) পালন করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার চেহারা দোজখের আগুন থেকে সত্তর বৎসর রাস্তার দূরত্বে দূরবর্তী করে রাখবেন। (বোখারী ও মুসলিম শরিফ)।

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ .

হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস আসসাক্বফী (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, "আমি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি রোজা দোযখের আগুন থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ, যেমনিভাবে তোমাদের যুদ্ধের ঢাল রয়েছে।" (নাসাঈ, ইবনে মাযা)

রোজার হাকিকত বর্ণনায় তফসীরে ইবনে আরবীতে উল্লেখ রয়েছে,

احتراق النفس بنور الحق .

"রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নুরের প্রজ্জ্বলনে মানব সত্তার পাপ দগ্ধ করা হয়।" (বেলায়তে মোত্‌লাকা-১৪৫)।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর বাণী: "নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা; আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও।" সুফিদের পরিভাষা মতে, পাকান বা রন্ধন অর্থ স্ব-অর্জিত স্বাধীন মত বোঝায় এবং রোজা অর্থ পাপ কার্য হতে বিরত হওয়া বোঝায়। (বেলায়তে মোত্‌লাকা, পৃষ্ঠা-৮৭)

(খ) মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু : এটা শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দায় হাসিল হয়। কারণ অপরের সমালোচনা বা নিন্দার পর ছালেক বা এই আত্মশুদ্ধি পথের যাত্রী নিজ দোষ-ত্রুটি বুঝতে সুযোগ পায় এবং দোষ পরিত্যাগ পূর্বক খোদার দিকে এগুতে সক্ষম হয়। দোষ খুঁজে না পেলে খোদার শোকর গোজারী আদায় করার ফলে নিজ মনে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়। তখন সমালোচনাকারীকে বন্ধুরূপে দেখে এবং নিজে বিশ্ববন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত হন।

الموت الاسود: هو احتمال اذى الخلق وهو الفناء فى الله لشهود الاذى منه برؤيته فناء الافعال فى فعل محبوبه .

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

"তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (সূরা মায়েদা, আয়াত-৫৪)।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا .

"যে ব্যক্তি (নিজ পাপের জন্য) অনুতপ্ত এবং সৎকাজ করেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে বিশেষ ভাবে রুজু হয়েছে। (সূরা-আল্ ফোরকান, আয়াত-৭১)

পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে-

عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه »

"যে বান্দা তার কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, যা শুধু আল্লাহ পাকই জানেন, সেই বান্দা আল্লাহ্‌র দরবারে মার্জনা ভিক্ষার পূর্বে আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দেন।" (আল্ মোসতাদারাক, বাবুত তওবা ওয়াল ইনাবাত-৩১৮০)

قال حسن البصرى رضى الله عنه : ان اغتاب احد فيرسل له الهدايا، إن قام بالعداوة فيرحبه .

হযরত হাসান বসরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর উপদেশ, "যদি কেউ তোমার সমালোচনা করে, তার জন্য হাদিয়া প্রেরণ করো। আর যদি তোমার শত্রুতা করে, তাহলে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করো।"

قال الهيثمى، الغيبة تهديك الى ترك المنكرات وما لا يعنيه فاختر الحساد والمغتابين احباءٌ .

ইমাম হায়সামী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, " গীবত তোমাকে নিষিদ্ধ এবং অনাহুত কর্ম বর্জনের দিকে পথ নির্দেশ করে, তাই গীবতকারী ও হিংসাকারীদেরকে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করো।"

(গ) মউতে আহ্‌মর বা লাল মৃত্যু ঃ এটা কামভাব ও লালসা হতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়।

الموت الاحمر مخالفة النفس .

কামস্পৃহা ও লালসা প্রবল হলে তা আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। অন্যদিকে কামভাব মানুষকে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে, যা ইসলামি শরিয়তে ঘোর অপরাধ বলে গণ্য।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ .

"হে নবি দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, অন্যথায় আপনাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে গোমরাহ করে দেবে।" (সূরা ছোয়াদ, আয়াত-২৬)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا .

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যে তারা কামনা-প্রবৃত্তিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে? তবু কি আপনি তাদের জিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শুনে বা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং আরো পথভ্রান্ত।" (সূরা- আল্ ফোরকান, আয়াত- ৪৩-৪৪)।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا .

"যে নিজ নফ্ছকে পবিত্র করেছে, সে সফলকাম আর যে নফ্ছকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"(সূরা আস শামস, আয়াত- ৯-১০)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .

"হে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন।" (সূরা আরাফ আয়াত ৩৩)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

"তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।" (সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত ৩২)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .

"আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।" (সূরা আন নূর আয়াত ৩০)

পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ مُطَاعٌ ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ .

"মানুষের জন্য তিনটি ব্যাধি খুবই মারাত্মক, যথা: কু-প্রবৃত্তির প্রভাব, লোভ-লালসা এবং আত্মম্ভরিতা।" (আত্ তাবরানি -৫৯১৫)।

المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله .

"মোজাহিদ সেই ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্ছকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ধাবিত করেছে।" (নাসাঈ-১১৭৯৪, বায়হাকী-১০৬১১)।

হযরত সোলায়মান (আলাইহিস্ সালাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার রিপুকে (কামভাব ও লালসাকে) সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছে সে বিশ্বজয়ীর তুলনায়ও অধিক বীরত্বের অধিকারী।" (মোকাশেফাতুল কুলুব)।

مَنْ اضْمَنُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ .

"যে আমাকে জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের জামানত দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হব।" (বোখারী, তিরমিযী)

(ঘ) মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু : এটা নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে হাসিল হয়। যার ফলে মানব অন্তকরণে স্রষ্টার প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো কামনা-বাসনা থাকে না। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত। এই ব্যক্তি সাহেবে তাছার্‌রোফও হয়ে যায়।

الموت الاخضر : لِبس المُرَقع من الخَرْقِ الملقاة التى لا قيمة لها لا خضرار عيشة بالقناعة .

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

"আপনি নিজকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল সন্ধায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে, তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।" (সূরা কাহাফ, আয়াত-২৮)।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ .

"পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধূলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।" (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৩৬)

পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে-

طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ .

"সুসংবাদ তাদের জন্য যারা ইসলাম দ্বারা হেদায়েত পেয়েছে এবং শুধু প্রয়োজন পরিমাণ মালামাল লাভ করেছে আর তা নিয়ে তুষ্ট থেকেছে।" (তিরমিজি শরিফ-শরহে রিয়াজুচ্ছলিহিন)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبُدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا .

হযরত আবু হুরাইরা (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন- "আমাকে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আবু হুরাইরা তুমি বিনয়ী হও; খোদা ভীরু হও; তাহলে শ্রেষ্ঠ আবেদ হতে পারবে। অল্পে তুষ্ট হও; তাহলে শ্রেষ্ঠ শোকর গোজার হতে পারবে। তুমি যা নিজের জন্য পছন্দ করো তা মানুষের জন্য পছন্দ করো; তাহলে পরিপূর্ণ মোমিন হতে পারবে।" (সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, হাদিস- ৪২১৭)।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ .

হযরত আবু সাঈদ আল খুদুরী (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, "অবশ্যই দুনিয়া (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) স্বাদ-আহ্লাদের স্থান। আর অবশ্যই তোমরা কী করছো তা আল্লাহ পেছন থেকে দেখছেন । অতএব তোমরা দুনিয়াকে ভয় করো, মেয়েদের বিষয়ে পরহেযগার হও। বনী ইসরাইলে প্রথম ফিত্না আরম্ভ হয়েছিল মেয়েদের মাধ্যমে।" (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা ও মুসনাদ ই আহমাদ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن الْمَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, " তিনি বলেন, একদা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর ঘুমালেন, আর যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন তার পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমরা আপনার জন্য একটা বিছানা যোগাড় করতাম। তখন রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এসব আমার জন্য না এবং দুনিয়াও নয়। আমি দুনিয়াতে ঐ মুসাফিরের মতো, যে গাছের নিচে ক্ষণিক বিশ্রাম করে আবার চলে যায়।" (তিরমিযী, ইবনে মাযা)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

হযরত আবু হুরায়রা (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, "রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াটা মুমিনের জেলখানা আর কাফেরের জান্নাত।" (মুসলিম, তিরমিযী)

উছুলে ছাবয়া এর উপকারিতাঃ

(ক) এই কুরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি মানবজীবনের এক নিখুঁত সহজ-সরল ও স্বাভাবিক পন্থা, যা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

(খ) এই সপ্ত পদ্ধতি সংসার জীবনের বোঝা হালকা করে, সরল ও সহজ সাধ্য করে।

(গ) পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে।

(ঘ) এই সপ্ত পদ্ধতি ইসলামি সুফি মতবাদ মতে ফানায়ে নফ্ছী-প্রবৃত্তির বিনাশ এবং বাকাবিল্লাহর বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলামুক্ত।

(ঙ) বিশ্বসমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী।

(চ) কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী।

(ছ) ঐক্য ও সৃজনশক্তির শক্তিশালী আলো দানকারী। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় যাকে কাউকবে দুর্রী বলা হয়।

(জ) এই সপ্ত পদ্ধতি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানবতা অর্জনে সহায়তা করে।

সুতরাং বলা যায়, এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি বা উছুলে ছাবয়া ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবতা অর্জনে সহায়তা করে। ইহা জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্মীয় হেকমত-কৌশল। দেশ, জাতি, সাদা-কালো, সংসারী, অসংসারী সকলের জন্য উপদেশ ও সহজসাধ্য বিধি ব্যবস্থা। কামনা বাসনা অনর্থ ও অপচয় এবং ভৌতিক প্রেরণা আড়াল মুক্তি দান করে। ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও সফলতা নিশ্চিত করে। বর্তমান পৃথিবীর হালচাল, রীতিনীতি, খোদাভুলা ও নবি-অলিগণের নীতি বিমুখ বল্গাহীন জনগণের অবস্থার পরিণাম চিন্তা করলে দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবে যে, বিপদ হতে উদ্ধার মানসে কুরআন, সুন্নাহ ও বুজুর্গ মনীষীগণের উপদেশ মতে বিশ্বত্রাণ-কর্তৃত্ব সম্পন্ন অলিয়ে কামেলের নীতিমালা গ্রহণ করা আবশ্যক।

মওলানা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন-

دا من او گیر زود تربی گمان + تا رهی از آفت اخر زمان

"শেষ জামানার বিপদ মুক্তির জন্য ঐ ব্যক্তির আচল ধরো, অনুসারী হও, যেই ব্যক্তির পার্থিব ভাব শিথিল এবং খোদায়ী ভাব দ্বারা সজাগ-চেতনা সম্পন্ন।" হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর এই সার্বজনীন শুদ্ধি প্রণালির প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়, তিনি বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজম; নিছবতাইনে আদমীর বা আগত বিগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী।

এই মহান রূহানী জিন্দেগি দান করার মানসে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বিশ্ববাসীকে ধ্বংসের কলবল হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে খোদায়ী প্রদত্ত প্রেম-প্রেরণায় বেলায়তি শক্তি দান, খোদার সাথে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সহায়তায় তাঁর নিকট যে কেউ উপস্থিত হতেন, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেরণা ফয়েজ রহমত হতে কখনো বঞ্চিত হতো না। এমনো দেখা যেত তাঁর এত্তেহাদী ফয়েজ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্ফ ও অন্তঃচক্ষু উম্মিলিত হতো এবং খোদার গোপন রহস্যজ্ঞান অবগত হয়ে তা ব্যক্ত করতে থাকতেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর এই পবিত্র শরাফতের ধারা অব্যাহত রাখার মানসে পবিত্র হুজুরা শরিফের দোয়ার মেহরাবে সোলতানাতের অবস্থানে তিনি নিজেই মনোনীত করে তাঁর আপন নাতি হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কে একমাত্র সাজ্জাদানশীন হিসাবে খেলাফত দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এই খেলাফত/শজরা-ছিলছিলা জারি রাখার মহিমায় তাঁর ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি ঘোষণা করে আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারীকে ১৯৭৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফত প্রদান করে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের একমাত্র মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত করেন।

দারুত-তায়ালীম সম্পাদক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

Uṣūl-e-Sabʿa: An esoteric struggle to unveil the veiled, in the context of *Maizbhandari Ṭarīqa*

Muhammad Muhi Uddin

Introduction

Islam has put a great deal of emphasis on the purification of inner-self and linked a person's outward righteousness with the purity of his inner-self, which is the fountain from which all of his actions and feelings come fourth. The Holy Quran made it individually obligatory upon a Muslim to purify his inner-self and described it as a pre-requisite for the success in this world and the hereafter. The Holy Quran says,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"And by oath of the *nafs* and by oath of Him Who made it proper. And inspired in it the knowledge of its sins and its piety. Indeed successful is the one who made it pure. And indeed failed is the one who covered it in sin." [1]

The Prophet (pbuh) also asserted that Allah only looks at the actions and the condition of the heart of His slave, as it is the place of sincerity and devotion without which his religious actions reduce to mere dead rituals. He (pbuh) said,

[1] Surah Shams (91), Verses:7-10

عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

"Verily Allah does not look at your appearance or wealth. But rather He looks at your hearts and actions."[2]

Uṣūl-e-Sabʿa or Seven Principles

Maizbhandari *Ṭarīqa* was established by Gawthul Azam Hazrat Syed Ahmad Ullah (Q.) (1826 AD − 1906 AD). He was born and brought up in a small village called '*Maizbhandar*' in the district Chittagong. He (Q.) introduced '*Uṣūl-e-Sabʿa*' or the 'Seven Principles' as a comprehensive training program for the aspirants of the Order to help them slowly break the snares of the world and to start their spiritual journey to the Divine Communion, and to attain highest attributes of humanity.

These principles are explained into two facets.

Fanā-e-Salāsa (Three Annihilations) and

Mawt-e-Arbaʿa (Four Deaths)

Fanā-e-Salāsa or Three Annihilations

Fanā anil Khalq: Annihilation of Expectation from the Creation

As Hazrat Syed Delawor Hossain (R.) described, "It is to dissolve the expectation of getting any service or help from the creation".[3]

---

[2] Sahih Muslim, Chapter: The Prohibition Of Wronging, Forsaking, Or Despising A Muslim And The Inviolability Of His Blood, Honor And Wealth

[3] Wilayat-e-Mutlaqa, p. 70.

As a result, *tawakkul* or reliance will sprout in his heart making him self-confident that his Lord is there to provide for him. Allah promised more sustenance, protection and ease of life for those who work hard and solely rely on him. He said in the Holy Quran:

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

"Indeed your efforts differ. So for one who gave and practiced piety, and believed the best matter to be true. So We will very soon provide him ease."[4]

***Fanā anil Hawā*: Annihilation of One's Desire.**

Hazrat Syed Delawor Hossain (R.) explained, "It is to restrict oneself from unnecessary actions and vain talks. As a result, it will ease the life and make it trouble free.[5]

Struggle against the *nafs* (نفس) is done by weaning it against its desire and by forcing it to adhere to the divine commands of Allah and his Prophet (pbuh). Allah promised success for those who strive against their ego. Allah said,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"And those who strove in Our way – We shall surely show them Our paths; and indeed Allah is with the virtuous."[6]

Allah promised tremendous rewards for striving against ego and vain desire. He said,

---

[4] Surah Al Lail, Verse: 4-7
[5] Wilayat-e-Mutlaqa, p. 70
[6] Surah Ankabut, Verse 69.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

"And for one who feared to stand before his Lord and restrained his soul from desire, Then indeed Paradise is his only destination."[7]

Fanā anil Irāda: Annihilation of One's Own Choice

As Hazrat Syed Delawor Hossain (R.) said, "It is to always prefer Divine Will over one's own wishes and to annihilate his desire into Divine Wills. As a result, *taslīm* (تسليم)-submission and *riḍā* (رضا)-contentment are attained.[8]

This is the stage indicated by the verse of the Holy Quran as a state of 'sound heart' where the slave managed to annihilate his own desire into the will of Allah.

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"The day when neither wealth will benefit nor will sons. Except he who presented himself before Allah, with a sound heart."[9]

Four Deaths

Al Mawtul Abyaḍ- White Death

Hazrat Syed Delawor Hossain (R.) described, "It is attained through hunger and self-restraint, as a result, the human mind gets illuminated. For example, fasting during the month of Ramadan or voluntary fasting is

[7] Surah Naziaat, Verse-40-41
[8] Wilayate-e-Mutlaqa, p.70
[9] Surah Shuara, Verse: 88-89

among the ways to experience hunger and to develop self-restraint".[10]

The White Death is to experience the pain of hunger. There are numerous occasions when the Prophet (pbuh) glorified hunger or eating less and explained the harm of over eating. He (pbuh) said,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ،بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامُهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابُهِ، وَثُلُثٌ لِنَفسِهِ

"The son of Adam does not fill any vessel worse than his stomach. It is sufficient for the son of Adam to eat a few morsels to keep him alive. If he must fill it, then one-third for his food, one-third for his drink, and one-third for air."[11]

Allah made it obligatory upon the Muslim to fast during the month of Ramadan only to attain piety through experiencing hunger and thirst. He said,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"O People who believe! Fasting is made compulsory for you, like it was ordained for those before you, so that you may attain piety."[12]

As for the aspirants of *Maizbhandari Ṣūfī* Order, Hazrat Syed Ahmad Ullah (Q.) said, "My children always

[10] Wilayat-e-Mutlaqa, p.71
[11] Shoabul Iman, Chapter: Over Eating.
[12] Surah Baqara, Verse-183

fast”[13]. On another occasion, he advised one of his aspirants, “I fast for twelve months; you should fast for twelve months as well”.[14]

His advice implies a broader meaning of ‘Fasting’, that the aspirant should develop self-retrain to safeguard him from all forms of religious and moral imperfections, and forbidden things in the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet (pbuh) that may pose as an obstacle in his journey towards the Ultimate Truth.

***Al Mawtul Aswad*- Black Death**

Hazrat Syed Delawor Hossain (R.) said, “It is attained through criticism and enmity of the enemies”.[15]

Black Death implies that the aspirant forebears the suffering and pain inflicted by people by means of criticism or any other form of oppression. He sees that every pain caused upon him comes from The Beloved One as they are the creation of Him.

In this state, the critics and enemies, as He indicated, considered as intimate friends, as they are the mirrors through which the aspirant can take his self to account and correct his mistakes. The Holy Quran says,

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

“They will strive in Allah’s cause, and not fear the criticism of any accuser.”[16]

---

[13] Wilayat-e-Mutlaqa, p.89
[14] Jiboni o Keramat, p. 137
[15] Wilayat-e-Mutlaqa, p. 71
[16] Surah Maidah, Verse-54

The fact that our Prophet (pbuh), despite being innocent, used to repent abundantly, demonstrates the importance of repentance for spiritual purification and elevation. The Prophet (pbuh) said,

قال أبو هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

"By Allah, I seek forgiveness from Allah and I repent to him more than seventy times in a day."[17]

Al Mawtul Aḥmar- Red Death

Hazrat Syed Delawor Hossain (R.) said, "It is attained by liberating the 'self' from lust and sexual craving, and (the aspirant) is elevated to the rank of the saints by attaining *wilāyat*."[18]

Islam, as a religion of nature- *Dīnul Fiṭrat* (دين الفطرة), recognizes the sexual needs of human beings as one of the strongest biological instincts that should be nurtured, not suppressed. It, therefore, criticised the concept of celibacy and monasticism, and highly glorified the institution of marriage that includes sexual intercourse, mutual love and responsibility, denoting it as a sign of Allah, source of tranquillity and helpful in spiritual wayfaring.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"And among His signs is that He created spouses for you from yourselves for you to gain rest from them, and kept

[17] Bukhari, Chapter: Repentance
[18] Wialay-e-Mutlaqa, p. 71

love and mercy between yourselves; indeed in this are signs for the people who ponder."[19]

***Al Mawtul Akhḍar*- Green Death**

"It is attained by being accustomed to a frugal lifestyle. Consequent upon that, the aspirant can repudiate all desires and expectation except Divine Love. It is of '*Wilāyat-e-Khijri*'."[20]

Green Death implies that the heart gives up the longing for luxury or anything that is more than sufficient.

The ancient *ṣūfī*s described Green Death as the wearing of the patched garment made of discarded and worthless rugs as a sign of contentment and satisfaction.

The Holy Quran reminds us time and again that this worldly life is temporary and warns us not to indulge into its luxury and forget its Creator. The Holy Quran says,

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

"The worldly life is just a sport and pastime; and if you accept faith and be pious, He will bestow your rewards to you, and not at all ask you for your wealth."[21]

Tilāwat-e-Wajūd

These Seven Principles are not the ultimate objective; rather, they are a process through which the aspirant prepares himself for his spiritual journey to the Ultimate Truth. *Tilāwat-e-Wajūd* is way to put these principles into practice.

---

[19] Surah Rum, Verse-21
[20] Wilayat-e-Mutlaqa, p 71.
[21] Surah Muhammad, Verse 36

It implies that an aspirant should, preferably every day, affix a certain short period of time for solitude, when he withdraws himself from all sort of worldly concerns and empties his heart to take account of his own actions that he did in the last 24 hours. If his conducts are against the way of the Prophet (pbuh), he repents, and if they are according to the *Sharīʿah*, he expresses his gratitude to Allah.[22]

Conclusion

These principles, derived from the Holy Quran and Sunnah of the Prophet (pbuh), are designed to guide a seeker to accumulate the sublime character of Islam as well as spiritual wisdom and moral perfection. His temporal and spiritual life, after completing these stages, is more active, meaningful and real as he has now managed to subdue his ego. His heart is now ready to reflect the light of Eternal Divine Love. The Holy Quran says,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"He loves them and they love Him."[23]

Because of its universal love and humanity, *Maizbhandari* Order gives us the hope to dream a society where people from all walks of life with diverse culture, customs, faith or colour can live in harmony with mutual

[22] Verbal advice given by Syed Irfanul Hoque, Nayeb Sajjadanoshin. Date- 27-11-2019

[23] Surah Maidah, Verse - 54

respect, understanding and tolerance, without hindering one's own identity.

Bibliography

Abd Al- Qadir Isa , Realities of Sufism, , Trans. Suraqah Abdul Aziz, Sunni Publication, Netherlands, 2009

Abdur Rahman Sadi, *The Exquisite Pearl*, Trans. Abu Aalliay Shurkeel Sharif, The Jawziyya Press, United Kingdom, 2002.

Abdur Razzak Kashani, *Istilahat Sufiyya*, Darul Kitab Ilmiyya.

Abu Hamed Gazzali, *Ihya Ulum al Din*, Darul Marifa, Beirut, 1998.

Ahmad bin Hossain bin Ali Abu Bakr Bayhaqi, *Shoabul Iman*, Maktaba Rushd, Riyadh, 2003.

Ayako, Ninomiya, To whom Do You Belong? Pir-Murid Relationship and Silsila in Medival India, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 2-1 (2008) pp 47-56.

Bertocci, Peter J. 'A Sufi movement in Bangladesh: The Maijbhandari tariqa and its followers', *Contributions to Indian Sociology*, vol. 40, no. 1, 00. 1-28

Ibn Khaldun, *Al Muqaddima*, Trans. Franz Rosenthal, Princeton University Press, USA, 1969.

Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari*, Dar Tukun Najah, Cairo, 1422 Ah.

Muhammad Zaki Ibrahim, *Usul ul Wusul*, Dar Nobar, Cairo, 2005.

Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Dar Ihya Turs, Beirut, 2001.

Syed Delawor Hossain (R.), *Jiboni o Keramat*, Gausia Ahmadia Manjil, Maizbhandar Darbar Sharif, Chittagong 1967.

Syed Delawor Hossain (R.), *Manob Sobbhota*, , Gausia Ahmadia Manjil, Maizbhandar Darbar Sharif, 3rd Edition, 2008.

Syed Delawor Hossain (R.), *Tajkiay-e-Mukhtasar*, 5th Edition, Gausia Ahmadia Manjil, Maizbhandar Darbar Sharif, Chittagong 2011.

Syed Delawor Hossain (R.), *Wilayat-e-Mutlaqa*, Gausia Ahmadia Manjil, Maizbhandar Darbar Sharif, Chittagong, 3rd Edition, Chittagong, 1974.

Syeed Hawa, *Mujakkirat Fi Manajilis Siddiqin*, Dar Salam, Cairo, 2004.

Zain Uddin Muhammad, *Faidul Kabir*, Maktaba Tijariya, Egypt, 1356 AH.

MA, Gloucestershire University
BA (hons), Al Azhar University
Head Imam
Portsmouth Jami Mosque & Islamic Centre
England

অপরাধ ও মামলা নিরসনে উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি

এডভোকেট মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন

অপরাধ (ঈৎরসব) হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আইন বিরোধী কাজ। দেশ বা অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রণীত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরাধ গুরুতর কিংবা লঘু-উভয় ধরনের হতে পারে। অপরাধের ফলে ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড, হাজত বাস বা কারাগারে প্রেরণসহ উভয় দণ্ড কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণ দণ্ডও প্রদান করা হয়ে থাকে। যে বা যিনি অপরাধ করেন বা অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তিনি অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত। অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে থানাসহ পুলিশ, গোয়েন্দা রয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী আদালতের মহামান্য বিচারক অপরাধীকে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন।

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি, অন্য কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সমস্যা সৃষ্টি কল্পে যে সকল কাজ করেন, তাই অপরাধ। অপরাধ হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ধর্ষণ, জালিয়াতি, অর্থপাচার ইত্যাদি রয়েছে, যা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই স্বীকৃত থাকায় দণ্ডনীয়। এছাড়াও মদ্যপান, কোকেন, হিরোইন, গাজা সেবন, নিষিদ্ধ প্রাণীর মাংস খাওয়াসহ সমাজবিরুদ্ধ কার্যাবলি সম্পাদন, যা অপরাধের আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে উল্লেখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করে বিচার করা হয়ে থাকে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা ইসলামি অনুশাসন মেনে চলি, তবে আমাদের এই সমাজ অপরাধমুক্ত থাকতে বাধ্য। কিন্তু ইসলামি অনুশাসন এবং ইসলামি বিচার ব্যবস্থা আমাদের দেশে পুরোপুরি অনুসরণ হয় না।

বাংলাদেশের বর্তমান আইন ও বিচার ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় দুইশ বছরের বৃটিশ শাসনের কাছে বহুলাংশে ঋণী, যদিও এর কিছু কিছু উপাদান প্রাক-বৃটিশ আমলের হিন্দু এবং মুসলিম শাসন ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। এটি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। এ বিকাশের প্রক্রিয়াটি আংশিক স্বদেশি ও আংশিক বিদেশি এবং গঠন প্রণালী, আইনগত ধারণা ও নীতিমালার ক্ষেত্রে ইন্দো-মোঘল এবং বৃটিশ উভয় ব্যবস্থার সমন্বয়ে উদ্ভূত একটি মিশ্র আইনি ব্যবস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশের বৃটিশ আমলের পূর্ববর্তী পাঁচশত বছরেরও বেশি মুসলিম ও হিন্দু শাসনের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। প্রত্যেকটি শাসনামলের নিজস্ব স্বতন্ত্র আইন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

আমাদের দেশে ইসলামি আইনের সাথে বিভিন্ন প্রথা, ইসলাম ছাড়াও হিন্দু শাসনামলের বিভিন্ন আইন বিভিন্ন ধর্মের আইনবিদদের গ্রন্থ বিচারকের রায় ন্যায়বোধ এবং আইন সভা কর্তৃক পাশকৃত বিভিন্ন আইন যুক্ত হয়ে এক জটিল বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আটকে আছি।

ইসলামিক জ্ঞান ও প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমাদের বিচার ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সমাজে প্রাত্যহিক জীবনে সুখ-শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তির জন্যে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক বর্ণিত 'উছুলে ছাবয়া' আলোর দিশারী হতে পারে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

সাধারণ সম্পাদক (সাবেক)
চট্টগ্রাম বার কাউন্সিল, চট্টগ্রাম।

مفهوم الاصـــول السبعة
على ضوء الكتاب والسنة

محمد قمر الحسن

المقدمة :

ان الصحة البدنية تعتمد علي صحة القلب ، ومن صح قلبه فقد صح جسمه فلذا اهمية صحة القلب كثيرة في الحياة البشرية يقال له "تزكية النفس" في الشريعة الاسلامية كما جاء في القران الحكيم " قد افلح من زكاها " وفي (سورة الاعلي) " قد افلح من تزكى" يعنى من استطع ان يزكي النفس من العقائد الفاسدة ويطهر من المعاصي فقد افلح في الحياة الدنيا والاخرة ، وايضا جاء في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب"(متفق عليه) يعنى ان صلاح وفساد الجسد يتوقف علي صحة القلب وفساده فلذا أكد الاسلام لتزكية النفس مرارا وكذا ان العارفين والصوفيين الكرام قد قدموا مختلف البرامج والتوجيهات والاساليب لتزكية النفس ومنعها من الشهوات والوسوسة ومنهم الصوفي المشهور بالغوث الاعظم مولانا السيد احمد الله الميجبهنداری رحمه الله تعالي قد اعطى للسالكين طريقة "الاصول السبعة" التي شرحها بالاختصار نجله الكريم الصوفى الشهير السيد مولنا دلاور حسين الميجبهنداری رحمه الله ونور مرقده.

أصلا ان هذه الاصول السبعة هدفها دفع الشهوات النفسية والهوى البشرية من قلوب الناس وانفسهم وهي قسمان اولها "الفناء" يعنى (الزوال والانعدام وقد يراد به الهلاك) والثاني " الموت" وقسم الفناء بثلاثة والموت باربعة اصناف.

مفهوم الفناء : ان الفناء نقيض البقاء وفي الاصطلاح الصوفية هو سقوط الاوصاف المذمومة كما ان البقاء وجود الاوصاف المحمودة ، كما ان الرجل العاطش يروي عطشه بشرب الماء العذب والنقى فكذالك العبد السالك يصد عطش قلبه بشراب معرفة الله تعالي حتى يكسب العلم الكشفي بسير جميع طبقات الفناء ودرجات الموت وبالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق . قال الامام الغزالي رحمه الله في تعريف الفناء " هي المنزلة الرابعة من التوحيد ، ان لا يرى في الوجود الا واحدا وهى مشاهدة الصديقين.

اقسام "الفناء"

الفناء الثلاثة وهو : (أ) الفناء عن الخلق (ب) الفناء عن الهوى (ج) الفناء عن الارادة.

الفناء عن الخلق : هو عدم الرغبة عن الانتفاع والحصول على الفوائد من الآخرين وبالنتيجة ذلك تكون النفس معتمدة علي الذات وموثقة علي قدراته الذاتية، وهذه الصفة والسمة هى مفتاح رئيسي للفلاح والنجاح حيث ان الشخص والاسرة والمجتمع والدولة والملة المتصف بها لاتهلك ولا تزال ابدا ، ان الناس يحصل علي هذه الصفة بشدة الجهد والاجتهاد والتضحية والصبر والتحمل ولا بديل لها في الحياة االشخصية والكلية. كما قال الله عزوجل في القران الحكيم : " ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم " (سورة الرعد /11)

وايضا جاء : "ليس للانسان الا ما سعى" (سورة النجم /39)

وايضا جاء في الحديث النبوي : عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي افضل واحب الي الله من المؤمن الضعيف". (رواه مسلم ، ابن ماجه ومسند احمد)

الفناء عن الهوى : هو الاجتناب عن القول والفعل الباطل واللغو الذي لا معنى ولا مراد له وبالنتيجة ذلك يحصل السالك علي الحياة المستقيمة خالية عن الاضطراب والقلق . كما جاء في الذكر الحكيم- " واما من خاف مقام وربه ونهى النفس عن الهوى 0 فان الجنة هى الماوى0" (سورة النازعات/40-41)

وايضا قال تعالي : قد افلح المؤمنون 0 الذين هم في صلاتهم خاشعون 0 والذين هم عن اللغو معرضون" (سورة المؤمنون/1-3)

الفناء عن الارادة : هو تغليب ارادة الله ومشيئته علي ارادة النفس وأمنيتها واستسلام ارادة الخلق الي ارادة الخالق وبالثمرة ذلك يحصل به "الرضاء" و"التسليم" حسب الصوفية .

وقال الله عزوجل : " قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين "(سورة الانعام /162)

وايضا جاء في كتاب الله المجيد " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (سورة البقرة/185)

قال النبي صلى الله عليه وسلم – "ذاق طعم الايمان من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا" (رواه مسلم والترمذي).

مفهوم الموت : الموت عند الصوفية هو الحجاب عن انوار المكاشفات والتجلي وقيل هو قمع هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حي بهداه ، كما قال العارف الشهير مولانا احمد الله الميجبهنداری رحمه الله في معنى الموت هو هلاك النفس الامارة التي توسوس في صدور الناس وتنشئ الهوى والشهوات في انفسهم كما جاء في الحديث النبوي : " مت قبل ان تموت" يعنى اهلك الشهوات النفسانية قبل ان يأتي الموت حيث بعد هذا الموت يستيقظ القلب ويقوي الفؤاد حتى حصلت به السالك القربة والمحبة من الله ويجد الحياة الطيبة الابدية والسرمدية.

اقسام "الموت"

الموت الاربعة وهي :

أ) الموت الأبيض - ب) الموت الأسود - ج) الموت الأحمر - د). الموت الأخضر.

الموت الأبيض : وهو الجوع سمى بذلك لانه ينور الباطن ويبيض وجه القلب ، وكذا الامساك عن الاكل والشرب مثل الصيام في شهر رمضان والصيام النافلة ، هي طريقة مفيدة للجوع والصبر ووسيلة قوية للحصول علي هذا النور في القلب ، قد اهتم الغوث الاعظم مولانا السيد احمد الله الميجبهنداری (قدس الله روحه ونضر ضريحه) الي أداء الصيام لنهى النفس عن اضرار تأثيرات الشهوات والهوى وحكم الصيام هو فضل من الله ونعمته العظيمة للعباد المتقين والسالكين ، هذا مستدل وثابت من القرآن والسنة بان الصوم ثمرته التقوي وتزكية النفس ومرضاة الله تعالي. فلذا كان الشيخ يقول : "ان ابنائي يصومون ابدا" و هدفه الحصول علي التقوى والتقديس كما قال تعالى : "يآيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون0 (سورة البقرة/183)

الموت الأسود : وهو احتمال الآذي من الخلق والصبر علي احوالهم وسلوكهم في المعاشرة ، وهذا يحصل بعداوة العدو ولومة اللائم لان العبد السالك يقدر

ان يفهم خطاياه وجرمه بعد انتقاد المنتقدين ولومة اللائمين ويسلك الي الرب بترك هذه الصفة الشنيعة والخصال الرذيلة وبعدمها يشكر الله فيحصل بها القوة الايمانية في قلبه ويحس بها الطمانينة والسكينة ويجعل منتقده ولائمه صديقا له فحصل عليه درجة "الصديق العالمي ". كما قال الله عزوجل في صفتهم : " يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم " (سورة المائدة/54)

الموت الأحمر : وهو مخالفة النفس والمسمى بالجهاد الاكبر الذي يحصل بترك الحرص والطمع والنهى عن الهوى والشهوات النفسانية فحصل به السالك الكمال (الولاية) جاء في القرآن حيث قال تعالي مخاطبا لنبيه داؤد عليه السلام : "يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 0 (سورة ص/26)
وايضا قال تعالي مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم : "ارأيت من اتخذ الهه هواه أفانت تكون عليه وكيلا0(سورة الفرقان/43)
وقال النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم " من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه اضمن له الجنة يوم القيامة "(رواه البخاري والترمذي)

الموت الاخضر: وهو لبس ما يستر العورة وتصح فيه الصلاة وسمى اخضر لاخضرار عيش صاحبه بالقناعة ما يحصل بان يكون معتادا بالحياة البسيطة بلا رفاهية وترفة التي تنتج حب الله في القلب ولا يوجد في قلبه الا محبته وهذا من ضمن "الولاية الخضرية" ومن حصل عليه هذه الصفة فيكون متصفا بـ"صاحب التصرف"
كما جاء في الذكر- "انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسئلكم أموالكم 0 (سورة محمد /36)
وجاء في الحديث -عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر"(رواه مسلم وترمذي)

فوائد الاصول السبعة :

* لا شك ان هذه الاصول القرانية هي طريقة بسيطة للحياة البشرية التي تجلب فيها الفلاح والنجاح.
* وبها تخفف اوزار الحياة الاسرية ويجعل كل شيء سهلا ويسرا.
* وتعطى السعادة والنجاة في الدار الاخرة.

* وهذا حل المشاكل العالمية وتنجي الملة المسلمة والملة الاخري من الحزن والقلق والتقلب والتوتر.
* وتحسن الانسانية والتعاطف ظاهرا وباطنا.
* وتعزز قوة اتحاد الامة المسلمة وتنور وجه القلب والفؤاد للسالكين.
* وتلعب دورا فعالا لتحصيل الانسانية في حياة الفرد والاجتماع .
* وهذه تسهل طرق الفناء والبقاء في المذاهب الصوفية.

وفي النهاية نقول ان الاصول السبعة هي اصول ربانية قد أخرجت للناس بضوء كتاب الله واحاديث رسوله الاكرم التى تعلم العباد السالكين الانسانية وحب الخالق والمخلوق وتطهرهم من جميع الرذائل والقبائح القلبية ويتأكد من السعادة في الدارين ، وهذه طريقة مقبولة عند جميع متبعى الاديان والملل، في الظروف الراهنة بافاق العالم ان هذه الاصول ترشد الناس الي الرشد والهداية وتنجى من الضلال والغواية ، والشخص اللبيب يعترف بلا شك – يجب علي كل مسلم ان يتبع اولي الامر من الاولياء الكرام والاصفياء العظام باتخاذ اصولهم من هذا النوع مع اطاعة اوامر كتاب الله وسنة رسوله لحل المشاكل الفردية والملية والاجتماعية والدولية و لدفع المصائب وإزالة الغياهب من المجتمع فلذا الاصول السبعة لها اهمية كثيرة في حياة الناس للحصول علي السعادة في الدنيا والنجاة في الدار الاخرة....

الاعداد :
مترجم البعثة العسكرية البنغلاديشية لدي الكويت.

মানসিক যন্ত্রণা ও মানবিক দুঃখ-কষ্ট লাঘবে 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

আকতার হোসেন

আল্‌হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌-সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। ওয়া-আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী, ওয়া আহ্‌লে বায়তিহী আজমাঈন।

মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আ'লামিন যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল (আলাইহিস্‌ সালাম) গণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, অকল্যাণ, অশান্তি ও পেরেশানি থেকে মানুষকে মুক্তি প্রদানের লক্ষে। একেক নবী (আলাইহিস্‌ সালাম) সময় প্রেক্ষাপটে উনাদের উম্মতের কল্যাণার্থে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসমানি কিতাব নিয়ে আগমন করেন। হযরত মুসা (আলাইহিস্‌ সালাম) তাওরাত কিতাব, হযরত দাউদ (আলাইহিস্‌ সালাম) যাবুর কিতাব, হযরত ঈসা (আলাইহিস্‌ সালাম) ইঞ্জিল কিতাব এবং সর্বশেষ আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) পবিত্র কুরআন মজিদ নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেন।

"বেলায়ত হচ্ছে নবুয়তের ছায়া"– নবিজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর বেছাল শরিফের পর নবুয়ত যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুগের বিবর্তনে ও সময়ের প্রয়োজনে আমাদের ইসলামে যখন মতানৈক্য, মানুষ যখন শান্তির ধর্ম ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক তখনই আল্লাহপাক যুগ সংস্কারক হিসেবে বিভিন্ন আউলিয়া কেরাম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) গণকে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেন। পীরানে পীর দস্তগীর হযরত শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ধর্মকে পুনরুজ্জীবিতকারী মুহীউদ্দীন উপাধি নিয়ে বেলায়তে ওজমার অধিকারী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন। উনার ছয়শত বছর সময়ের ব্যবধানে মানুষ যখন আবার ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও পাপাচারে নিমজ্জিত, সেই অবস্থায় ধর্মের সত্যিকার স্বরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হযরত গাউছুল আজম শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এ ধরাধামে আবির্ভূত হন। তিনি জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত ঐশী প্রেমবাদ 'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদি' যুগের প্রবর্তন করেন। নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি অনুশীলন হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি (উছুলে ছাবয়া) কীভাবে মানুষের মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সহায়তা করে, তা নিম্নের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারবো।

বর্তমান সময়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা এমন চরম পর্যায়ে যা চরিতার্থ করার জন্য প্রতি নিয়ত মানুষ দুনিয়াবী লোভ-লালসা, হিংসা-প্রতিহিংসায় লিপ্ত। পুরো সমাজে এক চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। সন্ত্রাস, রাহাজানি, ধর্ষণ, মাদক-দুর্নীতি, সম্পদের অসম বন্টন, হত্যা-গুম সহ নানান অপরাধ কর্মে মানুষের শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে।

অন্যদিকে অভাব-অনটন, রোগ-শোকসহ সামাজিক সঙ্কটের মধ্যে সকল শ্রেণির মানুষ দিনাতিপাত করছে। প্রত্যেকেই শান্তি চায়, নিরাপত্তা চায়, সমস্যা থেকে মুক্তি চায়। মানুষ এমন একটি পৃথিবী দেখতে চায়, যেখানে মানুষের আত্ম-সামাজিক উন্নয়ন, শান্তি, মানবতা, কল্যাণ ও প্রেম থাকবে। এমন একটি দিক-দর্শন চায়, যার মাধ্যমে মানুষ জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ পেতে পারে।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর দর্শন হচ্ছে নবুয়তের আদলে বেলায়তি শক্তির বাস্তব প্রয়োগ, যেখানে আধ্যাত্মিক চেতনায় মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তির নির্দেশনা এবং সার্বজনীন মানবতার দর্শন রয়েছে। একজন মানুষ দেহ-মন, চিন্তাধারা, আত্মা তথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুদ্ধাচারের মাধ্যমে কীভাবে তার নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে তা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে জগদ্বাবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি একটি কুরআনি পদ্ধতি। কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্মত একটি যুগোপযোগী জীবন ব্যবস্থা, যা অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ সংসার জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে প্রশান্তি লাভ করে। এক কথায় ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে তুলতে পারে।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি বা উছুলে ছাবয়া হচ্ছে-

(১) 'ফানা আনিল খাল্ক' ঃ আত্ম নির্ভরশীল হওয়া অর্থাৎ কারো মুখাপেক্ষিতা না থেকে স্বনির্ভর বা আত্ম-নির্ভরশীল থাকা।

(২) 'ফানা আনিল হা'ওয়া' ঃ অনর্থ কাজকর্ম পরিহার করা বা অহেতুক কাজকর্ম, কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা। এর অনুশীলনে জীবন-যাত্রার পথ সহজ ও ঝামেলা মুক্ত থাকে। লোভ-লালসা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(৩) 'ফানা আনিল এরাদা' ঃ আল্লাহ্র ইচ্ছাতে বিলীন- নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছাতে বিলীন করা। মানুষ চেষ্টা করবে, ফলাফল আল্লাহপাকের ওপর তাওয়াক্কুল রাখবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

(৪) 'মউতে আবয়্যাজ' ঃ কামনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য সংযম অভ্যাস করা।

(৫) 'মউতে আছওয়াদ' ঃ রাগান্বিত না হয়ে সমালোচনাকারীর সমালোচনার কারণ নিজের মধ্যে খুঁজে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানোর গুণ অর্জন করা।

(৬) 'মউতে আহমর' ঃ কামভাব ও লালসা মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেয়। হত্যা, ধর্ষণ, গুম প্রভৃতি লালসার কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে, এ থেকে মুক্ত হওয়া।

(৭) 'মউতে আখজার' ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু বর্জন অর্থাৎ নির্বিলাস জীবন যাপন চর্চা। অনুশীলনে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সর্বপ্রথম জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত বেলায়েতে মোত্লাকা উন্মোচন করেন। তাই তাঁকে খাতেমুল বেলায়ত বলা হয়। তিনি আচার ধর্মের চেয়ে নৈতিক ধর্মের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। নৈতিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে মানুষের জৈবিক লালসা ও অনুন্নত রিপুর তাড়না। যা প্রতি নিয়ত মানুষকে মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেয়। এই মহাসংকটময় জীবন থেকে মুক্তির জন্য মানুষ অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে।

এ ধরনের অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির সহজ পথ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনা, ত্যাগ ও অনবরত নফ্সের সাথে জেহাদ।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) উছুলে ছাবয়া'র মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ও বাবা ভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর ফয়েজ ও বরকত আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।

লেখক ও মরমী গবেষক

নির্বিলাস জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য

এ. টি. এম মুছা

মহান সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবকুল সৃষ্টি করে এই নশ্বর জগতে নিজের জীবন ও জীবিকা অর্জন ও পরিচালনার জন্য নবি ও রাসুলদের মাধ্যমে পবিত্র ঐশী গ্রন্থ অবতরণ করেছেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই আসমানী কিতাবের সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) এঁর মাধ্যমে শেষ হয়। পৃথিবীর ঐশী ধর্মগ্রন্থ আর নাজেল হবে না। নবি ও রাসুল আর আসবেন না। এই ঈমানের ভিত্তিতে আল কুরআনের আলোকে মহানবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) পবিত্র হাদিস শরিফের অনুকরণে গাউছে জমানদের এলহাম লব্ধ পবিত্র বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন পথের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

১। পবিত্র কুরআন শরিফের বাণী, "তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।" (আরাফ-৭:৩১)

২। "এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করো। (সূরা বাকারা-৬)

১। পবিত্র হাদিস শরিফের বাণী, "হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজের ওপর একটি ফরজ।" (বায়হাকী)

২। মহানবি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা) বলেছেন, উদরকে তিন ভাগে ভাগ করে খাও- একভাগ খানি, একভাগ পানি আর একভাগ থাকবে খালি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সাধারণ পোষাক পরতেন। ইমাম হাসান (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণনা করেছেন, একবার ওমর ফারুক (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) খুতবা দিতে ছিলেন, আমি গুণে দেখলাম তাঁহার তহবন্দে বারোটা তালি লাগানো।

বর্তমান বিশ্বে মানবিক আচরণ অবলোকন করলে দেখা যায়, মানুষ মাত্রই রসনা বিলাস, আবাসন বিলাস, যোগাযোগ বিলাস, যাতায়াত বিলাস এবং বসনা বিলাসের অথৈ সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বিলাসিতার বাড়তি অর্থ যোগাতে গিয়ে মানুষের অমূল্য সম্পদ সময় চলে যাচ্ছে। সময় পাচ্ছে-না আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে বা ইবাদত-বন্দেগি করতে। এই বিলাসিতার অর্থ যোগাতে আশ্রয় নিতে হয় মিথ্যার, গ্রহণ করতে হয় সুদ, নিতে হয় ঘুষ, অপবিত্র হয় জবান, নষ্ট করতে হয় মানুষের হক। যে মানুষের হক; নিজে মাফ না করলে আল্লাহ মাফ করবেন না। অবৈধ অর্থে ক্রীত বসন পরে ইবাদত করলে হয় না কবুল। আর এই অবৈধ খাদ্যে উৎপাদিত রক্ত, মাংস, বীর্য থেকে আগত সন্তান কী করে হবে সৎ সন্তান?

উপরোল্লিখিত মানবতা-বিধ্বংসী যে চিত্র ফুটে ওঠেছে, তার ভয়াবহ করাল গ্রাস থেকে মুক্তির মানসে আমাদের জ্ঞান চক্ষুকে উম্মিলিত করে অর্জন করতে হবে নির্বিলাস জীবন যাপনের আচরণিক নিয়ামক। বিলাসী রসনাকে করতে হবে সংযত। দৃষ্টিশক্তিকে করতে হবে অবনত। আয়ের উৎস হতে হবে পরিশীলিত। বাকশক্তি হবে ন্যায়ত। ব্যবহারের বসন হবে লজ্জা নিবারক। তখন মানুষই হবে নির্বিলাসীর প্রতীক।

দুনিয়ার শেষ পোষাক কবরের প্রথম পোষাক। মৃতকে যে কাফন পরানো হয়, তাতে থাকে না ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বা বিলাসিতার কোনো ছোঁয়া, থাকে শুধু নারী পুরুষের কারণে পরিমাপের তারতম্য।

তাইতো নির্বিলাসীদের মনের দৃঢ়তা স্থায়ীকরণের নিমিত্তে হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ থেকে ২টি পবিত্র কালামের উদ্বৃতি উপস্থাপন করলাম-

১। হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) দরবারে কেহ শাদীর কথা বলিলে তিনি বলিতেন, নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা দুনিয়াকে "দারুল হোজন" বলিয়াছেন। আর তুমি বল শাদী। তিনি জালাল হইয়া যাইতেন। কিন্তু খাদেমা বা বাবুর্চি আনিবার কথা বলিলে তিনি যথারীতি নাম জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অনুমতি প্রদান করিতেন। (জীবনী ও কেরামত মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী পৃ: ১৩৪ ৪র্থ প্রকাশ)

২। হযরত কেবলা তাঁহার একমাত্র পুত্র মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে বিবাহ করাইবার পর হযরত সাহেবান বসত বাড়িটা প্রশস্ত ও সুন্দর করিবার জন্য হযরত সমীপে বার বার অনুমতি চাহিলে তিনি উত্তর দিতেন, দেখ, দুনিয়া "দারুল রেহালত," পান্থশালা। এখানে সুন্দর ও বেশি প্রশস্ত ঘরের দরকার কি? দুইদিন বিশ্রাম করার দরকার মাত্র।

উপরোল্লিখিত পবিত্র কুরআন, হাদিস শরিফ এবং বিশিষ্ট সাহাবী অর্ধপৃথিবীর শাসক হযরত ওমর ফারুক (রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) নির্বিলাস জীবন চরিত, হযরত গাউছুল আজম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) পবিত্র কালামের অনুসরণ ও অনুকরণে নির্বিলাস জীবনে অভ্যস্ত হলে "ছালেক" অর্থাৎ খোদা পথচারী প্রভাব সম্পন্ন বেলায়তে খিজরীর অধিকারী হবে। একে সুফি পরিভাষায় বলে "সবুজ মৃত্যু" নির্বিলাস জীবন। এই নীতিই পৃথিবীবাসীকে দিতে পারে সন্তুষ্ট চিত্ত ও আত্মনির্ভরশীল একটি জাতি। আর এই জাতিই পারে শান্তিময় একটি পৃথিবী উপহার দিতে আর পরকালের মুক্তির উসিলা তৈরি করতে। আমীন।

প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক (বি.এড)
কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

গাউছিয়ত নীতি

১। **তেলাওয়াতে অজুদ :** নির্জন সময়ে নিজের গত দিনের ভালমন্দ কাজ-কর্মের বিচার, চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে মন্দের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা, ভালোর জন্য নিজ পীরের আনুগত্য এবং খোদার সাহায্য কামনা, মোনাজাত, বিনয়ে প্রার্থনা-অনিবার্য। ফলে খোদা পথচারী নাছুত্ভাব কামনার ঊর্ধ্বে 'লাওয়ামা' 'মলকুত্' শক্তি জগতে উত্থিত হইতে সক্ষম হয়। যাহাকে ছুফি পরিভাষায় 'ফানা আনিল খাল্ক' বলে।

২। **অনর্থ পরিহার :** যাহা না হইলে চলে ও উপকার বিহীন, এহেন কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, বাক্বিতণ্ডা ত্যাগ, পরিহার, এড়াইয়া চলা এবং পরের দোষ তালাস না করা, পরমুখাপেক্ষীতা ও পরশ্রীকাতরতা বিমুখ হইয়া, নিজ শক্তি সামর্থে হালাল রুজির প্রতি আস্থাশীল হওয়া। অপচয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার যথাঃ পান, বিড়ি-সিগারেট, অলঙ্কার, অঙ্গ বিকৃতকারী পোষাক পরিচ্ছদ, পবিত্র কোরান যাহাকে 'মর্হান' অহঙ্কারী 'ফাখুরাণ' গর্বকারী বলে নির্দেশ করেছে, যাহা মানবের দৈহিক, নৈতিক অবনতি ঘটায়, কর্ম বিমুখতা, অভাব অনটন, আর্থিক দুর্গতি আনায়ন করে। ভূষণ, ফ্যাসন, মোহের ফলে আদি অসভ্যতা 'পছন্দ' হইয়া পড়ে। সুতরাং এ সমস্ত পরিহারের ফলে খোদা পথচারী 'ছালেক' কোরানের বাণী "মান্নাহান্ নাফ্ছা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া" মতে নিশ্চিত স্বর্গবাসী, ইহাকে ছুফি পরিভাষায় বলে 'ফানা আনিল হাওয়া।'

৩। **সন্তোষ :** খোদার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ সংসার স্বার্থ বুদ্ধিকে নত করিয়া মঙ্গলদায়ক রূপের ধ্যানে 'ছবর' ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা। যেহেতু স্রষ্টা সৃষ্টির রক্ষক, পালক, বর্দ্ধক, মঙ্গলদায়ক। ছুফি পরিভাষায় এই গুনজ প্রকৃতিকে বলে 'তছলিম' বা 'রজা।'

এই ত্রিবিধ নীতিমালাই 'ফানায়ে ছালাছা' বা বিনাশ পদ্ধতি। যাহা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেব্লার সপ্ত পদ্ধতির অন্তর্গত।

প্রথম অংশ, 'এবাদতে মোত্নাফিয়া' হিসাবে 'ছালেক' খোদা পথচারীর জন্য অপরিহার্য।

উপরোক্ত গাউছিয়ত নীতিহীন, বিমুখ ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারী দাবী করা চলে না।

[বিঃ দ্রঃ 'বেলায়তে মোত্লাকার' দ্বাদশ পরিচ্ছদে হযরতের বাণী এবং অষ্টম পরিচ্ছদে বেলায়েত রহস্য অধ্যায়।]

বিনীত-

খাদেমুল ফোক্রা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মটো

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে
বাক-বিতন্ডা পরিহারে
জানার আগ্রহে,
পরদোষ পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে।
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে
না দেখাইবে "পীর" যাকে এই তিন ধারা
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথ হারা।

"মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি
তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ
তোমারই ফুল ক্ষেত্র।
কোলাহল পরিহারে, নির্জনতার আসরে,
তোমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে
আজি তোমারই বাসরে।"

– সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ

চট্টগ্রাম জেলার মাইজভাণ্ডার গ্রাম- ছায়াঘেরা পাখি ডাকা বাগানতুল্য এক নিভৃতি শান্তিময় পল্লী, যাঁর অধ্যাত্ম শরাফতের কল্যাণে সারা বিশ্বে "মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ" নামে খ্যাত, সেই মহান গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া খাতেমুল অলদ হযরত মওলানা শাহ্ সুফি **সৈয়দ আহমদ উল্লাহ** (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এই স্থানে ১২৩৩ বাংলা (১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ) ১ লা মাঘ শুভ আর্বিভাব হন। দেশিয় শিক্ষা শেষে হিজরী ১২৬০ সনে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং অধ্যায়ন শেষে তিনি যশোরে কাজী পদে যোগদান করেন। উক্ত পদে ইস্তফা দেয়ার পর কলিকাতায় মুন্সী বু আলী ছাহেবের মাদ্‌রাসার প্রধান মোদার্রেছ পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিল আছালত বা স্বভাব সিদ্ধ জন্মগত অলি উল্লাহ ছিলেন। মোখালেফাতে নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে বিল মালামাত বেলায়ত অর্জন করেন। হযরত পীরাণে পীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর বংশধর ও কাদেরিয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত গাউছে কাউনাইন হযরত শেখ সৈয়দ আবু শাহামা ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর দস্তে বায়াত গ্রহণ করে গাউছিয়তের খোদা-দাদ খনি এবং পীরে তরিকতের বড় ভাই হযরত সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) হতে এত্তেহাদি কুতুবিয়তের ফয়েজ হাসিল করে কামেলে মোকাম্মেল হন। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অনাবিল করুণা বর্ষনের পর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে, ১০ই মাঘ সোমবার এই মহান গাউছুল আজম ওফাত প্রাপ্ত হন।

ওফাতের পূর্বে তিনি অর্জিত গাউসিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরাফত জারি রাখার লক্ষে নিজ আদরের নাতি হযরত মওলানা শাহ্ সুফি **সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী** (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কে "বালেগ" ঘোষণা করে নিজ গদিতে বসানোর মাধ্যমে সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে যান, যিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ওফাত প্রাপ্ত হন।

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ওফাতের পূর্বে এ শরাফতের ধারা জারি রাখার লক্ষে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে নিজ ৩য় পুত্র আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি **সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী** (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) কে তাঁর রচিত মানব সভ্যতা বই-এ "যোগ্যতম" ঘোষণা এবং জীবদ্দশায় প্রকাশিত জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর গদির স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে শিক্ষা দীক্ষা শজরা দান ফতুহাত নিয়ন্ত্রন অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারি সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করে যান। অনুরূপভাবে তিনিও এ শরাফত জারি রাখার জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র **শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী** (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) কে ১৩ অক্টোবর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে খেলাফত প্রদান করে একমাত্র নায়েব সাজ্জাদানশীন মনোনীত করেন। হযরত কেবলা কাবার গাউসিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরাফতের এই ধারা শজরা প্রাপ্ত মনোনীত সাজ্জাদানশীনের মাধ্যমে হাশর তক্ জারি থাকবে। -ইনশাল্লাহ।

বাংলাদেশে সুফিবাদ চর্চার উর্বর ভূমি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। ইহজাগতিক ও পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনে এ দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সর্বজন বিদিত। এ মহত্তম মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী, খাতেমুল অলদ, ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মানুষের আত্মশুদ্ধির কিছু মৌল সূত্র প্রণয়ন করে গেছেন। তার নাম 'উছুলে ছাবয়া' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি। এটি মূলত একজন মানুষের সহজাত কু-প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে সাধন-ভজনের উপযোগী স্বভাব-গঠনের পথ ও পন্থা। বিজ্ঞান সম্মত এই মৌলিক সাধন-প্রণালী যুগপৎ বস্তুগত ও ভাব সাধনার নির্যাসকে ধারণ করে জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের নিহিতার্থকে গ্রহণ করতে প্রাণিত করে। যাপিত জীবনেও এর বহুকৌণিক উপযোগিতা রয়েছে। একটি মানবিক, সমাজ কিংবা পৃথিবী বিনির্মাণে এ 'উছুলে ছাবয়া' আজকের সংকটাপূর্ণ বিশ্বে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই অভিপ্রায়কে লালন করেই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। এতে ৪৭ জন বিদগ্ধ লেখক-গবেষকের মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'উছুলে ছাবয়া'র প্রকৃত তত্ত্ব-দর্শন, প্রকৃতি ও স্বরূপ, যাপিত জীবন কিংবা অধ্যাত্ম-সাধনায় এর উপযোগিতা ও উপকারিতা বিশদভাবে ফুটে উঠেছে মূল্যায়নধর্মী ও বিশ্লেষণধর্মী এসব প্রবন্ধে। পাঠক ও ভাবুকজন এ গ্রন্থ পাঠে 'উছুলে ছাবয়া' সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হবে; পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী তরিকার মৌল বৈশিষ্ট্য এবং নির্যাস অনুভবে সমর্থ হবে।



উছুলে ছাবয়া

আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি

(আরবি গ্রন্থ)

ISBN : 978-984-34-8504-5